বাংলাদেশে ইসলামঃ আগমন, প্রসার ও কাঠামোগত রূপ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ.ডি.ডিগ্রীর জন্য উপাস্থিপিত অভিসন্দর্ভ।

গবেষক
রোকসানা ভূঁইয়া মিলু
পি-এইচ.ডি. গবেষক
শিক্ষাবর্ষ- ২০১০-২০১১
রেজিঃ নং- ৩৮/২০১০-২০১১
ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সুপারভাইজার
ড. মুহা. আবদুল বাকী
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সুত্র: তারিখ:

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের গবেষক রোকসানা ভূঁইয়া মিলু কর্তৃক এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত **"বাংলাদেশে ইসলামঃ আগমন, প্রসার ও কাঠামোগত রূপ"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি কোন যুগ্ম গবেষণাকর্ম নয়; বরং গবেষকের নিজের মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও কোন ভাষায় এ শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি।

আমি অভিসন্দর্ভটির চুড়ান্ত পান্ডুলিপি আগাগোড়া মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন সহ পরিমার্জিত করেছি। এর মৌলিকত্ব বিচার করে আমি গবেষককে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট এটি উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

সুপারভাইজার

ড. মুহা. আবদুল বাকী
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ
বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"বাংলাদেশে ইসলামঃ আগমন, প্রসার ও কাঠামোগত রূপ"** শিরোনামে কোথাও কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ কোন যৌথ প্রয়াস নয়। এটি আমার একক গবেষণাকর্ম। এই গবেষণার বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে আমি কোথাও প্রকাশ করিনি।

রোকসানা ভূঁইয়া মিলু
পি-এইচ.ডি. ফেলো
ইসলামিক ষ্টাডিজ
বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচী

(সাঃ)	ঃ সাল্লাল্লাহ' আলাইহি ওয়া সাল্লাম
(আঃ)	ঃ আলাইহিস সালাম
(রা.)	ঃ রাদী আল্লাহ 'আনহু'
(র.)	ঃ রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি
ই.ফাবা	ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ড.	ঃ ডক্টর
পৃ.	ঃ পৃষ্ঠা
হি.	ঃ হিজরী
খ্রী	ঃ খ্রীষ্টাব্দ
তা.বি	ঃ তারিখ বিহীন
সং.	ঃ সংস্করণ
Vol.	ঃ Volume
P	ঃ Page
PP	ঃ Pages
সালাসা	ঃ সালাসা গাস্‌সালা-হাকীম হাবীবুর রহমান
মাশরিকী	ঃ মাশরিকী বাঙ্গাল-যে-উর্দু-ইকবাল আযীম
বিস্‌মিল্‌	ঃ সিলহেট মে-উর্দু-আব্দুল জলীল বিসমিল
যখীরা (প্রথম ও দ্বিতীয়)	ঃ যখীরা-এ-কারামত-মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী,
ফাসী সাহিত্য	ঃ বাংলাদেশ ফার্সী সাহিত্য-ড: মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
আরবী বিদ	ঃ বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবী বিদ-ড: মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
ফিক্‌র	ঃ ফিক্‌র-ওয়া-নযর, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৮ ইদারা-এ-তাহকীক-এ-ইসলামী, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।
কিতাব শিনাসী (২)	ঃ বুক রিভিউ, লাহোর-১৯৮৮।
হাদীসের তত্ত্ব	ঃ হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস-মাওলানা নূর মোহাম্মদ 'আজমী।

ভূমিকাঃ

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন শেষ নবী, তৌহিদবাদী সভ্যতা সংস্কৃতির শিক্ষক ও সত্য ধর্ম ইসলামের সর্বশেষ প্রচারক। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ৫৭০ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন। ৬১০ সালে নবুওয়াত লাভ করার পর দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে তিনি সত্য ধর্ম প্রচার করে যান। তৌহিদবাদের ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ গঠন করেন। ১৩ বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও সাধনায় একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ব মানবতার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। আলণ্ঢাহর নির্দেশিত পথে মানুষকে পরিচালনা করাই ছিল তাঁর দায়িত্ব। নিজের জীবদ্দশায় এ দায়িত্ব তিনি পুরোপুরি পালন করে যান। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সুশিক্ষিত সাহাবীগণ, সাহাবীগণের কাছ থেকে সত্যের আলোকে উদ্দীপিত তাবিঈগণ, তাবিঈগণের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত তাব-তাবিঈনগণ এবং এভাবে পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের বিভিন্ন দল ইসলামের সত্যবাণী ও তৌহিদবাদী সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো নিয়ে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ও এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন।

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই বহু আরবীয় মুসলমান নিছক ইসলাম প্রচার বা ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশে আগমন করেন, ইতিহাসেও এ প্রমাণ মেলে। ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রথম কয়েক বছরের মধ্যেই হযরত উমরের খিলাফতকালে কিছুসংখ্যক সাহাবা উপমহাদেশে আগমন করেন। পরে হযরত উসমান, হযরত আলী ও হযরত আমীর মুআবিয়া (রা) এর শাসন আমলেও এদেশে সাহাবীদের আগমন ঘটে। সাহাবায়ে কিরামের পর বহু তাবিঈ ভারতে আগমন করেন। তাঁদের কেউ কেউ ব্যবসার উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করলেও ব্যবসায়ের পাশা-পাশি ইসলাম তথা ইল্‌মে হাদীস প্রচারেও তাঁদের ভূমিকা কম ছিল না। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে আরো অনেক সূফী-দরবেশ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে পদার্পণ করেন। বাংলাদেশে প্রধানত পীর-আউলিয়া কর্তৃক ইসলাম প্রচারিত হয়েছে।

বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের স্বরূপ বলতে, এদেশের জনগণ কর্তৃক কুরআন, হাদীসের আলোকে ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান পালিত হচ্ছে বা যথাযথ ভাবে পালিত হয়ে না থাকলে- তা কতটুকু গরমিল অবস্থায় পালিত হচ্ছে, তা তুলে ধরা হয়েছে এ অভিসন্দর্ভে।

এছাড়া বঙ্গে শাহী আমল ও নওয়াবী আমলে যে সব 'আলিম-ফাযিল রাজকার্যে নিয়োজিন ছিলেন, তাঁদের দ্বারাও ইসলামের চর্চা হয়েছে।

প্রাথমিক যুগের সূফী-সাধকগণ ছিলেন উদার। তাঁদের উদারতার সুযোগে ইসলামে অনেক অনৈসলামিক রীতি-নীতি অনুপ্রবেশ করে বা সূফী-সাধকগণ মনে করতেন, অন্য ধর্মালম্বীদেরকে সহজ ভাবে একবার ইসলামে নিয়ে আসতে পারলে তাদের মধ্যকার অনৈসলামিক কর্মকান্ড আস্তে আস্তে দূরীভূত হয়ে যাবে। এ সব কারণে এই দেশে ইসলামে কিছু কিছু অনৈসলামিক কর্মকান্ড অনুপ্রবেশ ঘটে যা অদ্যবধি বিদ্যমান আছে। এই সব অনৈসলামিক রীতি-নীতি চিহ্নিত করা দরকার। এগুলো ইসলাম থেকে দূরীভূত করা দরকার। অথচ এই দৃষ্টি ভঙ্গিতে আজো কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়নি। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে বহু বই পুস্তক রচিত হয়েছে বটে তবে; কেউ বাংলাদেশে প্রচলিত ও পালনীয় ইসলাম কুরআন হাদীসে বিধৃত সত্যিকার ইসলামের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ, আমার জানামতে তা কেউ উন্মোচন কারার চেষ্টা করেননি। এই অভাব পূরণের জন্যই আমি উপরিউক্ত বিষয়ে গবেষণাটি আমি সম্পন্ন করেছি।

এটি পাঠে বাংলাদেশের জনগণ নিজের ইসলামের পালনীয় বিধি-বিধানের সাথে কুরআন-হাদীসে নির্দেশিত ইসলামের পার্থক্য বুঝতে সহজ হবে। এতে বাংলার জনগণ আমল সংশোধন করার সুযোগ পাবে। এতে সত্যিকার ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে। ধর্মপালান কারীদের মধ্যে মতানৈক্য ও বেদাভেদ দূরীভূত হবে। যার ফলে সমাজে শান্ড়ি প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশে সূফী-সাধক, আলিম-ওলামা এবং রাজা-বাদশা কর্তৃক ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। ইসলাম প্রচারের পূর্বে এদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বসবাস করত। সূফী-সাধক, আলিম-ওলামার আহবানে হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসে বটে; কিন্তু তাদের পূর্বের কৃষ্টি কালচার একেবারে ভুলে যেতে পারেনি। ফলে এদেশে পালিত ইসলামী অনুশাসনের মধ্যে ও কিছু কিছু অনৈসলামিক বা ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ ঢুকে যায়। উদাহরণ ঃ এগুলো চিহ্নিত করাই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য। ইসলামের মূল বাণী তাওহীদ। এদেশে তাওহীদের নামে শির্ক, বিদআত প্রচলিত আছে কি-না, যাকাত আদায়-বন্টন হচ্ছে কি-না, আল্লাহর হক ও বান্দার হক সঠিক ভাবে পালন হচ্ছে কি-না, সঠিক ভাবে তাসাউ্উফ চর্চা হচ্ছে কি-না, মুআমালাত সঠিক ভাবে হচ্ছে কি-না, তা জানা প্রয়োজন ছিল। এ সব প্রশ্নের আলোকে আমি থিসিসটি সম্পন্ন করেছি।

যে কোন বিজ্ঞানের অস্তিত্ব নির্ভর করে তার উদ্ভাবিত এবং ব্যবহার পদ্ধতির উপর। পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক মর্যাদা লাভের কারণ তাদের সঠিক ও যৌক্তিক পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সফলতা। সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা কর্ম হিসাবে এ গবেষণার কর্মটি বিশেণ্ঢষণ নির্ভর। এর মূল্যায়ন ও বিশেণ্ঢষণের জন্য এ গবেষণা কর্মটিতে সাহায্য নেয়া হয়েছে। ইসলামের বাস্তবতা কি? ইসলাম তথা পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সাঃ), সাহাবা, তাব-তাবিঈন এর জীবন আদর্শ থেকে যে শিক্ষা আমরা পেয়ে থাকি, সে আলোকে এদেশে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালিত হচ্ছে কিনা- তা জানার জন্য জনগণের ধর্মীয় পর্যবেক্ষণ বা জনগণের সাক্ষাৎকার মাজারের কার্যক্রম দেখে, তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এছাড়া সামাজিক ব্যবস্থায় ধর্ম পালন করতে গিয়ে ইসলামী অনুশাসনগুলো সঠিক ভাবে বা যথাযথ ভাবে এদেশের মানুষ পালন করছে কি-না, কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিচার বিশেণ্ঢষণ করার প্রয়াস রয়েছে এ গ্রন্থে। এজন্য এদেশে কিভাবে কাজের দ্বারা ইসলামে প্রচার ও প্রসার ঘটেছে, কিভাবে ইসলামী অনুশাসনে অনৈসলামিক কার্যকলাপ অনুপ্রবেশ ঘটে এবং কিভাবে উহার মূল উৎঘাটন করা যায়, এসব আলোচনার বিষয়বস্তু রয়েছে এ গ্রন্থে।

সকল গবেষণার ক্ষেত্রে একই রকম পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়না। এক্ষেত্রে গবেষণার বিষয়-বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে পদ্ধতি নির্বাচন করতে হয়। আমি আমার গবেষণার বিষয় বস্তুর সাথে ঐতিহাসিক পদ্ধতি, বিষয়বস্তু বিশেণ্ডষণ পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রাপ্ততথ্য সমূহ মূল্যায়ন করে গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করেছি। ফলে গবেষণা পদ্ধতি হয়েছে বর্ণনামূলক, চিন্তামূলক ও বিশ্লেষণ ধর্মী। এছাড়া গ্রন্থপাঠ ও পর্যালোচনা পদ্ধতি ও সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধান কিভাবে পালন করে, তা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে এবং ধর্মীয় সংস্থা তথা মাযার পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

গ্রন্থসমূহের আলোচনার সময়ে যেসব স্থানে 'আরবী, ফার্সী ও উর্দু শব্দমালা এসেছে সেসব স্থানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বানান-রীতি মুতাবিক বাংলা উচ্চারণ দিতে চেষ্টা করেছি। দেশের বিভিন্ন লাইব্রেরী এবং দেশের জ্ঞানী-গুণীদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছি। এভাবে আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পটিকে মোট ভূমিকাসহ ৫টি অধ্যায় বিন্যস্ত করেছি। **অধ্যায় বিন্যাসঃ** ভূমিকা, প্রথম অধ্যায় ঃ বাংলাদেশে ইসলাম পূর্ব যুগ ঃ ধর্মীয় অবস্থা। দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসার। তৃতীয় অধ্যায় ঃ ইসলাম প্রচার ও প্রসারে রাজন্যবর্গের ভূমিকা। চতুর্থ অধ্যায় ঃ ইসলাম প্রচারে সূফী ও আলিমগণের ভূমিকা। পঞ্চম অধ্যায় ঃ বাংলাদেশে ইসলামের কাঠামোগত রূপ

ক) প্রাচীন বাংলাদেশে মুসলিমগণের পালনীয় বিধি-বিধান ও ইসলামখ) বর্তমান বাংলাদেশী মুসলিমগণের ধর্মপালন ও ইসলামী বিধি-বিধান।উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি।

এ সম্পর্কে সামগ্রিক পরিকল্পিত গবেষণা ইতোপূর্বে তেমন হয়নি। তাই এক্ষেত্রে আমাকে প্রাথমিক কাজের সকল অসুবিধারই সম্মুখীন হতে হয়েছে। বহু সুধী এবং দেশের বহু প্রতিষ্ঠান আমাকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে। আমার বিভাগের অনেক শিক্ষক আমাকে বিভিন্নভাবে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আমার প্রকল্পের কাজে সবচেয়ে বেশি যিনি সহযোগিতা করেছেন, তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক বিভাগীয় প্রফেসর ড. মুহা. আবদুল বাকী। তিনি আমার জন্য যেভাবে ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন, উৎসাহ ও

প্রেরণা যুগিয়েছেন, সত্যিই তাঁর তুলনা হয় না। তাঁর পাশা-পাশি অন্য বিভাগের কোন কোন শিক্ষক এর কাছ থেকে আমি যে সহযোগিতা পেয়েছি, তাও আজ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। এছাড়া অন্যান্য যেসব বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনেরা প্রকল্পের কাজে অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছেন, তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

অধ্যায় ঃ ১

বাংলাদেশ ইসলাম পূর্বযুগঃ ধর্মীয় অবস্থা

মহান আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে পাঠিয়েছেন অসংখ্য নবী রাসূলগণকে। মহান আল্লাহপাকের মনোনীত একমাত্র ধর্ম ইসলামকে সু-প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে অবতীর্ণ করেছেন জীবন বিধান। বিশ্বমানবতার কল্যাণকামী, সত্য, সুন্দর ও সংস্কার মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মহান শিক্ষক হিসাবে, আল্লাহর রহমত হিসেবে আমাদের নিকট আগমন করেন, আমাদের শ্রেষ্ঠ নবী, আখিরী নবী, প্রিয় নবী রাসূলে করিম হযরত মুহাম্মদ (সা.)। আল্লাহর নির্ধারিত পথে মানুষকে পরিচালনা করাই তাঁর প্রধান দায়িত্ব। হযরত মুহাম্মদ (স.) দীর্ঘ ২৩ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে সত্য ধর্ম প্রচার করেন। তিনি ছিলেন সত্য ধর্ম-ইসলামের শ্রেষ্ঠ প্রচারক। তাঁর ইন্তিকালের পর মানব জাতিকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করার জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁর সাহবীগণ[১], পর্যায়ক্রমে তাবেঈ[২] ও তাবেঈনগণ[৩]। এভাবে পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের বিভিন্ন দল সত্যবাণী প্রচারে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন।

সপ্তম ও অষ্টম শতকের দিকে আরব বণিকদের বাংলা ও ভারতের পশ্চিম উপকূলে আসা-যাওয়ার কারণেই ভারতে প্রথম ইসলামের শুভ সূচনা হয়[৪]। তৎকালীন সময়ে বাংলার উপকূল ও বর্তমান চট্রগ্রাম প্রধান বন্দর[৫], বাংলার দক্ষিণ উপকূল দিয়ে মহান আল্লাহ পাকের মনোনীত দীন ইসলামের সত্যবাণী বাংলায় প্রবেশ করে। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকে আরবীয় বণিকগণ ব্যবসা বানিজ্যের পাশা-পাশি ইসলাম প্রচার কিংবা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করেছিলেন। ইতিহাস তাদের প্রমাণ বহন করে আজো[৬]। ত্রয়োদশ শতকের

---

[1]সাহাবী: যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসুল (সঃ) এর সহচার্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন তাঁর হাদিস বর্ণনা করেছেন অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে রাসুলুল-াহ (সঃ) এর সাহাবী বলা হয়।

[2]তাবেঈন: যিনি রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর একজন সাহাবীকে জীবনে অন্তত একবার দেখেছেন ঈমান অবস্থায় এবং ঈমানদার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে তাবেঈ বলে।

[3]তাবে-তাবেঈন: যারা তাবেঈদের কাছ থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত হয়েছেন এবং ঈমানদার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে তাবে-তাবেঈন বলে।

[4]বিশ্বকোষ: ১৪-২৩৪ উদ্ধৃত, মুছলেম বঙ্গেও সামাজিক ইতিহাস

[5]কে, এম পাক্কিও, তারিখে হিন্দে কদীম। পৃ: ৬৭

[6]আবদুল মান্নান তালিব, "বাংলাদেশ ইসলাম" ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ ২০০৫। পৃ: ১৫

প্রথম দিকে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয় (১২০৪ খৃষ্টাব্দ) এর পূর্ব থেকে ইসলাম প্রচারকগণ বাংলায় প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু

বখতিয়ার খলজির আগমনের পূর্বে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার ধর্মীয় নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল তা সংক্ষেপে তুলে ধরাই বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

একসময় বাংলার অনার্যধিবাসীরা, আর্যদেরকে রাজনৈতিক, ধর্মীয় এমনকি সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভীষণ ভাবে প্রতিহত করতো। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগে মৌয বংশের প্রতিষ্ঠার পর আর্যদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভীষণ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। হিন্দু ও আর্যদের প্রভাব ব্যাপক রূপ লাভ করে।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্ক একটি বিখ্যাত নাম। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণ-সুবর্ণ (৬০৬ খৃষ্টাব্দ)। শশাঙ্ক ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। তিনি শিবের পূজা করতেন। শক্তি প্রয়োগ করে তিনি হিন্দু ধর্ম প্রচার করতেন। অন্যান্য ধর্মের[৭] প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করতেন। দমন নীতি চালনা করার কারণে বাংলায় অরাজকতা দেখা দেয়। ফলে তার রাজত্ব দীর্ঘ স্থায়ী হয়নি[৮]।

এরপর পাল বংশের প্রথম রাজা গোপাল ৭৫০ খৃস্টাব্দে রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। পাল বংশের সকল রাজাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তারা ৭৫০-১১৬২ সাল পর্যন্ত বাংলায় রাজত্ব করেন। তারা তাদের ধর্ম প্রচারে সর্বশক্তি প্রয়োগ করত। তারা বহু বৌদ্ধ মঠ, বৌদ্ধবিহার ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার[৯] কেন্দ্র নির্মাণ করেন।

একাদশ শতকের শেষের দিকে পাল রাজ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে তখন পূর্ববঙ্গে বর্ম উপাধীর এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্ম রাজরা বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সেন বংশের রাজা বিজয় সেন ঐ রাজ বংশের উচ্ছেদ সাধন করেন। সেন রাজাগণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝ-মাঝি পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এ বংশের শক্তিশালী রাজা

[৭]অন্যান্য ধর্ম বলতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম উদ্দেশ্য
[৮]অবদুল মান্নান তালিব, "বাংলাদেশ ইসলাম" ইফা. বাংলাদেশ পৃ: ৩১
[৯]তারা ৫০টি শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণ করেন।

লক্ষণ সেন ২৬ বছর রাজত্ব করেন[১০] । লক্ষণ সেন লক্ষণাতীতে রাজধানী স্থাপন করেন। তার দ্বিতীয় রাজধানী ছিল নদীয়া। ১২০৪ খৃস্টাব্দে লক্ষণ সেন রাজধানী নদীয়ায় অবকাশ যাপন করেছিলেন। এমতাবস্থায় ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী এক বিরাট সৈন্য বাহিনী[১১] নিয়ে তার রাজ প্রাসাদ আক্রমণ করেন। লক্ষণ সেন নৌকা যোগে পলায়ন করেন। অল্প কিছুদিন পর তাঁর মৃত্যু হয়। এর পর থেকে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আর্যদের আগমনের পূর্বে এদেশের প্রধান অধিবাসিরা ছিল দ্রাবিড়। দ্রাবিড়রা মূলত সেমেটিক অনুসারীদের উত্তর পু□ষ ছিল। তাই তৌহিদবাদ[১২] ও আসানী কিতাব সম্পর্কে তাদের ধারণা থাকাটাই স্বাভাবিক। যার ফলে তাদের সাথে পৌত্তলিক আর্য ও শিরক বাদীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্ধ ছিল। মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর আর্যদের প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আর্য ধর্ম ছিল সম্পূর্ণ তৌহিদবাদের পরিপন্থী। ব্রাহ্মণগণ বিবিধ মন্ত্রোচ্চারণ যাগ-যজ্ঞ ও বলিদানের মাধ্যমে ধর্ম পালন করত। ধর্মকার্য অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য দিত আর্য ধর্ম। যার প্রভাবে সমাজে বর্ণাশ্রম উদ্ভব হয়। এরপর ভারতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব হয়। জৈনদের সমস্ত ধর্মগ্রন্থের একমাত্র উৎস মহাবীর। জৈন ধর্মের লিখিত নির্দিষ্ট কোন গ্রন্থ না থাকার কারণে সমাজ পরিচালনায় তাদের নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। জৈন ধর্মের প্রধান শিক্ষা হল অহিংসা পরম ধর্ম। পরবর্তীকালে এ হিংসা হিন্দু ধর্মের অংশে পরিণত হয় এবং ধীরে ধীরে জৈন,[১৩] বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়[১৪] ।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায়, আর্য ও ব্রাহ্মাণ্য ধর্ম, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মদ্বয়কে নাস্তক্যিবাদের[১৫] অন্তর্ভূক্ত করেন। তাদের মতে জৈন ও বৌদ্ধরা নাস্তিক। জৈন ধর্মে এ কথা কিছুটা সত্য হলেও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ থেকে এর কোন প্রমাণ মেলানো সম্ভব হয়নি। কেননা গৌতম বুদ্ধ আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিরব ছিলেন। আর নিরবতাই হল মৌন

[১০]লক্ষণসেন ১১৭৯ থেকে ১২০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে।

[১১]সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ১৮৫ জন অশ্বারোহী সেন্য ছিল।

[১২]তৌহিদবাদ: তৌহিদবাদ বলতে আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করার নাম। যারা আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করে তাদেরকে তৌহিদবাদী বলা হয়।

[১৩]জৈন ধর্মের মূল শিক্ষা: জৈন ধর্মের মূল শিক্ষা হচ্ছে, অহিংসা পরম ধর্ম। এ অহিংসা মানুষ, জীব-জন্তু, উদ্ভিদ সবার প্রতি সমানভাবে প্রযুক্ত হবে। পরবর্তীকালে এ অহিংসা হিন্দু ধর্মেরও অংশে পরিণত হয় এবং ধীরে ধীরে জৈন ধর্ম হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

[১৪]আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত পৃ: ৪৪, ৪৭

[১৫]নাস্তিক্যবাদ: আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই যাদের।

সম্মতি। গৌতম বুদ্ধের মতে, ভগবান নিষ্ক্রিয়। তিনি স্রষ্টাকে ঈশ্বর ও ভগবান বলতে ও রাজি ছিলেন না। বুদ্ধের মৃত্যুর পর, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাসে বিকৃতি দেখা দেয় এবং তারা একাধিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ ধর্মকে ব্রাহ্মণরা আর্যদের শাখা[১৬] বলে মনে করতো। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের সাথে সাথেই তা বাংলায় প্রবেশ করে এবং খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে জৈন ধর্ম বাংলায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্বে, এবং সপ্তম শতকে জৈনের সংখ্যা অনেক বেশি হলেও পরবর্তীতে বাংলায় জৈন ধর্মের প্রভাব অনেকটা কমে যায়। আর বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে সম্রাট অশোকের আমলে।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল। কিন্তু পঞ্চম ও সপ্তম শতকে বৌদ্ধ ধর্ম বাংলায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বৌদ্ধ ধর্ম বাংলায় অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। জ্ঞান ও ধর্মানুশীলনে বাংলাদেশ বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীতে ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। অষ্টম থেকে একাদশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত পুন:রায় পাল রাজাদের অভ্যুদয়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বেশ প্রবল হয়। একাদশ শতকের শেষ ভাগ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে সেন রাজাদের অত্যাচারে তা বুলণ্ঠিত হয়।

হিন্দু ধর্ম ও সেন রাজাগণ ছিলেন বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মাবলম্বী। বাংলায় তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন রকম মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল। রাজা লক্ষণসেন ও তার বংশধর ছিলেন বৈষ্ণব। সতীদাহ প্রথার ন্যায় নিষ্ঠুর কার্যাবলী প্রচলিত ছিল সে সময়। রাজ শক্তির দাপটে হিন্দু ধর্ম শুধু ধনী ও উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সংখ্যা গরিষ্ঠতায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল বেশি।

বৌদ্ধ ধর্মের চূড়ান্ত পরিণতি দেখা যায় দ্বাদশ শতকে গৌতম বুদ্ধের সত্য ধর্ম তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে হিন্দুধর্মে যোগ দেয়। পরবর্তীতে সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটে।

[১৬]কে. এম পানিক্কর, তারিখে হিন্দে কদমী, পৃ: ২১-২৩

অষ্টম শতক থেকে বাংলাদেশে ধর্মের নামে যৌন অনাচার ও বিভিন্ন অশলীল কার্যাবলী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কুসংস্কারচ্ছন্ন হয়ে তারা পাশা খেলা, হোলি-খেলার আয়োজন করত। সমাজের নৈতিক অধ:পতনে মদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। সমাজে পতিতাবৃত্তির প্রচলন ছিল চরম মাত্রায়।

প্রাক ইসলাম যুগে সমাজে সর্বস্তরে অধঃপতন নেমে এসেছিল। ব্রাহ্মণ্য সমাজের একচেটিয়া প্রভাবের কারণে সমাজ ব্যবস্থা অসার হয়ে পড়েছিল। সামাজিক গোঁড়া, দেহগত বিলাস, যৌন কাম-বাসনা, চারিত্রিক লাম্পট্য, বাংলার সমাজকে অন্তসার শূন্য করে দিয়েছিল। শুধু ধর্মীয় নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে অনিয়ম, সামাজিক নির্যাতন, দারিদ্র্যের কষাঘাতে অবিচ্ছিন্ন অভাব, অত্যাচার, অবিচার এর সবই যেন সর্বগ্রাসী রূপধারণ করেছিল।

যুগে যুগে ভারতবর্ষে বিভিন্ন বিদেশি জাতী-গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে পারসিক, গ্রিক, শক্, হুন গুর্জর প্রভৃতি বিদেশি জাতি বিভিন্ন সময়ে ভারতে এসে রাজ্য স্থাপন করে স্থায়ীভাবে এদেশে বাস করতে শু□ করে এবং তারা হিন্দুদের ভাষা, ধর্ম ও সামাজিক রীতি নীতি গ্রহণ করে হিন্দু সমাজে বিলীন হয়ে যায়[১৭]। সুলতানী যুগে সাধারণ জনগোষ্ঠীর বড় অংশ ছিল হিন্দু।

ভারতবর্ষে রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্দশায়ই ইসলামের বাণী এসে পৌঁছে। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকেই ভারতের পশ্চিম উপকূলে মালাবার রাজ্যে (বর্তমান কেরালা) ইসলাম প্রচারিত হয়। শায়খ খায়নুদ্দীন তাঁর "তুহফাতুল মুজাহেদীস ফী বাথে আহওয়ালিল বারতা কালীন" নামক গ্রন্থে উল্লোখ করেছেন যে, ভারতের মালবার রাজ্যের রাজা চেরুমুল পারুমুল স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে মক্কা গমন করেন এবং হযরত মুহম্মদ (স.) এর দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৮] এই সময় মালাবারে বহু পৌত্তলিক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

[১৭] Sayyid Fayyaz Mahmud, The story of Indo-Pakistan, Oxford University Press, London, 1963, P: 115
[১৮]. মোঃ শফিকুল ইসলাম, ইকরা, কুরআনিক স্কুল সোসাইটি, ২০১৩, পৃঃ ১১।

এসময়ে ইসলামের সত্যবাণী বাংলায়ও প্রবেশ লাভ করে। হযরত মুহম্মদ (স.) এর কাছে উপমহাদেশের জনৈক শাসক এক ডেকচি "আদা" উপহার পাঠিয়েছিলেন বলে এ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে[১৯]।

আরব বণিক ও প্রচারকদের চেষ্টায় হিজরী প্রথম শতকেই (খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী) ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলীয় বন্দর সমূহের সাথে সাথে পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ উপকূলীয় অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় বন্দর সমূহে ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়। আরবার ভারত থেকে প্রধানত গরম মসলা, হাতির দাঁত ও নানাবিধ রত্ন ইউরোপে রপ্তানী করত। গরম মসলা উৎপন্ন হতো ভারতের দক্ষিণ এলাকায় এবং সিংহলে। হাতির দাঁতের জন্য বিখ্যাত ছিল, প্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশ। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ কালে বঙ্গরাজ্যের চার হাজার সুসজ্জিত রণদক্ষ হস্তী বাহিনীর কথা গ্রীক ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে জানা যায়। আরবি ইতিহাস গ্রন্থে বঙ্গরাজ দেবপালের (৮১০-৮৪০) পঞ্চাশ হাজার রণ-প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হস্তির উল্লেখ দেখা যায়। পঞ্চম থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত সময় লেখা চর্যাপদগুলোতে হাতির প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ রয়েছে। ষোল শতকের ঐতিহাসিক আবুল ফজলের "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে উল্লিখিত রয়েছে। বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণে "আরখং" (আরাকান) নামে একটি বিরাট দেশ আছে। চট্টগ্রাম তার সামুদ্রিক বন্দর। এখানে প্রচুর হাতি পাওয়া যায়। কাজেই সে সময় হাতির দাঁত যে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানী হতো, এ সমন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা।

এতে প্রমাণিত হয় যে, আরব দেশীয় মুসলিম বণিকদের চট্রগ্রাম বন্দরে আসা-যাওয়া ছিল। এতদঞ্চল অতিক্রম করে সুদূর চীন দেশেও তাদের যাতায়েত ছিল, এ কথা আগেই উলেণ্টখ করা হয়েছে। বিশেষ করে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দিতে বঙ্গোপসাগর ছিল সমুদ্র পথে যাতায়েতের

[১৯] Sarbatak, King of Juja (India) sent an earthen pot full of ginger to Hazrat Muhammad, (Peace be on him) the Prophet as presents according to a narration by Abu sayeed Khudri (R.). If is also reported that Hazrat Muhammad, (Peace be on him) the prophet sent Hudhye Usama and S'Ohayb to the King inviting him to accept Islam. He embraced Islam. Sarbatak also said" I saw the prophet face first in Mecca and then in Medina. (ইকরা, পৃঃ ১১-১২)

একমাত্র পথ। বাংলার উপকূলে তাম্রালিপ্ত (বর্তমান তমলুক) ও সাতগাঁও (হুগলী তীরবর্তী সপ্তগ্রাম) ছিল

অন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর। মোট কথা আরবীয় বণিকদের দ্বারা এবং সাহাবী, তাবেঈ এবং তাবে-তাবেঈগণ দ্বারা এবং পরবর্তী পর্যায় মুসলিম শাসক ও সেনাপতি দ্বারা এদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে।

প্রথমত ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিলেন ভারতীয় জনগণের বংশধর। তুর্কি শাসনের প্রথম দিকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই সামান্য। কিন্তু সুলতানী সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বহু ধর্মান্তরিত হিন্দু ও দীর্ঘকাল ভারতে বসবাসকারী মুসলমানরা ছিল ভারতীয় মুসলিম শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত[২০]। এমতাবস্থায় তুর্কি শাসক কর্তৃক বাংলা বিজয় সূচীত হয়। প্রথমে মুসলিম সুলতান, পরে স্বাধীন সুলতান এবং মোঘলগণ এদেশ শাসন করেন। এ সময় মুসলিম শাসকগণ দেশ শাসনের সাথে সাথে ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং সে লক্ষ্যে সুফি-সাধক, আলিম-উলামাকে ইসলাম প্রচার প্রসারে ও সাংস্কৃতি চর্চায় তাঁরা সহায়তা করেন।

সুতরাং বলা যায় যে, ধর্মের প্রচার ও সাংস্কৃতি চর্চায় রাজ শক্তির অবদান চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে।

[২০]কলা অনুষদ পত্রিকা, খন্ড ৫, সংখ্যা ৭, জুলাই-২০১১-জুন-২০১২ পৃ: ২০৬

অধ্যায় ঃ ২

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসার

আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক বা পরমাত্মার সাথে জীবাত্মা বা জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার সম্পর্ককে দৃঢ় করে আল্লাহর পথে আহবানের জন্য যুগে যুগে ইসলামের অনুসারীগণ ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছেন। তারা কখনো ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার বা সত্যের বাণী প্রচার করেছেন।

প্রথম থেকেই মুসলমানগণ তাদের নিজ দায়িত্ব বোধ থেকেই ইসলামের সত্যবাণী প্রচারের নিমিত্তে পশ্চিমে মরক্কো থেকে পূর্বে সুদূর চীন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ইসলাম প্রচারকদের নি:স্বার্থ সত্য প্রচার-আকাঙ্খা ও নিষ্কলুষ চরিত্র মাধুর্যই বিশ্বের সর্বত্র ইসলামকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ধারণা করা হয় মুসলিম[১] বণিকদের সাহায্যে বাংলার দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে সত্য বাণী প্রবেশ করে।

দক্ষিণ ভারতের মালাবারে রাসূল (সা.) এর সময় থেকে ইসলাম প্রচার ও গ্রহণ করা হয়েছিল বলে প্রমাণ মেলে। এরই ধারাবাহিকতাখৃস্টীয় সপ্তম শতকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে ইসলামের সত্যবাণী ছোঁয়া লাগে। ক্রমান্বয়ে তা পূর্ব চীন উপকূলে গিয়ে পৌঁছে।

আরব দেশের অবস্থান এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যস্থলে হওয়ায় আরব বণিকদের একচেটিয়া প্রভাব ইউরোপের বাজারে লক্ষ্য করা যায়।

চতুর্দশ শতকে পরিব্রাজকইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনী ও ষোড়শ শতকের ঐতিহাসিক আবুল ফজল তার "আইন- ই- আকবরী" গ্রন্থে আরব বণিকগণের চট্টগ্রাম বন্দরে আসার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৪৯৮ খৃস্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা গামা এবং অপর একজন কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার পর্যন্ত এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ স্থল ও সামুদ্রিক বাণিজ্য আরব বণিকদের পূর্ণ আধিপত্য ছিল।

---

[১]মুসলিম বণিকগণ ব্যবসার পাশাপাশি ধর্ম প্রচারেও লিপ্ত ছিলেন।

তাছাড়া খ্যাতিমান মুসলমানের ভৌগলিক ও বিশ্ব পর্যটকের প্রভাব ও বহু গ্রন্থে উলেণ্ঢখ করা হয়েছে। বাংলার দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে **"সমন্দর"** নামক একটি বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়। ড. আব্দুল করীম তার **"চট্টগ্রামে ইসলাম"** গ্রন্থে এ সমন্দরকে চট্টগ্রামের সাথে অভিন্ন বলে প্রমাণ করেন[২]।

চট্রগ্রাম অঞ্চলের সাথে যে অতি প্রাচীন কাল থেকে আরব বণিকদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এভাবে অষ্টম ও নবম শতকে আরবীয় মুসলমান বণিকরাই একইভাবে চীন পর্যন্ত বাণিজ্য করতেন।

ব্যবসা বানিজ্যই কেবল তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। নিজেদের দায়িত্ববোধ থেকে তাঁরা ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। সমগ্র বিশ্বের মানব জাতিকে আলোর পথ দেখানো, তারা ধর্মীয় ও মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করতেন।

বস্তুত বাংলার উপকূলে আরব বণিকদের আগমনের মাধ্যমেই এদেশে ইসলাম প্রচারের সূত্রপাত ঘটে।

প্রথম থেকেই ইসলামী দাওয়াত বা প্রচারের মূল টার্গেট হলো মানব স্বভাব, যুক্তি, প্রযুক্তি ও প্রজ্ঞাময় কৌশল অবলম্বন। যেখানে মানুষ তাদের জীবনের সর্বস্তরে ইসলামকে একমাত্র আদর্শ হিসাবে পৌঁছাতে পারবে; সত্য সুন্দর ও কল্যাণের বাণীর প্রচারণা হবে; ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা-ই হবে ইসলাম প্রচার ও প্রসার কাজের প্রাথমিক ও বৈষয়িক সফলতা।

ইসলামের আভির্বাবের ফলে আরব বাণিজ্য ভিত্তিক অর্থনীতি, একদিকে মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তার অন্য দিকে ইসলাম প্রচারে সহায়ক হয়। তাই বলা যায় ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির কেবলমাত্র আরব বণিকদের প্রচেষ্টার ফল।[৩]

নির্ভরযোগ্য ইতিহাস হতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী বিপ্লবের প্রথম কয়েক বসরে নবূয়াত ও প্রথম খলীফার আমলে না হলে ও দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.) এর খিলাফত

---

[২]খান বাহাদুর হামীদুল্লাহ রচিত, "আহাদীসুল খাওয়ানীন" গ্রন্থে ও চট্টগ্রামের ভৌগলিক বিবরণ রয়েছে।

[৩]আব্দুর রহীম "হাদীস সংকলনের ইতিহাস", বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫, পৃ. ৬৬২-৬৬৩

কালে বিশ্ব নবীর সাহাবীগণের কেউ কেউ এই উপমহাদেশে আগমন করেছিলেন। এই বিষয়ে যে কয়জন সাহাবীর ভারত আগমনের সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন:

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুলণ্ঢাহ ইবনে উতবান

২. হযরত আছেম ইবনে আমর আত তামীমী,

৩. হযরত ছুহার ইবনে আল আবদী

৪. হযরত সুহাইব ইবনে আদী

৫. হযরত আল হাকাম ইবনে আবিল আছ আস সাফাফী (রা.)

অত: পর হযরত উসমান হযরত আলী ও আমীর মুয়াবিয়ার শাসন আমলে ও ভারতে সাহাবীদের আগমন অব্যহত থাকে। কিন্তু এই যুগে ভারত আগমনকারী মাত্র তিনজন সাহাবীর সন্ধান পাওয়া যায়। হযরত উসমানের খিলাফত কালে যে দুই জন সাহাবী ভারতবর্ষে আগমন করেন তারা হলেন:

যরত উবাইদুল্লাহ ইবনে মামর আত তামীমী ও

হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা ইবনে হাবীর ইবনে আবদে শামস।

আমীর মুয়াবীয়ার যুগে আসেন হযরত সিনান ইবনে সালমাহ ইবনে আল মুহাব্বিক আল হুযালী। তদানীনন্তন ইরাক শাসনকর্তা জিয়াদ তাকে ভারত সীমান্তের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠিয়ে ছিলেন।

সাহাবীদের পর বহুসংখ্যক তাবিঈ ভারতে আগমন করেছিলেন, ইতিহাস হতে প্রমাণ পাওয়া যায়। আমীর মুয়াবীয়ার যুগে সর্ব প্রথম যে তাবিঈ ভারত আগমন করেন তিনি হলেন মুহলাব ইবনে আবূ ছফরা। তিনি ৪৪ হিজরী সনে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা সাহাবীর সংগে একজন সেনাধ্যক্ষ হিসাবে এখানে পদার্পন করেন। তিনি সিজিস্তান[৪] ও কাবুল সীমান্ত অতিক্রম করে লাহোরে এসে উপনীত হন।

বাংলার উপকূল থেকে অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত আরব বণিকদের যাতায়াত সম্পর্কে ড. এ. রহীম তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, ইবনে খুরদাদ বা মাসউদী আল ইদ্রিসী প্রমুখ আরব ভৌগোলিক পর্যটকগণ মেঘনার মোহনা থেকে কক্সবাজার উপকূল অঞ্চল পর্যন্ত (আরবীয় বণিকরা)

[৪]সিজিস্তানকে সিস্তান ও বলা হয়।

আগমন করেছিলেন।

তাই বলা যায় ইসলামের আবির্ভাবের পর আরব বাণিজ্য ভিত্তিক অর্থনীতির উন্নতির পাশা পাশি মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তার, ইসলাম প্রচারে প্রসারে সহায়ক হয়।

স্থল পথ

মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের অভিযানের পূর্ব থেকেই স্থল পথে ভারতে মুসলমানদের আগমন শুরু হয়। সমগ্র উপমহাদেশে প্রবেশ মূলত সিন্ধুর পথ ধরেই হয়েছিল। প্রথমে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) র আমলে অর্থাৎ ১৫ হিজরী সনের মধ্যভাগে সিন্ধু অভিযান শুরু হয়। উল্লেখ্য যে ৪৪ হিজরীতে আমীর মুয়াবীয়ার শাসনামলে সেনাপতি মুহাল্লাব ইবনে আবূ সূফরী সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করেন। মুহাল্লাবের পর কতিপয় ব্যক্তি যারা সিন্ধু সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করে। তাদের মধ্যে ছিলেন:-

১. আবদুল্লা ইবনে সাওয়ার
২. রাশেদ ইবনে আমর জাদীদী
৩. সীনান ইবনে সালামাহ
৪. আব্বাস ইবনে যিয়াদ
৫. মুনযির ইবনে জারুদ আবদী[৫]

এসব অভিযান পরিচালনা তারা কখন ও সফল কখন বা ব্যর্থ হলেও, মহানবী (সা.) এর বাণী তাদেরকে প্রেরণা যুগিয়েছে বার বার।

ভারত বিজয় সম্পর্কে রাসূল (সা.) নিশ্চয়তা দান ও কতিপয় সাহাবীদের বাণী এবং আবূ হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ইসলাম প্রচার ও প্রয়াসের পথকে সুগম করে দেয়।

এক বর্ণনায় সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.)আমাদের হিন্দু ভারত অভিযানের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়েছেন।"

"সে সময় আমি জীবীত থাকলে তাতে অবশ্যই আমর ধন ও প্রাণ দান করতে কুণ্ঠিত হতাম না। এতে যদি আমাকে হত্যা করা হয়, তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদের অন্তর্ভূক্ত হবো।আর যদি

[৫]আবদুল মান্নান তালিব, "বাংলাদেশে ইসলাম" ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃ. ৭১।

আমি সহী-সালামতে ফিরে আসতে পারি তাহলে আমি হবো দোযখ মুক্ত।"[৬] (আবূ হুরায়রা) অবশেষে ৭১২ খৃস্টাব্দে (৯৩ হিজরী) মুহাম্মদ ইবনে কাসিম সমগ্র সিন্ধু জয় করেন। জানা যায়, মুহাম্মদ ইবনে কাসিম সিন্ধু বিজয়ের পর হিজরী প্রথম শতাব্দীতে ভারতের অভ্যন্তরে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে। মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজয়ের সূত্র ধরেই স্থল পথে মুসলমানদের আগমন খুব দ্রুততর হয়। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন উপনিবেশও বসতি গড়ে উঠতে শুরু করল। ধীরে ধীরে বহু অমুসলিম নর-নারী ইসলামের পতাকা তলে সমাসীন হতে লাগল। ইসলাম প্রচারের প্রয়াস আরো বেড়ে গেল।

অষ্টম ও নবম শতক থেকে স্থল পথে বাংলাদেশ ইসলামের সংস্পর্শে আসে বলে প্রমাণমেলে।

অষ্টম শতকের দিকে ধর্ম পাল ও খলীফা হারুনর রশীদ[৭] এর মধ্যে সম্পর্কের সূত্র ধরে হারুনর রশিদের সাথে ধর্ম পালের যোগাযোগ এক নতুন সম্ভাবনার সাড়া দেয়। এভাবে বাগদাদ ও বাংলার মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে উঠে। ধীরে ধীর উভয় দেশের মনীষী ও পন্ডিত বর্গ বাংলাদেশে গমন করে। বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানাহরণ করার চেষ্টা চালায়।

তাই এ আলোচনা থেকে বলা যায়, কখন? কোথায়? কিভাবে? কারা ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলো তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

● ইসলাম প্রচারের ইতিহাস আলোচনা করলে বুঝা যায়, একাদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত সাতশো বছর ছিল উলেণ্ঢখযোগ্য সময় কাল। বাংলাদেশের ইসলাম প্রচারের সোনালী অধ্যায়। বলা যেতে পারে, শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম কে চতুরদিকে প্রচার ও প্রসারের এক অনুকূল পরিবেশ বিরাজমান ছিল।

● বিখ্যাত লেখক আবদুল মান্নান তালিব তার"বাংলাদেশে ইসলাম" গ্রন্থে একাদশ থেকে সপ্তদশ শতক কে তিনটি পর্যায়ে বিভাজন করেছেন।

●প্রথম পর্যায়- একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদকে ইসলাম প্রচারের শৈশব ও কৈশোর অবস্থা বলেছেন।

---

[৬] নাসায়ী,কিতাবুল জিহাদ ও মুসনাদে আহমদ, এ-হাদীসটি আছে।

[৭] খলীফা হারুনর রশীদ আব্বাসীয় খলীফা ছিলেন।

● ২য় পর্যায়- ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয় পাদচতুর্থ শতককে ইসলাম প্রচারের যৌবন কাল।

● ৩য় পর্যায়- পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইসলাম প্রচারের ধারা মন্দীভূত হতে থাকে বলে তিনি উল্লেখ করেন।[৮]

[৮]আবদুল মান্নান তালিব, পূর্বোক্ত পৃ. ৭৫।

অধ্যায় ঃ ৩

ইসলাম প্রচার ও প্রসারেরাজন্যবর্গের ভূমিকাঃ

বাংলাদেশে প্রধাণত সূফী-সাধকগণের দ্বারা ইসলাম প্রচার ও প্রসার ঘটে। তবে তাঁরা ইসলাম প্রচার-প্রসারে সহায়তা পেয়েছিলেন বাংলার সুলতান, স্বাধীন সুলতান, মোঘল তথা রাজন্যবর্গের। তাদের বিভিন্ন রকম সহযোগিতা না পেলে সূফী সাধক ও আলিম-উলামা বাংলায় ইসলাম প্রচারে কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভ করতে পারতেন না। তখন বাংলার মুসলিম ইতিহাস হত অন্যরকম । সূফী সাধকগণের ইসলাম প্রচার ও প্রসারে তারা সর্বোত্র ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। ধর্ম প্রচারের পর মসজিদ-মাদ্রাসা খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। অত:পর ইসলামী সংস্কৃতি চর্চাও সম্প্রসারণে তারা যে অবদান রেখেছেন তা ইতিহাসের চির অম্লান থাকবে।

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার (১২০১-০৩ খৃস্টাব্দ) পর পরই মুসলমান শাসকগণ ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। পাশা পাশি ইসলামী শিক্ষা প্রসারে মনোযোগ দেন এবং বিভিন্ন স্থানে আলিম-উলামাকে দিয়ে মাদ্রাসা মসজিদ স্থাপন করেন। ফার্সি ছিল তাদের সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র ভাষা আরবি ছিল ইসলামী সাহিত্যের বাহন। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সেখানে মাদ্রাসা গুলোতে ফার্সি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল একান্ত স্বাভাবিক। এ ভূ-খন্ডে আরবি ভাষার প্রচলন ধর্মের তাগিদে এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ফার্সি ভাষারচর্চা ছিল একটানা ৬ শত বছর ধরে।[১]

১২০১-৩ সালে মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বঙ্গের এক বিরাট অংশ জয় করেন।[২] তিনি এখানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন। মুহম্মদ খলজি বাংলার অস্থায়ী প্রাক্তন রাজধানী নদীয়া শহরের বিকল্প রূপে রংপুর শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ্ স্থাপন করেন। এ সব প্রতিষ্ঠানছিল মুসলিম সংস্কৃতির সুতিকাগার। এসব প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই আরবি, ফার্সি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত বলে অনুমিত হয়।[৩]

---

[১]আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস, ঢাকা- বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ-৫১৬।

[২]তার রাজ্য সীমা ছিল গৌড় থেকে নদীয়া শহর পর্যন্ত।

[৩]Ikram S.M and spear (CD), Cultural Heritage of Pakistan, London, Oxford University press, 1955. P-iii

সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইত্তয়ায় খলজী ১২১৩ থেকে ১২২৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেন। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি বাংলার রাজধানী লক্ষনৌতি শহরে স্থানান্তরিত করে (১২১৯) ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সূফী-সাধক ও আলিম-উলামার সহায়তায় তথায় একটি মসজিদ, একটি মাদ্রাসা ও একটি পান্থশালা স্থাপন করেন। সুলতান গিয়াস উদ্দিন আলিম-ফাজিলদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রর্দশন করেন।[৪]

তিনি ইসলাম প্রচারের স্বার্থেই আলিম-উলামার সম্মান প্রর্দশন করতেন। ত্রয়োদশ শতকের (খৃস্টীয়) প্রথমার্ধে মাওলানা তকিউদ্দিন আরাবী বাংলাদেশে আগমন করেন এবং মাহিসন্তোষে শিক্ষা দান কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। খুব সম্ভব তিনি আরব দেশ থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছিলেন। তাই তার মাদ্রাসাটিকে বাংলার প্রথম ইসলামিয়া মাদ্রাসা বলা যায়।[৫]খুব সম্ভব, এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় তৎকালীন সুলতান সহায়তা করেছিলেন।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন ১২৬৬-১২৮৭ (খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত বাংলার সুলতান ছিলেন। তার সহায়তা নিয়ে আল্লামা শরফুদ্দিন আবূ তাওয়ামা সোনারগাঁ একটি মাদ্রাসা ও খানকাহ স্থাপন করেন। শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা ও তার ছাত্র ইহাইয়াহ মানিরী (পরবর্তী কালে জামাতা) দুজন মিলে সোনারগাঁও এ একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

উস্তাদ ও শাগরিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সোনারগাঁয়ের এই ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রটি তদান্তীন বাংলা তথা গোটা উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষা ধারায় শ্রেষ্ঠ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এ সময়ে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু অনুসন্ধ্যিসু শিক্ষার্থী ও অনেক খ্যাতনামা ইসলামী শিক্ষাবিদ সোনারগাঁয়ে আগমন করেন। বলা হয়, ইতিপূর্বে, এত বড় ইসলামীয়া মাদ্রাসা উপমহাদেশে আরকোথায়ও স্থাপিত হয়নি। এখানে শায়খ আবূ তাওয়ামাহ্ সর্ব প্রথম সহীহান অর্থাৎ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এর শিক্ষাদান শুরু করেন।

---

[৪]আবদুস সাত্তার, তারীখে- এ মাদ্রাসা-এ- আলিয়া, ঢাকা, ১৯৬৯ পৃ: ২২।

[৫]আবদুল মান্নান তালিম, বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী বাংলা বাজার ঢাকা, ১৯৮০, পৃঃ ৯৭-১০০।

অতঃপর ধীরে ধীরে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে হাদীস-তাফসীর, ফিকাহ ও আকাইদের শিক্ষা অধিকতর প্রসার লাভ করতে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে লখণৌর ফিরিঙ্গীমহল মাদ্রাসা এবং আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বর্ধমানের বুহার মাদ্রাসা ও কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর ভারতে ইসলামী শিক্ষার প্রখ্যাত বিদ্যাপীঠ দেওবন্দ মাদ্রাসা ও সাহরানরপুর মাদ্রাসা গড়ে ওঠে। সুতরাং মনে হয়, এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এ উপমহাদেশে আন্তজার্তিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী তথা আরবি শিক্ষায়তনের ভিত্তি সর্বপ্রথম স্থাপিত হয় সোনারগাঁও তথা বাংলাদেশেই। এদিক থেকে আবূ তাওয়ামাহ্ আল-বুখারীকে বাংলার ইসলামী তথা আরবি শিক্ষা পথিকৃৎও বলা যেতে পারে।[৬]

দ্বিতীয় গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ্ ১৩৮৯-১৪০৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি আলিম-ওলামার সহায়তা নিয়ে ইসলাম তথা জ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটান।

শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ্ ১৪৭৪-৮১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এদেশে শাসন কার্য পরিচালনা করেন। তিনি আলিম-ওলামার সহায়তা নিয়ে মসজিদ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এসব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম প্রচার-প্রসার করা। তিনি ১৯৭৯ সালে মাহাদীপুর ও ফিরোজপুরের মধ্যবর্তী ওমরপুরে দরগাবাড়ী নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৭]

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ও তদীয় পুত্র নসরত শাহ বাংলার হুসাইন শাহী খান্দানের শাসনর্কতা ছিলেন। তারা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেক মাদ্রাসা খানকা স্থাপন করেন। হুসাইন শাহ তার শাসন আমলে দেশ-বিদেশের পন্ডিদের আমন্ত্রণ জানান। হুসাইন শাহ ১৪৯৩ খৃস্টাব্দে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। নুসরতশাহের সহযোগিতায় তকিউদ্দিন বিন আইন উদ্দিন ১৫২২ সালে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে হাদীস, কুরআন ও ফিকাহ্ চর্চা হত।

---

[৬]নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদিসের তথ্য ও ইতিহাস, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৬৬ পৃঃ ২৬০-৬১। এছহাক মোহাম্মদ বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা সংস্কার ও সংস্থা ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা সমিতির যৌথ সম্মিলনে প্রদত্ত ভাষণ, আলিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা তাশে মার্চ ১৯৮৩ , পৃঃ ০৪।

[৭]NN Low, Promosition of Learning in India, London, 1916-pp-108-109

শায়েস্তা খান ১ম দফা ১৬৬৩ থেকে ১৬৭৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত, দ্বিতীয় দফা ১৬৭৯-১৬৮৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকায় সুবেদার ছিলেন। বলা হয়, তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য কয়েকটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন।[৮] এসব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটানো।

খান মুহম্মদ মৃর্ধা লালবাগ কিল্লার দুই ফার্লং দূরে একটি দ্বিতল মজসিদ রয়েছে, এর প্রতিষ্ঠতা খান মুহাম্মদ মৃধা। এ মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম, ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসার।

ঢাকা আজিমপুর গোরস্থানের পশ্চিমপার্শ্বে মুহাম্মদ আজমের (আওরংগযেবের পুত্র) মসজিদ বলে কথিত একটি দ্বিতল মসজিদ আছে। এ মসজিদের দোতলার উত্তরাংশে কয়েকটি প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ রয়েছে। এগুলো মাদ্রাসা রূপেই ব্যবহৃত হয়। দোতলা দেয়ালে খোদিত শিলালিপি (ফার্সি) থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ মাদ্রাসা সংযুক্ত মসজিদ আধ্যাত্মিক[৯] শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১১৬০ হিজরী/১৭৪৭ খৃস্টাব্দে ফয়জুল্লাহ নামক জনৈক আরিফ কৃর্তক প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে এতে যাহিরী শরীয়তের তালীমও হয়ে থাকবে।

এই মসজিদের দক্ষিণ দিকে অল্প কিছু দূরে একটি খানকাহ্ রয়েছে। যা আজিমপুর দায়েরা নামে অবিহিত। এখানে আজও দু-একজন বুযুর্গ পূর্ব-সূরীদের পূন্য স্মৃতি জিয়েই রেখেছেন। এরা জনগণের শ্রদ্ধার পাত্র।

মুর্শিদ কুলীখান (১৭১৭-২৭ খৃস্টাব্দ) একজন ধর্মপ্রাণ সুবেদার ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদে "কাটারা মাদ্রাসা" নামক একটি বড় মাদ্রাসা এবং তৎসংলগ্ন একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। গুলাম হুসাইন তবাতবাঈ বিরচিত "সিয়ারুল মুতা আখখিরীন" পাঠে জানা যায় যে, আলি বর্দী খা মুর্শিদাবাদী ছিলেন জ্ঞান পূজারী। তিনি তার শাসন আমলে (১৭৪০-৪৬) আযিমাবাদ (পাটনা) থেকে আলিম-ফাজিলদের আমন্ত্রণ করে মর্শিদাবাদে এনে ছিলেন। মীর মুহাম্মদ আলী, হুসাইন খাঁ, আলী ইব্রাহীম খাঁ, হাজী মুহাম্মদ খাঁ ছিলেন তাদের

[৮]যুবায়ের, মুহাম্মদ, ইসলামী কুতুবখানে, দিল্লী মাকতাবা-এ- বুরহান, ১৯৬১, পৃঃ ২৮৯।
[৯]ইলম দু প্রকার ঃ যাহিরী ইলম এবং বাতিনী ইলম। বাতিলী ইলম এর অপর নাম আধ্যাত্মিক ইলম।

অন্যতম। মীর মুহম্মদ আলী একটি বড় গ্রন্থগারের অধিকারী ছিলেন। এতে দু হাজার বই ছিল।[১০]

সে সময়ে মুদ্রণের সুযোগ ছিল সীমিত। তাই অনুমিত হয় যে, এগুলোর অধিকাংশ ছিল পান্ডুলিপি। গ্রন্থ সংগ্রহের এরূপ প্রচেষ্টা সে সময়কার আলিম-ফাজিলদের জ্ঞান অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক।

বর্ধমান জেলার বুহার মাদ্রাসা ও বুহার গ্রন্থগারটি ছিল সেখানকার বিখ্যাত জমিদার মুন্সী সদরুদ্দিন আহম্মেদ প্রতিষ্ঠিত আরবি- ফার্সি চর্চা একটি বিশাল কেন্দ্র। কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সহযোগিতায় ১৭৬৪ -৬৫ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি ইসলাম শিক্ষা, প্রচার ও প্রসারের জন্য স্থাপন করা হয়। এ মাদ্রাসা ও গ্রন্থটির বাংলার ইসলামী শিক্ষা তথা আরবি ফার্সি চর্চার ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছিল। মুন্সী সদরুদ্দিন ফিরিঙ্গী মহলের (লখনৌ) স্বনামধন্য মাওলানা আবদুল আলিম বাহারুল উলূম[১১](মৃত:)

১২৩৫/১৮২০) কে এ মাদ্রাসার শিক্ষাদানের জন্য ডেকে আনেন। মাওলানা সাহেবকে চারশত টাকা মাসিক বেতন দেওয়া হত। এছাড়া তার একশত শাগরিদের জন্যও সদরুদ্দিন মরহুম বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন।[১২]

মোট কথা বাংলার সুলতান, স্বাধীন সুলতান, মোঘলদের দ্বারা এদেশ বিজিত হয়। বিজিত অঞ্চলে সুলতানগণের সহযোগীতা নিয়ে সূফী-সাধক ও আলিম-উলামা এদেশে ইসলামের প্রসারে সর্ব শক্তি নিয়োগ করেন। তারা মাদ্রাসা মক্তব ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী কালে ঐ সব মাদ্রাসা-মক্তব উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়।[১৩] সুতরাং বলা যায় যে, ইসলাম প্রচার ও প্রসারে এবং ইসলামী সংস্কৃতি চর্চায় রাজন্যবর্গের অবদান চির স্মরনীয় ও চির অম্লান হয়ে থাকবে।

---

[১০]আবুল হাসনাত নাদবী, হিন্দুস্থান-কী-কাদীম দরসগাহে, আযমনগড়, ১৩৫৫ হিঃ, পৃঃ ৫৮।

[১১]বাহরুন উলূম মানে বিভিন্ন জ্ঞানের সাগর। তিনি যেহেতু ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখতেন। সেহেতু তার উপাধি ছিল বাহারুল উলূম।

[১২]মানাযির আহসান গালানী, হিন্দুস্থান-মে-মুসলমানুকা নিযাম-এ-তালীম-ওয়া-তারাবীয়ত (২) হায়দরাবাদ, ইন্ডিয়া ১৯৪৩ পৃঃ ২২-২৩

[১৩]ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ইং, পৃঃ ৯।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ৪

বাংলাদেশের ইসলাম প্রচারে সূফী-আলিমগণের ভূমিকা

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে সূফী ও আলিমগণের[১] ভূমিকা অপরিসীম। জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার সম্পর্ক স্থাপনের সূত্র ধরে সূফীবাদের আগমন ঘটে। বাংলাদেশের ইসলাম প্রচারের সাথে তাঁদের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সূফীও আলিমগণের অসামান্য প্রচেষ্টার ফলেই ইসলাম সুদূর প্রসারতা লাভ করে। মানুষ বৈচিত্রময় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাদের রয়েছে মনস্থাত্বিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি। নানা প্রকার বাঁধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে তারা ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করে। আল্লাহ তায়ালার একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলামকে সু-প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন এমনকি জীবনের উপর অনেক ঝুঁকি বা বিপদাপদকে বার বার আলিঙ্গন করেছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে সব কিছুকে তার রাস্তায় কুরবানী দেয়ার মনোবৃত্তি থেকে সূফী ও আলিমগণের ইসলাম প্রচার ও প্রসার ঘটে, যা বাংলাদেশের ইসলাম প্রতিষ্ঠাকে আরো বেগবান বা জোরদার করেছে।

সূফীও আলিমগণ বাংলায়[২] আগমন করেন মূলত আরব, ইয়ামান, ইরাক, খোরাসান, মধ্য এশিয়াও উত্তর ভারত থেকে। সূফীগণ বাংলাদেশের ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন খানকাহ্, মসজিদ, মাদরাসা কখনো বা স্থাপন করেছে বসতি। সকল প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে বাংলায় ইসলাম কে করেছেন সু-প্রতিষ্ঠিত।

মানুষ সাধারণত তিনটি উপাদান ধারা নিয়ন্ত্রিত হয়: হৃদয়ানুভূতি, বুদ্ধি, ইন্দ্রয়ানুভূতি। আর তারই বহি:প্রকাশ ঘটে সূফী, আলিমগণের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে। তাদের জীবন,কায-কলাপ, চিন্তা ধারা, তাদের বুদ্ধিমত্তা, অলৌকিক শক্তি, কারামত সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট

[১] বাংলাদেশে ধর্ম প্রচারে সূফী সাধকগণের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। পরবর্তীতে উলামা উক্ত কাজে আত্মনিয়োগ করেন।
[২] বাংলায় বলতে বর্তমান বাংলাদেশকে বুঝানো হয়েছে।

করেছে। সত্যিকার ধর্ম ইসলামকে সু-প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কখনো কখনো তারা হিন্দু সামন্ত রাজাদের সাথে যুদ্ধ ও পরিচালনা করেন। ইসলাম সংস্কার মুক্ত ধর্ম। সূফী সাধকগণ ছিলেন উদার ও সংস্কার মুক্ত। সংসার ত্যাগী সূফী সাধকগণের ধর্ম প্রচারের ফলে হিন্দু ধর্মীয় রীতি যেমন, নরপূজা, প্রতীক পূজা, মূর্তি পূজা ইত্যাদি ধর্মীয় আচরণের রূপ অনেকটা পরিবর্তন হয়েছিল।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা হল এ ধর্মের মূল লক্ষ্য। তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সামাজের নির্মম বিধানে নর-নারী অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হয়েছিল। সূফী সাধকগণ তাদের উদারতাও সমানাধিকারের নির্দেশনা দিলেন। তাদের এ অভিযানের ধারা অপ্রতিহত ভাবে চলতে থাকার কারণে মুসলামানদের বিজয়, ব্যবসা বাণিজ্য, পীর-ফকীরও দরবেশগণ অসংখ্য অমুসলিম নর-নারীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন।

সূফীদের অনাড়ম্বর , সহজ, সরল জীবনাচরণ দেখে এদেশের হিন্দু , বৌদ্ধ, হাজার হাজার মানুষ ইসলামের মহিমায় মোহিত হয়ে নিজেরা বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়।

ইসলামের মূল বাণী হলো একত্ববাদ অর্থাৎ এক আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করণ। পবিত্র কুরআনের সূরায়ে ইখলাস এআল্লাহ পাক বলেছেন,"আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়।"[৩]

মহান আল্লাহ পাকের এই একত্বাবাদকে প্রচার ও প্রসারের জন্য সূফী-আলিমগণ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। সমুন্নত রেখেছেন মহান আল্লাহ পাকের একত্ববাদের ধারণাকে। খোদা প্রেমই সূফীবাদের মূল বৈশিষ্ট্য। এজন্য সূফীবাদ প্রেম ধর্ম নামে ও পরিচিত। সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভর, আত্মশক্তির পূর্ণ বিকাশ করাই সূফীর লক্ষ্য। আর এটাই হল ইসলামের শিক্ষা।

রাসূল (সা.) ইন্তিকালের পর সাহাবী, তাবঈ, তাবে-তাবিঈন, পীর-আউলিয়া, সূফী-সাধকগণই হলেন প্রকৃত পথের দিশারী । বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র.), মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমি (র.), খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (র.), বাহাউদ্দীন নকশ্‌বন্দী (র.),

[৩] সূরা "ইখলাস", আয়াত ১

মুজাদ্দীদে আল ফেসানী (র.) প্রমুখ বুজুর্গগণ আধ্যাত্মিক পদ প্রদর্শক সূফী ও আউলিয়া ছিলেন।[৪] এদের অনুসরণ করে বহু সূফী-সাধক ও দরবেশ বাংলাদেশের ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে যারা অবদান রাখেন তাদের কর্ম-পদ্ধতি নিম্নে প্রদত্ত হলো:

হযরত শাহ্ সুলতান বলখী (র.)

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়ে যারা অসামান্য অবদান রেখেছিলেন তাদের মধ্যে শাহ্ সুলতান বলখী (র) অন্যতম। তিনি বগুড়া জেলার মহাস্থান গড়ে ইসলাম প্রচার করেন। ১৬৫৮ খৃস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় তাঁর নাম লেখা হয় মীর সৈয়দ সুলতান মাহমুদ মাহিসওয়ার।[৫] প্রাচীন পৌন্ড্রবর্ধন রাজ্যের রাজধানী এ মহাস্থানে অবস্থিত ছিল। সেখানেই তাঁর মাযার অবিস্থত।

শাহ সুলতান বখলী (র.),আসগর নামে কোন এক রাজার পুত্র ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করে। তিনি বিলাসিতায় গা-ভাসিয়ে দিলে রাজ্য শাসন এ দেখা দেয় নানা প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু মহান আল্লাহ পাক যার কল্যান চান, তাকে কোন না কোন উপায়ে হেদায়েত দান করেন। ঠিক তেমনি ভাবে তাঁর সময়ে রাজ্যে যে অত্যাচার ও জুলুম শুরু হয়েছিল, শুধুমাত্র একটি ঘটনার সূত্র ধরে জীবনের মোড় ফিরে গেল তাঁর ।

রাজকীয় শোফায় শুয়ে থাকার অপরাধে জনৈকা ক্রীতদাসীকে তিনি প্রচন্ড বেত্রাঘাত করেন। যন্ত্রনায় কাতর ক্রীতদাসটি যখন বললেন,এক মুহূর্তের আরামের জন্য যদি আমার এরকম শাস্তি হয়ে থাকে তাহলে না জানি কত-না শাস্তি উপভোগ করতে হবে এই রাজাকে। দুনিয়ার বিলাসিতা ও আরাম আয়েশের জন্য। ক্রীতদাসীর এ যন্ত্রনা নি:সৃত বাণী রাজার হৃদয়ে গভীরভাবে আঘাত করতে থাকে। রাজা তখন গভীর চিন্তায় কাতর হয়ে পড়ে এবং মানসিক যন্ত্রনায় ছট-ফট করতে থাকেন। ভাটা পড়ে রাজ কার্যে। নিজেকে পরিশুদ্ধ করার জন্য মনের

[৪] ড. গোলাম সাফলায়েন, "বাংলাদেশের সূফী সাধক" ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৌষ ১৩৬৮, পৃ. ৩২।

[৫]মাহী সওয়ার অর্থ মাছের আকৃতির নৌকা, যাতে আরোহন করে হযরত শাহ বলখী র. সন্দীপে আগমন করেছিলেন।

অজান্তে সূফী শায়খ তওফীকের মুরিদ হন। ৩৬ বছর আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত থাকার পর গুরুশিষ্য দুজন বাংলায় ইসলাম প্রচার কাজে মনোনিবেশ করেন।

শাহ্ সুলতান বলখী মাছের আকৃতির নৌকায় চড়ে সমুদ্র পথে সন্দ্বীপে আগমন করেন বলে জানা যায়। যার জন্য তাকে "মাহী সওয়ার বা মৎসারোহী বলা হয়।" কিছু দিন সেখানে থেকে বলরাম নামক এক রাজার রাজ্য হরিরাম এ চলে আসেন। (ঢাকার হরিরাম এলাকায়) এবং বিরামহীনভাবে সোজা মন্দিরে উপস্থিত হলেন। মন্দিরে বিরাট আকৃতির কালী-করালীর চার পাশ ঘিরে ছিল ছোট, বড়, মাঝারী আকৃতির মূর্তির সমারোহ। রাজা ছিলেন কালী দেবীর উপাসক।

মন্দিরে উপস্থিত হয়ে সুলতান বলখী আযানের ধ্বনী উচ্চারণ করলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে দেব দেবীর মূর্তি গুলি ভেঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল।[৬] এরূপ দৃশ্য অবলোকন করে রাজা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি তাকে দেয়া (দরবেশকে) রাজ্য থেকে বিতাড়িত করবেন। এমতাবস্থায় রাজা সেনাবাহিনী পাঠালেন কিন্তু তাতে কোন আশানুরূপ ফলাফল না দেখে রাজা নিজেই দরবেশকে প্রতিহত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। কিন্তু ফলশ্রুতিতে রাজার মৃত্যু ছাড়া,দরবেশের তেমন কোন ক্ষতি কেউ করতে পারেনি। বরং রাজার মন্ত্রী দরবেশের কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং দরবেশ মন্ত্রীকে রাজ সিংহাসন দান করলেন। অত:পর হরিরাম বিজয় করলেন।

হরিরাম বিজয়ের সময় তিনি অত্যাচারী শাসক পরশুরামের কথা শুনতে পান। তিনি এও শুনতে পান ক্ষত্রিয় শাসক বিশেষত: মুসলমানদের উপর নির্বিঘ্নে অত্যাচার চালাচ্ছিল। রত্নমনি নামে রাজার এক সুন্দরী কন্যা ছিল।যাদু বিদ্যায় পারদর্শী এক ভগিনী ছিল। হরিরাম নগরের নানাবিধ অত্যাচারের কথা শুনে তাদেরকে ইসলামের পতাকা তলে সমাসীন করতে চাইলেন দরবেশ। এরকম উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি মহাস্থানে পৌঁছে রাজার কাছে একটু জায়গা চাইলে, তাঁর জায়নামাজ বিছানোর জন্য। দরবেশ তার মনোবাসনা পূর্ণ করবে, তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, বিরুদ্ধাচারণ করবেন না। এই ভেবে রাজা বিনা দ্বিধায় দরবেশের দাবি পূরণ করলেন । কিন্তু পরক্ষণেই রাজা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলেন যে, দরবেশের জায়নামাজ

[৬]ড: গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত পৃ. ৮৪।

খানা বিছানোর সাথে সাথে তা রাজ প্রাসাদের চারদিক ঘিরে ফেললো। এ ঘটনায় রাজা খুব ভীত হয়ে তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ শীলাদেবীর সাথে পরামর্শ করলেন, কিভাবে দরবেশকে পরাস্ত করা যায়। শীলাদেবী তার ভাইকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা কল্পে সকল প্রকার যাদু তান্ত্রিক সাধনা নিক্ষেপ সব কিছুই তার বিফলে গেল। শীলাদেবীও পরাজিত হয়ে কালী মন্দিরে প্রবেশ করে।

পরবর্তী সময়ে সেনাবাহিনীর আশ্রয় নিয়েও কোন ফল হল না। রাজা পরাজিত হয়ে নিহত হলেন। একই পথ অনুসরণ করে তার স্ত্রী ও নিহত হলেন। রাজকন্যা রত্নামনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এ দরবেশ শীলাদেবীর সন্ধানে কালী মন্দিরে প্রবেশ করেন। কিন্তু শীলাদেবী, রত্নামনির কথা শুনে করোতোয়া নদী পাড়ি দেয়ার প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু তার পূর্বেই দরবেশকে সেই স্থানে দেখতে পেয়ে শীলাদেবী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। সেই স্থানটিকে **"শীলা দেবীর ঘাঁট"**বলা হয়। তার ভ্রাতুষ্পুত্রী রত্নামনির সঙ্গে সোহরাব নামক এক যুবকের বিবাহ হয়। সোহরাব প্রথমে পরশুরামের সেনাপতি ছিলেন পরে দরবেশের কাছ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[৭]

এভাবে কালের বিবর্তনের ধারায় মহাস্থান[৮] মুসলমানদের দ্বারা বিজয় হয়। ধীরে ধীরে সেখানে মসজিদ, অস্তানা, প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। শাহ্ সুলতান বলখী ও পরবর্তী কালে আরো অনেক সূফী-সাধক, পীর দরবেশগণের মাযার থাকায় এ অঞ্চল "মহাস্থান " "বিখ্যাত বা প্রসিদ্ধ জায়গায়" আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই নি:সন্দেহে বলা যায় বাংলাদেশের ইসলাম প্রচার ও প্রসারে এইসব সূফী-সাধকের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

---

[৭]Dr. Md. Enamul Haque," A Histry of sufism in Bangal," Dhaka, 1st end, PP. 10, 205-207

[৮]মহাস্থান অর্থ বিখ্যাত বা প্রসিদ্ধ বাঐতিহাসিক স্থান বা জায়গা। এটি বগুড়া জেলায় অবস্থিত প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্র এবং শাহ সুলতান বলখী মাহী সওয়ারের মাজার অবস্থিত।

হযরত বাবা আদম শহীদ

রাজা বল্লাল সেনের রাজত্বকালে (১১৫৮-১১৭৯ খৃস্টাব্দে) বাবা আদম শহীদ একদল সেনা সদস্য নিয়ে ঢাকা জেলার বিক্রম পুরের অন্তর্গত আবদুল্লাহপুর গ্রামে উপস্থিত হন। বাংলার ইতিহাসে একজন মাত্র বল্লাল সেনের নাম পাওয়া যায়। সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেনের পিতা বল্লাল সেন।

বাবা আদম শহীদ ইসলাম কে সু-প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি, মনোবল ও তৌহিদের বাণীকে নিয়েছিলন তাঁর মূল হাতিয়ারহিসেবে। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। তিনি ছিলেন ইসলাম প্রচারের কিংবদন্তী ।

শোনা যায়, একটি ছোট খাটো সেনা বাহিনী নিয়ে তিনি এদেশে আগমন করেন। নিজেদের খাবার যোগাবার জন্য সেনাবাহিনী তাদের স্থাপিত তাবুর পাশে একটি গরু জবাই করে। হঠাৎ একটি চিল থাবা দিয়ে মুসলিম ঘাঁটি থেকে একটুকরা গোশত নিয়ে চলে যায় দূর আকাশে। এ সময় অন্য একটি চিল প্রথম চিলটির কাছ থেকে গোশতের টুকরা ছিনিয়ে নিতে চাইলে দুইটি চিলের মধ্যে লড়াই বেঁধে যায়। যার ফলশ্রুতিতে গোশতে টুকরাটি মাটিতে পড়ে যায়। হিন্দু সেনাবাহিনী বুঝতে পারল যে, এটা কোন জবাই করা গরুর গোশত[৯]। তাই তারা তাৎক্ষণিক বিষয়টি রাজাকে অবহিত করলে রাজা বল্লাল সেন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

রাজা বল্লাল সেনের সাথে যবনদের[১০] ১৫দিন যুদ্ধ ভয়াবহ যুদ্ধ চললো, পরে হিন্দু সেনারা তাদের ক্ষতির বিষয়াটা অনুভব করলে, রাজা নিজে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হলে তা আরো বেগবান হতে থাকে।

যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত থাকে। রাজা তার পরিবার পরিজনদের যাতে মুসলমান সেনারা কোন ক্ষতি করতে না পারে, এমনকি যুদ্ধে জয় বা পরাজয় হল কি-না তার খবর পৌঁছানোর জন্য একজোড়া সংকেত বাহী কবুতর নিয়ে আসে। যুদ্ধে পরাজয় হলে রাজ পরিবারের মহিলাদের চিতায় ঝাঁপ দেয়ার নির্দেশ ছিল তার।সেজন্য রাজা চিতা প্রজ্বলিতকরে গেলেন।

---

[৯]অবদুল মান্নান তালিব পূর্বোক্ত পৃ. ৮৫

[১০] যবন অর্থ মুসলমান

অপর দিকে বাবা আদম শহীদ অদম্য সাহসিকতায় যুদ্ধে অস্ত্র চালনা করছিলেন। আচমকা তিঁনি অনুভব করলেন তাঁর মৃত্যু তাঁর খুব নিকটে। তাই তিনি যুদ্ধের ময়দানের এক প্রান্তে শেষ নামাজ আদায় করার জন্য দাড়িয়ে গেলেন। ঘটনাক্রমে এ দৃশ্য দেখে রাজা সুযোগ এর আশ্রয় নেয়। বাবা আদম শহীদ নামাজরত অবস্থায় শত শত বার তাকে হত্যার অপচেষ্টা চালিয়ে যায়। তাতে কোন ফল হয়নি। অবশেষে বাবা আদম তাকে তাঁর তরবারি দিয়ে আঘাত করতে বললেন এবং বাবা আদম শহীদ হলেন।

কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস, রাজা তার বার্তাবাহক কবুতরের কথা ভুলে যান। রাজা যুদ্ধে জয় লাভ করে। নিয়তি যেন তার সব কিছুকে ছিনিয়ে নিল। কবুতর দু'টি সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায়।

তা দেখে রাজ পরিবারের রমনীগণ অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বিজয়ের আনন্দ খুবই ক্ষণস্থায়ী হল তার জীবনে। হঠাৎ যখন তার কবুতরের কথা মনে পড়ল, দৌড়ে তিনি রাজ প্রাসাদের দিকে ছুটে এসে দেখলেন তার পরিবার পরিজন সবাই অগ্নিকুন্ড প্রাণ দিয়েছে। যুদ্ধে জয়ী রাজা দু:খে অনুশোচনায় স্ব-পরিবারে আগুনে পুড়ে মরে। যার জন্য তাকে "পোড়া রাজা" উপাধি দেয়া হয়। অন্যদিকে রাজার হাতে নিহত বাবা আদম লাভ করলেন "শহীদ" উপাধি । তাঁর সাধনা ও আদর্শ সফলতা লাভ করল। সমগ্র এলাকায় ইসলামের অমিয় ধারা বিজিত হল। আব্দুল্লাহপুর তার মাযার মোবারক অবস্থিত। মাযারের অদূরে ৮৮৮ হিজরী সালে (১৪৮৩ খৃস্টাব্দে) কাফুর নামক এক ব্যক্তি "আদম শহীদ মসজিদ" নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন[১১]। রাজা বল্লাল সেন ১১৭৯ খৃস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করে[১২] এবং বাবা আদম শহীদ ১১৭৯ খৃস্টাব্দে বাংলায় আগমন করেন বলে অনুমান করা যায়। বাবা আদম শহীদ নামটির সাথে আবদুল্লাহপুর নামটির গভীর সম্পর্ক জড়িত। তিনি (বাবা আদম শহীদ) এ লাকায় ইসলাম প্রচারের পূর্বে আরো অনেক ইসলাম প্রচারক আগমনের আভাস পাওয়া যায়। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের সূত্রপাত হয়েছে সূফী সাধকগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের

[১১]Board of Researchers, Islam in Bangladesh, through ages, Islamic Foundation of Bangladesh, P.18
[১২]যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত, বিক্রম পুরের ইতিহাস, ১ম খন্ড, ২য় সংস্করণ, ১৩৪৬, ৩৫১-৩৫২

ফলে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁরাই হলেন বাংলাদেশের ইসলাম প্রচারের অগ্রপথিক। তাদের জীবন, কর্ম, সাধনা, মনোবল, অলৌকিকতা এ সবই যেন বাংলার ইসলাম প্রচারের ধারাকে সচল, গতিময়ও শক্তিশালী করেছে। যা কালের সাক্ষী হয়ে আছে। গোপাল ভট্ট রচিত "বল্লাল চরিতম" নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এই বিবরণ রয়েছে। রামপালের নিকটবর্তী কাজী কসবা নামক স্থানে বাবা আদমের মসজিদটি অবস্থিত। কসবা ফার্সী শব্দ, অর্থ নগর। রামপালের একটি অংশের নাম "নগর কসবা"। "নগর ও কসবা" শব্দ দু'টির একই অর্থ নগর। তাই ধারণা করা হয় বিক্রমপুর নগরের বিভিন্ন অঞ্চলের নাম ও পরিবর্তিত হয়েছিল। যেমন: নগর-কসবা, কাজী কসবা, আব্দুল্লাহপুর।[১৩]

বাবা আদম সমন্ধে Archaeological Survey of India 1927-1928 এর বিবরণে আছে Whatever the historical truth underlying the tradadition, it seems clear that Baba Adam must have been one of the earliest pioneers of Islam in Vikrampur, the most important stronghold of Hindu and Buddhist influences in Eastern Bengal in the times immediately preceding the muhammad and invasion.[14]

হযরত শাহ্ মুহাম্মদ সুলতান রুমী (র.)

মহান আল্লাহ পাকের একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামকে সু-প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যত সূফী সাধক বাংলায় আগমন করেন, তাদের মধ্যে শাহ্ মুহাম্মদ সুলতান রুমী অন্যতম। তিনি একাদশ শতকের মাঝা-মাঝি সময়ে অর্থাৎ ১০৪৫ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনার মদনপুর গ্রামে আগমন করেন। এটি দক্ষিণ নেত্রকোনা থেকে ছয় মাইল দূরে। ১৭৬১ খৃস্টাব্দে ফার্সি ভাষায় লিখিত এক সনদে উল্লেখ আছে, শাহ্ মুহাম্মদ সুলতান রুমী ৪৪৫ হিজরী (১০৫৩ খৃস্টাব্দে) মদনপুরে আগমন করেন।[১৫] মদনপুর তখন কোচ রাজার শাসনাধীনে ছিল। দুই একজন সূফী দরবেশ ছাড়া, অপর কোন মুসলমানদের বসবাসের

[১৩]ঐ ১৩৪৬। পৃ. ৩৫৪-৩৫৫
[১৪]ঐ
[১৫]সুখময় মুখোপধ্যায়,"বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর" কোলকাতা, ২য় সংস্করণ ১৯৬৬, পৃ. ৫৭

তেমন কোন আদেশ ছিল না। এই আলোচনায় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সূফী সাধকগণই আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক শক্তি বলে অসংখ্য অমুসলিম নর-নারী কে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা কে উপেক্ষা করার মত ক্ষমতা কারো হতে পারে না। সূফী বা দরবেশগণ খোদার দেয়া সেই অলৌকিক ক্ষমতাকে স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই কাজে লাগান। খোদা প্রেমে আকৃষ্ট করান অন্যদেরকেও । শাহ্ মুহাম্মদ সুলতার রুমীর আগমনের কথা শুনে স্থানীয় কোচ রাজা তাকে পরীক্ষা করার জন্য বিষ পান করতে দিলেন। দরবেশ তা "বিসমিল্লাহ" বলে গিলে ফেলেন। কিন্তু দরবেশের কিছুই হল না।এ রূপ অলৌকিক দৃশ্য অবলোকন করে রাজা সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। এবং উপহার স্বরূপ তাকে ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীদের জন্য সমগ্র গ্রাম উৎসর্গ করেন। মদনপুরেই তাঁর আস্তানা ছিল। সেখানে তিনি অলৌকিক বিভিন্ন কার্য কলাপের মাধ্যমে জনগণকে ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকেন। কথিত আছে, এক বার যে এই দরবেশের সান্নিধ্যে এসেছে, সে-ই সাথে সাথে ইসলাম ধর্ম (আঁকড়ে ধরেছে) গ্রহণ করেছে। এমনকি তারা পরবর্তীতে প্রাণ উৎসর্গকারীদের শীর্ষ তালিকায় ছিল বলে জানা যায়। দরবেশের অলৌকিকতায় মুগ্ধ হয়ে রাজা পারিষদবর্গকে ইসলাম গ্রহণে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পরবর্তীতে দলে দলে লোক ইসলামের পতাকা তলে সমাসীন হতে আরম্ভ করে। দরবেশ পেলেন পীরোত্তর সম্পত্তি হিসাবে সমগ্র গ্রাম।[১৬]

বগুড়ার শাহ্ সুলতার বলখী মাহিসওয়ারের সঙ্গে সুলতার রুমী (র.) যোগাযোগ ছিল। ১৬৭১ সালে সুবাদার সম্রাট শাহ্জাহান দরবেশের মাযার সংরক্ষণের দায়িত্ব নেন। ১৮২৯ সালে সরকার রুমীর মাযারের মুতাওয়াল্লী[১৭]তাঁদের পূর্ব বর্ণিত সনদ পেশ করলেন। এ কথা প্রমাণ করেন যে, ময়মনসিংহ এলাকার প্রাচীনতম ইসলাম প্রচারক ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ শাহ্ সুলতান রুমী। মদনপুরে তাঁর মাযার অবস্থিত। সুলতান রুমীর (র:)' র প্রায় চল্লিশজন শিষ্যের মাযার এই মদনপুরেই অবস্থিত। শাহ্ সুলতান রুমী (র:) র মাযার সংলগ্ন একটি মসজিদ, একটি মুসাফির খানা ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে

[১৬]Dr. Md. Anamul Haque,"ibid,pp 209-210"

[১৭] মুতাওয়ালণ্টী হলেন, তিনি যিনি মসজিদ, মাদরাসা বা খানকাহ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন।

উল্লেখ যোগ্য ছিলেন, দারাব উদ্দীন গাজী, শাহ্ সাহেব, শাহ্ শের আলী তাতার ও সুয়া বিবি।

হযরত মখদুম শাহ্ দৌলাহ শহীদ (রঃ)

সম্ভবত: ১২৪০ খৃস্টাব্দের পরে অর্থাৎ মখদুম শাহ্ দৌলাহ শহীদ ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধের শেষের দিকে বাংলায় আগমন করেন। পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত শাহযাদপুরে তাঁর মাযার শরীফ অবস্থিত। কথিত আছে, মখদুম শাহ্ দৌলাহ শহীদ রাসূল (সা.) এর অন্যতম সাহাবী হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) এর বংশধর। Journal of the Asiatic society of Bengal, Part 1. No. 3 1904, থেকে প্রকাশিত "Antiquity and Tradition of Shazadpur"প্রবন্ধে এই দরবেশের বিবরণ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আরব দেশের ইয়েমেন[১৮] নামক স্থানের বাদশা ছিলেন মু'আয ইবনে জাবাল। তাঁর এক মেয়ে ও দুই ছেলে সন্তান ছিল। মখদুম শাহ্দৌলাহ্ সেই দুই জনের একজন। তিনি ছিলে খোদাভীরু, ধর্ম পরায়ণ ও ইসলাম ধর্মের সেবক। ইসলামের দাওয়াত দেশ বিদেশে পৌঁছে দিতে তিনি ছিলেন এক মহান দূত। ধর্মীয় অভিযানের লক্ষ্যে তিনি নিজ জন্ম স্থান ত্যাগ করেন। তাই তিনি নিজের এক ভগিনী, তিন ভাগিনেয় ও বহু অনুচরসহ বাংলায় আগমন করেন। তিনি পাবনা জেলার শাহযাদপুরে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে, ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। মখদুমশাহ্ দৌলাহ্র তিন ভাগনের নাম হল : খাজা কলান দানিশমন্দ, খাজা নূর ও খাজা আনোয়ার

কিন্তু এই দরবেশের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি ভাগনে খাজা নূরকে নিজের পুত্রহিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বাংলায় আসার পূর্বে মখদুম শাহ্ দৌলাহ্ শহীদ বুখারায়[১৯]যেয়ে জালাল উদ্দীন বুখারীর সাথে সাক্ষাৎ করলে, বুখারী তাঁকে শুভেচ্ছা বিনিময়

[১৮]ইয়েমেন ও ইয়মন - দুভাবেই পড়া যায়।

করেন এবং এক জোড়া জালালী কবুতর উপহার দিলেন। পারস্যের মরমী কবি মাওলানা রূমীর গুরু শামসুদ্দিন তাবরিজীর শিষ্য ছিলেন। বুখারী ১১৯৬-১২৯১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ১২৩৬ খৃস্টাব্দে বুখারীর ৪০ বছর বয়সের সময় মখদুম শাহ্দৌলাহ্ শহীদ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে থাকেন। জালাল উদ্দীন বুখারী ও শামসুদ্দিন তাবরেজী সমসাময়িক কালের মানুষ।

ইয়েমেন দেশের শাহ্যাদা আগমন করে ছিলেন বলে জায়গাটির নাম শাহ্যাদপুর[২০]। সেখানে তিনি বুখারা থেকে নদী পথে আগমন করেছিলেন বলে প্রমাণ মেলে। তিনি নৌকা থেকে অবতরণ করেছিলেন বলে সেই জায়গাটির চিহ্ন স্বরূপ একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। যার দৈঘ্য ৬২'-৯" প্রস্থ ৪১' সাড়ে ৩", উচ্চতা ১৯'-১১"। [২১] সেই সময় শাহ্যাদপুর রাজত্ব করত এক হিন্দুরাজা। তিনি শুনতে পেলেন, একদল মুসলমান ইসলাম প্রচারে উদ্দেশ্যে তার রাজ্যে বসতী স্থাপন করেছে এবং তাদের ডাকে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করছে। এ কথা শুনে রাজার লোকজন একদিন দরবেশের আস্তানা আক্রমণ করে এবং উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে মুসলমানরা জয় লাভ করলে ও দরবেশের ২১ জন অনুচর শহীদ হন। দরবেশের মাযারের পাশেই ২১ জন অনুচরের মাযার রয়েছে। অবশেষে, অবশিষ্ট অনুচরগণ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উৎসাহ সহকারে ইসলাম প্রচার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামকে সারা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করার পথ নির্দেশনা লাভ করেন।[২২] শোনা যায়, মখদুম শাহ্ দৌলাহ্ বেশ দীর্ঘকায় ছিলেন। যে কবরটিতে তাকে সমাহীত করা হয় সেটিও বেশ বড়। তাছাড়া মসজিদের গায়েও তার প্রমাণ রয়েছে। মসজিদের ভেতরের দেয়ালেতাঁর একটি হাতের মাপ আছে, হাতটি বেশ বড়। মখদুম শাহ্ দৌলাহ্ যে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেনতার পাশেই তাকে সমাহিত করা হয়।

দরবেশের মৃত্যুর পর জীবিত ছিলেন তার পুত্র তুল্য ভাগনে খাজা নূর। কথিত আছে, তিনি পরবর্তী কালে সোনারগাঁয়ে রাজকন্যাকে বিয়ে করেন এবং শাহ্যাদপুরের পূর্ববর্তী বংশ সহ

---

[২০] শাহজাদপুর: আরবের ইয়েমেন প্রদেশের বাদশাহ ছিলেন মুয়ায ইবনে জাবাল। পাবনা জেলার শাহজাদপুরে ইয়েমেন দেশেরশাহাজাদা আগমন করেছেন বলে জায়গাটির নাম শাহজাদপুর।

[২১] Abid Ali Khan, "Memoris Gaur and Pandua" Calcutta,1930. P.8

[২২] ঐ পৃ. ৮-৯

তিনি সোনারগাঁয়ে আগমন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, মখদুম শাহ্ দৌলাহর কয়েকজন দরবেশও তাঁর সাথে সোনারগাঁয়ে আগমন করে। তাদের কয়েকজন নাম জানা যায়:

শাহ্ দৌলাহ্ ওস্তাদ শাসুদ্দীন তাবরেজী

শাহ্ ইউসুফ

শাহ্ কিনগার

শাহ্ আজমল

হাসিলা পীর

শাহ্ ষোদলা

শাহ্ মাহমুদ।

যাই হোক পরবর্তীতে মুসলিম সুলতানগণ মসজিদের ব্যয় নির্বাহের জন্য ৭২২ বিঘা জমি ওয়াক্ফ করেন।[২৩] এখনও তা বিদ্যমান রয়েছে। প্রতি বছর চৈত্র মাসে মখদুম শাহ্ দৌলাহর মাযারে মেলা বসে। ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি ১২৫৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার শাহ্যাদ পুরে তাঁর মাযার অবস্থিত।

হযরত শেখ জালাল উদ্দীন তাবরিজী (র.)

বখতিয়ার খলজীর নদীয়া অভিযানের পর সুলতান গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ খলজীর শাসনামলের কোন এক সময় বাংলার রাজধানী ছিল মালদাহ জেলার লাখনৌতি বা লক্ষণাবতী নগরে। লাখনৌতি থেতে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত পান্ডুয়া। সেখানে ইসলামের মহানবাণীকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যে সূফী-দরবেশ আগমন করেছিলন তাঁর নাম জালাল উদ্দীন তাবরিজী। হাজার হাজার অমুসলিম নর-নারীকে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। জালাল উদ্দীন তাবরিজী পারস্যের "তাবরিজ" নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাই তাঁর নামে 'তাবরিজী' শব্দটির

[২৩] পত্রিকা সুরকা (পাবনা) ১৩২২/ ৭ চৈত্র

উল্লেখ আছে।তাঁরজীবনের প্রথম অধ্যায়ের তেমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। এমনকি "তাজকিরা-ই-আউলিয়া ই হিন্দ" ও "আইন-ই-আকবরীতে" ও তেমন কোন প্রমাণ মেলেনি।

'শেখ শুভোদয়া' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বিস্ড়রিত বর্ণনা পাওয়া যায়। তাতে উল্লেখ আছে জালাল উদ্দীন তাবরিজী ভারতের উত্তর প্রদেশের ইটওয়া জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন।[২৪]মুসলামানদের আগমনের পূর্ব থেকেই গৌড় বঙ্গের রাজধানী ছিল। তাই মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা কল্পে গৌড় ও পান্ডুয়া সমান গুরুত্ব লাভ করে। শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিজী[২৫] তৎকালীন বাংলার উপকণ্ঠে আস্তানা স্থাপন করেছিলেন বলেই ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতি, সারা বাংলায় বিশেষ করে উচ্চ শ্রেণী হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। ক্রমান্বয়ে লোকজন ইসলামের ছায়াতলে সমাসীন হতে লাগল। কথিত আছে, জালাল উদ্দীন তাবরিজী জীবনের প্রথম ভাগে এক বণিকের গৃহে বার বছর জায়গীর থেকে লেখা-পড়া করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতসারে বণিকের যুবতী কন্যা আয়েশা তাঁর প্রেমে পড়ে যায় এবং সে জালাল উদ্দীন তাবরিজীকে প্রেম নিবেদন করলে, জালাল উদ্দীন তা প্রত্যাখান করেন। এতে বণিকের কন্যা প্রচন্ড ক্ষুদ্ধ হয়। পিতা-মাতার কাছে জালালুদ্দীনের বিরুদ্ধে তাঁর সাথে আপত্তিকর আচরণের অভিযোগ উপস্থাপন করে। বণিকের বাস গৃহ ও বিদ্যালয় দু'জায়গা থেকেই তাকে বহিস্কার করা হয়। শুধু তাতেই ক্ষান্ত হয়নি, বার বছর বণিকের গৃহে বাস করা এবং বিদ্যালয়ে খরচা বাবদ যত টাকা খরচ হয়েছে তা ফেরত দেওয়ার দাবি জানানো হয় জালালুদ্দীনের পিতা-মাতার কাছে। এভাবে অপমানিত ও আশ্রয়হীন হয়ে তিনি "রত্ন দ্বীপের" নিকটবর্তী "রত্ন শেখর পাহাড়ে"গিয়ে আশ্রয় নেন। জালাল উদ্দীন তাবরিজীর এই রোমাঞ্চের যেভাবে অবতারণা করা হয় তা কুরআনে বর্ণিত হযরত ইউসুফ ও জোলেখার কাহিনীর সাথে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ। জালাল উদ্দীন তাবরিজী তৎকালীন প্রভাবশালী, শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বেশ সু-পরিচিত ছিলেন বলেই ধারণা করা হয়। তার জীবনে ঘটে যাওয়া কাহিনী থেকে তাই সুস্পষ্ট হয়েছে।

---

[২৪]তাবরিজী সম্পর্কে বহু কাহিনী "শেখ শুভোদয়া" নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ

[২৫]সিলেটের দেওয়ান নূরুল ইসলাম আনোয়ার হোসেন চৌধুরী জালাল উদ্দীন তাবরিজী ও শাহজালাল ইয়ামিনীকে একই ব্যক্তি বলে প্রচারের চেষ্টা।

ডা. এনামূল হকের বর্ণনায়, শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিজী উত্তর ভারতের সূফী-সাধকদের অন্তর্ভূক্ত এবং তাবরিজী নিছক ঐতিহ্যগত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[২৬]

শায়খ জালাল উদ্দীন বণিকের কন্যার মিথ্যা অভিযোগের কারণে মর্মাহত হয়ে দিল্লী ত্যাগ করে বাংলায় আগমন করেন। লক্ষণ সেনের রাজত্ব কালেই (১১২৪) বাংলাদেশে আগমন করেন। অসংখ্য পীর দরবেশ লখনৌতিতে আগমন করলেও সর্ব প্রথম শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরিজীর নাম উল্লেখ যোগ্য।

This great religious seminary attracted seekers after knowledge from different parts of the sub continent and it produced a number of celebrated scholars and sufis who shed the Iustre of their spiritual personality and Knowledge for several centuries ..... The dargah establishment also included the madrasa which continued to be a centre of learning even down to the British rule in the Provice.[27]

জালাল উদ্দীন তাবরিজী আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধ এক কিংবদনবন্তী । তিনি ইসলাম প্রচারে অপরিসীম ভূমিকা পালন করেন। তিনি একটি মসজিদ, গরীবও দু:স্থদের জন্য মুসাফির খানা প্রতিষ্ঠান করেছেন। জালাল উদ্দীন ১২৩৭ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। পান্ডুয়ার নিকটবর্তী ১৫ মাইল উত্তরে দেওতলা[২৮] নামক স্থানে তিনি সমাহিত আছেন।

জালাল উদ্দীন তাবরিজী, এই বিখ্যাত সূফীকে নিয়ে জন মনে নানা প্রশ্নে উদয় হয়েছে। বাংলাদেশে সিলেটের প্রখ্যাত সূফী-সাধক হযরত শাহ্ জালাল মুজারদ ইয়েমেনী এবং পান্ডুয়ার এই মহান দরবেশ জালাল উদ্দীন তাবরিজী এক ব্যক্তি কি-না তা বিখ্যাত পরিব্রাজকইবনে বতুতার "কামরূপ পরিভ্রমণ" কাহিনীতে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা সিলেটের দরবেশই জালাল উদ্দীন তাবরিজীতে পরিণত হওয়া টাই স্বাভাবিক।

---

[২৬]ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ১২২৫ খৃস্টাব্দ পৃ. ২০

[২৭]M.A Rahim, "Social and Cultural History of Bengal" Vol-ii, Karachi, 1st end, 1967, P. 289

[২৮] ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য পূর্বোক্ত, ১৯৭০ পৃ. ১৫০

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ইবনে বতুতার মতকে সমর্থন করেছেন।[২৯]

W.W Hunter এই দরবেশ কে মখদুম শাহ্ জালাল নামে আখ্যায়িত করেছেন বলে মনে হয়। তিনি বলেন, "On approaching the ruins from the south, the first two objects that attract attention are the monuments of Mukhdam shah Jalal and his grand son qutub shah, who were the two most distinguished religious personages under the carly Mohammedan King of Bengal".[30]

যাই হোক, বাংলাদেশের ইসলাম প্রচার ও প্রসারে এই মহা মানবের ভূমিকা অপরিসীম। তাই তাঁরা ইসলামের ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে থাকবেন।

হযরত শাহ্ নি'য়ামাতুল্লাহ বুতশিকন

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে যে সকল সূফী-দরবেশ এদেশে আগমন করেন তাদের মধ্যে শাহ্নি'য়ামাতুল্লাহ ছিলেন অন্যতম। তিনি বাংলার ইসলাম প্রচারকদের আদর্শ ও পথিকৃত ছিলেন। তিনি ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তবে তিনি কবে, কোথা থেকে আগমন করেছিলেন সে সম্পর্কে কোন বর্ণনা আজও পাওয়া যায়নি। তবে একথা প্রমাণিত যে, তিনি মুসলিম শাসন[৩১] প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই এদেশে আগমন করেছিলেন। ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে স্থানীয় বৃত্তবান প্রভাবশালী হিন্দু রাজাগণ কর্তৃক নানাভাবে তিনি বাঁধা প্রাপ্ত হন । একদিন তিনি ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন। কিন্তু হিন্দুরা দেব-দেবী মূর্তি নিয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ইবাদতে মনোনিবেশ যাতে ভগ্ন হয়, সে জন্য সেখানে উপস্থিত হয়। তারা তাদের প্রতিমা বিসর্জনের জন্য শোভাযাত্রা নিয়ে দরবেশের আস্তানার পাশে যেয়ে ঢাক-ঢোল প্রচন্ড জোরে জোরে বাজাতে লাগলো। এরকম হট্টগোল অবস্থায় দরবেশের ইবাদত বিঘ্নিত হল। এমতাবস্থায় দরবেশ ক্ষুদ্ধ হয়ে মূর্তিগুলোর দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করায়, মূর্তিগুলো

[২৯]M. Abid Ali khan, Memoirs of Gour and Pandua, calcutta 1924, P. 167
[৩০]A statistical Accounts of Bengal Vol- VII, First reprinted in India, 1974, new Delhi, P. 60-61
[৩১]বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১২০৩ সালে।

ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। হিন্দু যাত্রীগণ ভীত হয়ে পালিয়ে গেল। এরূপ দৃশ্য দেখে হিন্দুরা চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং দলে দলে তারা দরবেশের আস্তানায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে বলে জানা যায়। বর্তমান ঢাকা নগরীর পুরানা পল্টন এলাকার দিলকুশায় শাহ্ নি'য়মাতুল্লাহর মাযার অবস্থিত। সেখানে পাঠান আমলের নির্মিত একটি মসজিদ আছে। শাহ্ নি'য়মাতুল্লাহর নামের সঙ্গে "বুতশিকন"[৩২]শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশের ফলে মূতিগুলো চূর্ণ -বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার ফলশ্রুতিতে তাকে এ উপাধি দেয়া হয়। তাই নি:সন্দেহে বলা যায়, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে তাঁর ভূমিকা কোন অংশেই কম নয়।

হযরত মখদুম শাহ্ মাহমূদ গজনবী (র.)

বাংলায় বখতিয়ার খলজীর অভিযানের পরবর্তী কালে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে মঙ্গল কোট বিজয় লাভ করে। মঙ্গলকোট বর্ধমান জেলার একটি পরগণা। যেখানে শতকরা নব্বই জন অধিবাসী মুসলমান। কিন্তু বর্ধমান জেলায় হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা অনেক কম। জানা যায়, ১৮ জন দরবেশ মঙ্গলকোটে ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে জনগণ মনে করেন মঙ্গল কোটে মুসলমান সংখ্যা অনেক বেশি। ইসলাম প্রচার ও প্রসারে যে সব দরবেশ মঙ্গলকোট আগমন করেন তাদের মধ্যে মখদুম শাহ্ মাহমূদ গজনবী অন্যতম। তুর্কী বিজয়ের প্রথম দিকে তিনি ঐ এলাকায় আগমন করে বলে মনে করা হয়। তবে এ সম্পর্কে কোন দলিল প্রমাণ নেই। প্রচলিত কিংবদন্তী থেকে যতটুকু আমরা জানতে পারি, তা থেকেই বর্ণনা করা হল।

বহু কাল পূর্বের কথা। বিক্রম কেশরী নামে এক হিন্দু রাজা রাজত্ব করতেন মঙ্গলকোটে । তিনি শিবের পূজারী ছিলেন[৩৩]। তার রাজধানী ছিল উজানী নগর।

---

[৩২]"বুতশিকন" শব্দটি দরবেশের আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করার ফলে হিন্দু মূর্তিগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তাই তাঁর উপাধী হিসাবে তাঁর নামের সাথে "বুতশিকন" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

[৩৩]পূজা সম্পর্কে একটি প্রবাদ করে শিবপূজা উজানীর রাজা কৃপাময়ী দশভূজা। উজানী নগর অতিমনোহর বিক্রম কেশরী রাজা।
(কবি কঙ্কন চন্ডী, ১৫৮৪ খৃস্টাব্দে লিখিত, পৃ. ১১৪-১১৫)

[৩৪]গজনব জন্ম বলে মাখদুখ শাহ গজনবী বলা হতো।
হিন্দুরা মুসলিমদেরকে যবন বলে ডাকতো। যবনররা হিন্দুদের গৃহে প্রবেশ করলে গৃহ অপবিত্র হয়ে গেছে বলে মনে করতো। তবে আজ-কাল তাদের এই মনোভাব নেই।

ফকির সন্ন্যাসীদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। তিনি বেশ দানবীর ছিলেন বলেই, অকৃপণ হাতে সন্ন্যাসীদের দান করতেন পূর্ণ লাভের আশায়। অত্যন্ত ঘৃণা করতেন মুসলমানদেরকে। শোনা যায়, "যবন" অর্থাৎ "মুসলমান" শব্দটি শুনলে তিনি তা পাপ কার্য বলে মনে করতেন এবং তিনদিন উপবাস বা না খেয়ে ব্রত পালন করতেন। এমনকি কোন কারণে মুসলমান কারো দেখা পেলে সেটাকে পাপ বলে সাতদিন উপবাস করতেন। তিনি মনে করতেন উপবাস থাকলে পাপমোচন হয়ে যাবে। ঘটনাক্রমে একদিন মখদুম শাহ্ গজনবী[৩৪] বা রাহী পীর বিক্রমরাজার রাজধানী উজানী নগরে আগমন করেন। আসরের আযান যখন চতুর্দিকে ধ্বনীত হচ্ছিল ঠিক সে সময়। আযানের সেই অমীয় বাণী রাজা বিক্রম কেশরীর কানে পৌঁছলেতিনি তার "পবিত্র" নগরে কোন যবন প্রবেশ করে নগরীকে অপবিত্র করে দিচ্ছে বলে মনে করেন। তাই নগরী অপবিত্র করে দিচ্ছে বলে, রাজার নির্দেশে নগরবাসী তিনদিন উপবাস ব্রত পালন করলেন এবং দরবেশকে গ্রেফতার করার জন্য গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করলেন। কিন্তু রাজার লোকজন ব্যর্থ হয়। রাজা বাধ্য হয়ে পরবর্তীতে সেনা বাহিনী পাঠালে তারাও ব্যর্থ হয়। রাজা অনেকটাই চিন্তিত হয়ে পারিষদগণের সাথে পরামর্শ করে দরবেশকে শহর ত্যাগ করে কানুর নদীর তীরে আস্তানা স্থাপন করার নির্দেশ দিলেন। দরবেশ তা মেনে নিয়ে নদীর ওপারে আস্তানা স্থাপন করেন। যবনের[৩৫] মুখ যাতে না দেখতে হয়, তাই তিনি নদীর এপার দীর্ঘ প্রাচীর নির্মাণ করেন। সময়ের আবর্তনে বেশ কিছু বছর পেরিয়ে গেল। একদিন দিল্লীর মুসলিম সুলতান ফার্সী ভাষায় লিখিত একটি পত্র বিক্রমকেশরীর কাছে পাঠালেন। রাজাও তার অনুচরগণ সেই চিঠি মর্মকথা উদ্ধার করতে ব্যর্থ হলেন পরে সেই দরবেশের শরনাপন্ন হলেন। দরবেশ পত্রের অর্থ বুঝিয়ে দিলেন বটে কিন্তু পত্রের জবাব লেখায় দেখা দিল আরেক সমস্যা। পরবর্তীতে রাজার পত্রের জবাব লেখার সময় চালাকী করে দিল্লীর সুলতানকে উজানীর সমস্ত ঘটনা জানালেন। পত্রটি ছিল মোহর অঙ্কিত। তা দিল্লীতে পৌঁছলে সুলতান সমস্ত ঘটনা ঘোচরীভূত হলেন। পরবর্তীতে দরবেশ যোদ্ধার পীর

[৩৫]হিন্দুরা মুসলিমদেরকে যবন বলে ডাকতো। যবনররা হিন্দুদের গৃহে প্রবেশ করলে গৃহ অপবিত্র হয়ে গেছে বলে মনে করতো। তবে আজ-কাল তাদের এই মনোভাব নেই।

ঘোড়ার নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী মঙ্গল কোটে পৌঁছলে, ঘোড়া শহীদ ছাড়া বাকী ১৬জন দরবেশ যোদ্ধা সেনাবাহিনীতে অংশ গ্রহণ করেছিল। সেনাবাহিনী মঙ্গলকোট পৌঁছলে রাহী পীরও তাদের সাথে যোগ দিলেন। রাজা বিক্রম কেশরীর সাথে মুসলমানদের তমুল যুদ্ধ হয় দীর্ঘ দিন ধরে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে, বিক্রম কেশরী নিহত হল। নিহত হল সেনাপতির ঘোড়া। যুদ্ধে নিহত হওয়ায় তিনি "ঘোড়া শহীদ" আখ্যা পেলেন। পরে মুসলমান সেনা প্রতি কয়েক বছর রাজত্ব করেছিলেন বলে শোনা যায়। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে তাঁর রাজধানী ছিল এবং তার নাম অনুসারেই বিক্রমপুর নাম করণকরা হয়।

ইসলাম প্রচারকার্যে যে সকল দরবেশ গজনবীর সাথে এসেছিলেন তারা হলেন:

পীর পাঞ্জাতন

সাইয়েদ শাহ্ তাজুদ্দীন

খাজা দীন চিশ্তী

শাহ্ হাজী আলী

পীর ঘোড়া শহীদ[৩৬]

দরবেশ গজনবী ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। এই দরবেশের প্রচেষ্টায় মঙ্গলকোটে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে এবং সেখানেদরবেশের সাথে আগত সতের জন দরবেশের সমাধি রয়েছে। যা আজো কালের সাক্ষ্য বহন করে।

হযরত শাহ্ মখদুম রূপোশ (র.)

ইসলামের সত্যবাণীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যারা বাংলার প্রতিটি জেলায় ও মহকুমায় আগমন করেন তাদের মধ্যে শাহ্ মখদুম রূপোশ ছিলেন অন্যতম। ধারণা করা হয় তুর্কীদের[৩৭] বাংলায় আগমনের পূর্বেই শাহ্ মখদুম রূপোশ চরম প্রতিকূলতার মধ্যে ও ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব শাহ্মখদুম রূপোশ। "রূপোশ" শব্দের অর্থ "মুখ আচ্ছাদনকারী"। এটা তাঁর উপাধি। এটি ফার্সী শব্দ। তিনি মূলত রাজশাহী অঞ্চলের

[৩৬]Dr. Md. Enamul Haq, Ibid P. 18

[৩৭]তুর্কীগণ ১২০৩ সালে বাংলাদেশ জয় করেন।

ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করার জন্য ও ইসলাম কে সু-প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সুলতান হোসেন শাহ্ এর আমলে রাজশাহীতে আগমন করেন। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ইসলাম বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁরপ্রকৃত নাম সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস ওরফে শাহ্ মখদুম রূপোশ। হযরত শাহ্ মখদুম গৌর বর্ণের ও সু-স্বাস্থ্যবান পুরুষ ছিলেন। তিনি সর্বদা আল্লাহ্র প্রেমে বিভোর থাকতেন। সারা বছর রোযা, রাখতেন এবং সারা রাত জেগে ইবাদত করতেন। সূফী-দরবেশদের যে নীতি অল্প কথা, অল্পাহার, অল্প নিদ্রা,তাঁর চরিত্রে ফুটে ওঠেছিল। তিনি আহার করতে সামান্য দুধ ও সরবত। তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন মূলত: বাগদাদে। বাগদাদ থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন তিনি । বরেন্দ্র এলাকায় বহু অমুসলিম নর-নারীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। উপমহাদেশে যেসব অলী-আউলিয়ার আগমন ঘটেছিল, তাঁরা তাদের অলৌকিক শক্তির অধিকারী মহা মানব বলে ধীরে ধীরে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা, প্রচার ও প্রসারতা লাভ করতে শুরু করল। হযরত শাহ্ মখদুম ছিলেন বড় কামেল পীর। তিনি সর্বপ্রথম নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি রেল স্টেশনের ১০/১২ মাইল দূরে বসতি গড়ে তোলেন। জায়গাটির নাম শামপুর। তাঁরসহোদর ভাই সৈয়দ আহমদ তন্নরী ওরফে মিরান শাহ্ কাঞ্চনপুর যা বর্তমানে নোয়াখালী এবং ভগ্নী মজ্যুবী কাঞ্চনপুরে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। ফলে বহু অমুসলিম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। পরেতাঁর অন্যান্য অনুচর তাঁর নির্দেশ ক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মাত্র ৪জন সহযোগী নিয়ে কুমির আকৃতির নৌকায় চড়ে রাজশাহী এসে হাজির হয়েছিলেন।

ড. এনামূল হক "Sufism in Bengal"গ্রন্থে তাঁর আগমন সম্পর্কে উদ্বৃত করেছেন ঃ

"মখদুম সাহেবের নাম হযরত শাহ্ রূপোশ। তাঁর অন্য নাম কি ছিল তা আমি জানি না। তাঁর ইন্তিকাল তারিখ ও আমার স্মরণ নেই। মাযার সন্নিহিত সম্পত্তিটি ১০৪৪ হিজরীর পূর্বে

প্রদত্ত হয়নি। আর আমি যে সমস্ত কাগজ পত্র দাখিল করেছি তাতে আমি একথা উল্লেখ করেছি যে, হযরত রূপোশ ঐ সময়ের ৪৫০ বছর জীবিত ছিলেন।"[৩৮]

মোঘল বাদশাহ্ হুমায়ূনের আমলে (১৫৩০-১৫৫৬ খৃস্টাব্দ) মাযার সন্নিহিত এলাকাকে ওয়াক্ফ সম্পত্তি হিসেবে দান করা হয়।[৩৯] এনিয়ে বেশ বিতর্ক ও রয়েছে। খাদেম সাহেব উল্লেখ করেছেন যে, ১০৪৪ হিজরীর (১৬৩৪ খৃস্টাব্দে) পূর্বে প্রদত্ত হয়নি। এ ক্ষেত্রে হুমায়ূনের আমলে সম্পত্তিটি দান করা হয় ঠিকই তবে, কাগজ কলমে এর কার্যকরী হয় ১৬৩৪ খৃস্টাব্দে । সুতরাং শাহ্ মখদুম ১০৪৪ হিজরীতে জীবিত ছিলেন।

হযরত শাহ্ মখদুম বাংলার তৎকালীন সুলতান আবু মোজাফ্ফর নসরৎ শাহ্র কাছ থেকে কিছু খাস জমি যৌতুক হিসেবে প্রাপ্ত হন। এই শাহ্ মখদুম ১৪৭৫ খৃস্টাব্দে বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৫৯২ খৃস্টাব্দে ১১৭ বছর বয়সে দরগা পাড়া মহল্লায় পদ্মা নদীর উত্তর দিকে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

রাজশাহী অঞ্চলে যে সব সূফী ইসলাম প্রচার করতে আসেন, তাদের সকলের ওস্তাদ ছিলেন শাহ্ মখদুম রূপোশ। রামপুর ও বোয়ালিয়া দু'টি গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আধুনিক রাজশাহী। রামপুর, বোয়ালিয়া ও বর্তমান দরগাহ পাড়া। জানা যায়, হযরত নূর কুত্বুল আলমের সঙ্গে হযরত শাহ্ মখদুমের সম্পর্ক ছিল।"Inscriptions of Bengal"গ্রন্থের লেখক শামসুদ্দীন আহমদ বলেন যে, শাহ্ মখদুমের নাম হবে "শাহ্ দরবেশ" । দরগাহ সংলগ্ন শিলালিপিতে তাই খোদিত আছে।[৪০] তাঁর জীবদ্দশায় পদ্মা নদীর পূর্বদিকে একটি মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল যা ইরান ও ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন হিসেবে গণ্য। ১৯২৫ খৃস্টাব্দে এর চারদিকে দেয়াল ও ১৮৪০ খৃস্টাব্দে উপরি ভাগে ছাদ তৈরি হয়। মহাকাল গড়ে দুই শক্তিশালী সামন্ত রাজা ছিলেন। তাদের একজন হলেন বর্মভোজ ও বর্মগুপ্তভোজ। সামন্ত রাজাদের শাসনামলে তুর্কান শাহ্ নামক এক দরবেশ তার অনুচর নিয়ে আগমন করেন কিন্তু দুই সামন্ত রাজার অত্যাচারে অত্যাচারিত হন তুর্কান শাহ্ ও তাঁর

---

[৩৮]Dr. Enamul Haq, Ibid P. 231

[৩৯]মাজার সম্পত্তির প্রশাসক রাজশাহী জেলা জজের অফিসে রক্ষিত এ মামলার আপিল সংক্রান্ড় কাগজ পত্রের ৫৫০ নম্বর মূল ডিক্রীতে এ কথা উলেণ্ডখিত হয়েছে।

[৪০]Shamsuddin Ahmed, "Inscription of Bengal" Vol-iv, 1960, P. 264

শিষ্যগণ। পরে তাঁরা শাহাদৎ বরণ করেন এবং শাহ্ মখদুম আগমন করেন মখদুম নগরে এবং সেখানে তিনি কেল্লাহ তৈরি করেন।

মহাস্থান গড়ে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে হযরত শাহ্ মখদুম এই নিষ্ঠুর প্রথার মূলোৎপাটন করেন এবং দেওরাজ ইসলাম গ্রহণ করেন। মহাস্থান গড় জয় সম্পর্কে একটি প্রচলিত কিংবদন্তী আছে। তা হল জেলে কাহিনী। যার সূত্র ধরে শাহ্ মখদুম মহাকাল গড় জয় করেছিলেন।

কাহিনীঃ

রামপুর একটি গ্রাম যা পদ্মা নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত। সেখানে বাস করত বেশ কিছু জেলে পরিবার। একদিন কয়েকজন জেলে পদ্মা নদীতে মাছ ধরতে ধরতে দেখল এক বিস্ময়কর ঘটনা। তারা খুব আৎকে উঠল। হঠাৎ তারা দেখতে পেল, লম্বা আলখাল্লা পরা, মাথায় পাগড়ী, হাতে লাঠি, এক ব্যক্তি পায়ে খড়ম পরে পানির উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে নদী পার হচ্ছেন। তিনি দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে যাচ্ছিলেন। এরূপ দৃশ্য দেখে জেলেরা তাদের সমস্ড় কাজ ফেলে, খুব তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে পৌঁছল। ইতোমধ্যে তিনি গ্রামে পৌঁছগেলেন। জেলেরা তাঁর আশীর্বাদ পুষ্ট হলো। দরবেশ তাদের কাছে কিছু খাবার চাইলেন। তাঁরা সাথে সাথে তাদের সাধ্যমত মাটি পাত্রে করে কিছু খাবার নিয়ে আসলো। দরবেশ খাবারের পাত্রগুলো তাঁর পাগড়ি দিয়ে ঢেকে, হাত তুলে মোনাজাত করলেন। কিছু সময় পর পাগড়িটি সরালে দেখা গেল খাদ্যগুলো মাছ এবং পাত্রটি সোনায় পরিণত হয়ে গেল।

এরূপ অলৌকিক ক্ষমতা দেখে জেলে সম্প্রদায় ধীরে ধীরে তার ভক্ত হয়ে গেলো। পরবর্তীতে জেলেরা আরো উত্তরে গিয়ে নিজেদের আস্ড়না গড়ে তুললেন। জেলেদের সাথে নিয়ে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমানে ঐ জায়গাটি "দরগাহ পাড়া" নামে পরিচিত।[৪১]

[৪১] ড. মুহাম্মদ এনামূল হক মনে করেন, কাহিনীটি নাপিত সম্পর্কে নয়, জেলে সম্পর্কে। "Sufism in Bangal" PP.228-229

প্রচলিত কিংবদন্তীতে আরো কিছু অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে। রামপুর বোয়ালিয়ায় এক নাপিতের বসবাস ছিল। তার তিনপুত্র সন্তান। এই আলোচনার আগেই নর বলির কথা উল্লেখ করেছি। কেননা তিনি নর বলির মূলোচ্ছেদ করেছিলেন বলে বর্ণনা মেলে। একে একে নাপিতের দুই পুত্রের বলি হল। তৃতীয় পুত্রকে বলি দেওয়ার আশংকায় নাপিত পূর্বেই মখদুম নগরে গিয়ে হাজির হলেন। এ পুত্র বলির কথা তিনি দরবেশকে জানালেন। দরবেশ তাকে বললেন পুত্রকে নিয়ে নদীর তীরে অবস্থান কর, সেখানে আমার দেখা পাবে।

কনিষ্ট সন্তানকে নিয়ে নাপিত দম্পতি দিন রাত নদীর তীরে বসে কান্নাকাটি করেন। এ কান্না যেন শেষ হয় না। অবশেষে অনেক অপেক্ষার প্রহর পাড়ি দিয়েও দেখা পেলো না দরবেশের। হতাশায় পড়ল নাপিত দম্পতি। নাপিত দম্পতি সন্তান বলির ভয়ে পানিতে নামতে শুরু করলে হঠাৎ তারা শুনতে পেলেন "ভয় নেই" "ভয় নেই"। শাহ্ মখদুম তাদের সামনে এসে হাজির হলেন।

তিনি তাদেরকে অভয় দিলেন। পুত্র সন্তানটির গলায় হাত বুলিয়ে দিলেন। দরবেশ বললেন "তোমরা যেখানে খুশি গমন করতে পার"। নাপিত বললেন, "হে দেবতা মুসলামান রাজা আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, তাই আমরা অপেক্ষা করছি"। দরাবেশ উত্তর দিলেন, "আমি রাজা নই, আমি মখদুম। খুব দ্রুতই ধ্বংস হবে তোমাদের দেওরাজা। আবার আমার দেখা পাবে। ভয় নেই তোমার ছেলেকে কেউ বলি দিতে পারবে না"। একথা বলেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এরূপ অলৌকিক ঘটনায় আকৃষ্ট হয়ে বহু অমুসলিম নর-নারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ধারণা করা হয় নাপিতের কবরটি দরবেশের আস্তানাতেই আছে। এ ঘটনার কয়েক বছর পর তাঁর মৃত্যু হয়। মহাস্থানগড়ে তাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। তাঁর মাযারটি বর্তমানে রাজশাহী সরকারী কলেজের খেলার মাঠের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এই দরবেশের আস্তানার কিছু অংশ পদ্মার গর্ভে চলে গেছে।[৪২] তিনি অবিবাহিত ছিলেন। ২৭ রজব তাঁর মাযারে উরস পালন করা হয়।

[৪২]মুহাম্মদ আবু তালিব, " হযরত শাহ মখদুম রুপোস জীবনেতিহাস", ঢাকা ২য় সংস্করণ ১৯৭৯, প্র ৫, ১১-১৩

হযরত বায়েজীদ বোস্তামী

খৃস্টীয় অষ্টম ও নবম শতকে চট্টগ্রামে মুসলিম আরবদের উপনিবেশ গড়ে উঠে। আরব বণিক গণ চট্টগ্রাম বন্দরকে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যবহার করেছিল। মূলত আরব বণিকদের মাধ্যমেই ঐ এলাকার লোকজন প্রথম ইসলামের সংস্পর্শে আসে। তাই নি:সন্দেহে বলা যায় চট্টগ্রামেই সর্ব প্রথম ইসলামের আগমন হয়। আরব বণিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই এ অঞ্চলের অসংখ্য লোক ইসলামের ছায়াতলে সমাসীন হন। অসংখ্য সূফী সাধক এ অঞ্চলে আগমন করেন বলেই, চট্টগ্রামকে বার আউলিয়ার দেশ বলা হয়।

এই বার আউলিয়ার অন্যতম হলেন, পারস্যের বায়েজীদ বোস্তামী। তিনি এদেশে আগমন করে ইসলাম প্রচার করেন। চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ৫মাইল উত্তরে নাসিরাবাদ গ্রামের এক পর্বতের চূড়ায় তার স্মারক সমাধি দেখা যায়। নাসিরাবাদ এক সময় গভীর জঙ্গল, হিংস্র জানোয়ার ও জ্বিনদের বসবাস ছিল বলে জানা যায়। বায়েজীদ বোস্তামী নবম শতকে এদেশে আগমন করেছিলেন এবং ৮৭৭ খৃস্টাব্দে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তবে তিনি এখানে মৃত্যু বরণ করেনি তিনি পারস্যে বোস্তাাম নগরে ইন্তিকাল করেন। বোস্তাম শহরে তাঁরদরগাহ বিদ্যমান।[৪৩] তাঁর প্রকৃত নাম: সুলতান আরেফীন বুরহানুল মুহাক্কেশীন খলীফায়ে ইলাহী আল্লামা হযরত বায়েজীদ বোস্তামী। তিনি সমগ্র মুসলিম জগতের সু-পরিচিতএকজন দরবেশ। বায়েজীদ বোস্তামী চট্টগ্রামে এসে খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরওস্তাদ ছিলেন আবূ আলী (র.)। তিনি সিন্ধুর অধিবাসী ছিলেন। ওস্তাদের কাছ থেকে "ফানাহ্র" বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। আবূ আলীর নির্দেশ ও উপদেশ ক্রমেই তিনি চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে আগমন করেন। নাসিরাবাদে তাঁর সমাধীর পাশে একটি মসজিদ আছে। বহু (দেশী-বিদেশী) পর্যটক ঐ মসজিদের নামায আদায় করেন। মসজিদটি মোঘল আমলে নির্মিত হয়। মসজিদের পাশেই একটি পুকুর আছে। সেটিকে নিয়ে নানা কল্পকাহিনী প্রচলিত ছিল। দরগাহ সংরক্ষণ করছে "ওয়াক্ফ এস্টেট", দরগাহ সংরক্ষণের দায়িত্বভার চট্টগ্রাম "এনডাউমেন্ট কমিটির"।

[৪৩]A.J. Arberry, Muslim Saints and Mysties, London, P. 100.

তিনি সূফী দরবেশদের "মধ্যমণি"। হাদীস শাস্ত্র, তত্ত্বজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে বেশ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে কবিতার চরণে উল্লেখ করা হল

নাসিরাবাদের মানি সাহারে সুলতান

দেশ- বৈদেশ হইতে আইসে মোমিন মুসলমান।

তিনি ২৬১ হিজরী অর্থাৎ ৮৭৪ খৃস্টাব্দে পারস্যের বোস্তাম নগরে ইন্তিকাল করেন। সেখানেই তাকে সমাহীত করা হয়।[৪৪]

হযরত ফরিদুদ্দীন শক্করগঞ্জ (র.)

অনুমান করা হয়, ত্রয়োদশ শতকের মাঝা-মাঝি সময়ে শায়খ ফরিদুদ্দীন[৪৫] শক্করগঞ্জ চট্টগ্রামে এসেছিলেন এবং ইসলাম প্রচার করেছিলেন। অনেকেই তাঁকে পারস্যের শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার বলে দাবী করে। তিনি ১২৬৯ খৃস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করে। চট্টগ্রাম শহর থেকে উত্তরে সুলুকবাহারের পার্বত্য টিলায় শায়খ "ফরিদের চশমা" নামে একটি ঝরনা আছে। দরবেশের সাথে ঐ ঝরনার গভীর সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা যায়। রোগ মুক্তির জন্য মানুষ এই ঝরনার পানি ব্যবহার করে। শায়খ ফরিদুদ্দীন সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় নিরালায় নিবৃত্তে কখনো বা পাহাড়ের পাদদেশে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। এমনকি ইবাদত করতে করতে আল্লাহর দরবারে কান্না করতে করতে তার চো্খ অন্ধ হয়ে যায়। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায় লোক । ধারণা করা হয় তার চোখের পানিতেই ঝরনাতৈরি হয়। এই দরবেশ দিল্লীর বিখ্যাত দরবেশ হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার (১২৩৬-১৩২৫ খৃস্টাব্দ) শিক্ষক ছিলেন। তিনি একদিন (দরবেশ) তাঁর মাকে বললেন যে, তিনি আউলিয়া হবেন। তার পর ৪-৫ বছর মায়ের অনুমতি নিয়ে আলবুর্ক পর্বত গুহায় ধ্যানমগ্ন থেকে ছিলেন। এক রাতে বাড়ী ফিরে এসে মাকে ডাকলেন যে সে আউলিয়া হয়েছে। কিন্তু মা উত্তরে বললেন যে, তুমি এখনো আউলিয়া হতে পার নাই। পরে মনের

[৪৪]ড.মুহাম্মদ এনামূল হক, "বঙ্গে সূফী প্রভাব," কলিকাতা ১৯৩৫ পৃ. ১৪৭-১৪৮

[৪৫]ফরিদুদ্দীন দুই জন, এক জন ফরিদুদ্দীন আত্তার এবং আরেক জন ফরিদুদ্দীন শক্করগঞ্জ। একে গঞ্জেশক্করও বলা হয়।

দু:খ নিয়ে চলে গেলেন চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামে এক পাহাড়ের পাদদেশে তিনি দীর্ঘ ১২ বছর ধ্যান মগ্ন হয়ে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট কান্নাকাটি করতে থাকেন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলে তিনি সিদ্ধি লাভ করেন এবং পরে তিনি আউলিয়া হলেন । তাঁর নাম হল আউলিয়া শেখ ফরিদ। তিনি মূলত:উত্তর-ভারত ও দাক্ষিণাত্যের কোন কোন জায়গায় ইসলাম প্রচার করেন। তিনি ১১৭৭ থেকে ১২৬৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। পাঞ্জাবের পাক পতন শহরে তাঁর সমাধী দেখা যায়। ফরিদুদ্দীন ফরিদপুরে কিছু এলাকায় ইসলাম প্রচার করেছিলেন বলে জানা যায়। তাই তার নামানুসারে ফরিদপুর জেলা ও শহরের নাম করণ করা হয়। তিনি জেলায় জেলায় পরিভ্রমণ করে ইসলামের ব্যাপক প্রচারণা চালায় । তাই বলা যায়, বাংলাদেশের ইসলাম প্রচারে এই সব সূফী-সাধকদের ভূমিকা অতুলনীয়। তাঁরা ইসলামের প্রসারতায় এক যুগান্ড়কারী স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

ড. দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর পূর্ববঙ্গ গীতিকায় উল্লেখ করেছেন:

"তারপর মানি আমি ফকির শেখ ফরীদ।

নেজাম আউলিয়া মানম তান সাহারিদ।"

হযরত শাহ্ চাঁদ আউলিয়া (র.)

মেঘনা নদীর তীর ঘেষে চাঁদপুর বন্দর। সীতাকুন্ডের চাঁদপুর, চট্টগ্রাম শহরের নিকটবর্তী চাঁদগাও এবং পটিয়ার চাঁদখালী-এসব অঞ্চলে যিনি ইসলাম প্রচার করেছিলেন তিনি হলেন শাহ্ চাঁদ আউলিয়া[৪৬]। এসব স্থানের নাম করণ করা হয় মূলত শাহ্ চাঁদ আউলিয়ার নামেই। পটিয়া থানার এক মাইল এর মধ্যে "শ্রীমতি" নদীর তীরে শাহ্ চাঁদ আউলিয়ার মাযার অবস্থিত। সে জন্য পটিয়ার হিন্দু -মুসলিম সবাই তাঁকে ভীষণ ভক্তি ও সম্মান করত। প্রায় পাঁচশ বছর পূর্বে তিনি চট্টগ্রাম এসেছিলেন।

কথিত আছে, এ আউলিয়া চিরকুমার ছিলেন। একদা এক শাহ্জাদী,মনে প্রাণে ভাল স্বামী সন্ধান করছিলেন। কিন্তু তিনি বার বার ব্যর্থ হয়ে একদিন এই আউলিয়ার কাছে তার ভাগ্যে

[৪৬]আউলিয়া শব্দটি ওলী এর বহুবচন। শাহ চাঁদ এর সাথে বহু বচন-আউলিয়া শব্দটি প্রচলিত হয়ে আসছে।

স্বামী আছে কি-না তার গণনা করতে এলেন। আউলিয়া বললেন, "আপনার ভাগ্যে স্বামী নেই" ।শাহ্জাদী প্রচন্ড বিরক্ত হয়ে গেলেন। পরবর্তীতে শাহ্জাদী এই আউলিয়াকেই বিয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন। কিন্তু আউলিয়ার পক্ষে তা সম্ভব নয় বলে, তিনি কিছু দিন দিলণ্টীতে আত্মগোপন করে থাকলেন। অত:পর চলে এলেন বাংলার সর্ব পূর্বপ্রান্ড়ে। তিনি বাংলায় এসে চট্টগ্রামের পটিয়ায় আস্তানা স্থাপন করেন। অপর দিকে শাহ্জাদীতাঁর অনুসন্ধান করতে করতে লোকবল সহ পটিয়ায় হাজির হলেন। কিন্তু শাহ্জাদী আগমনের কিছুদিন পরই শাহ্ চাঁদ আউলিয়া ইন্তিকাল করেন। শাহ্জাদী তার ভাগ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন। অত:পর বাকী জীবন মাযারের খাদিমরূপে জীবন যাপন করতে থাকেন এবং তিনি পনেরশ শতক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। বাংলায় ইসলাম প্রচারে তিনি অপরিসীম ভূমিকা পালন করেন।

সূফী-সাধকগণ জীবনের সকল চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বাংলাদেশে ইসলামকে সু-প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করেছেন জীবনে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ে ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ শতকের শেষ পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। এই ধারাবাহিকতা ছিল অপরিবর্তীত। আল্লাহ তায়ালার মনোনীত, একমাত্র জীবন বিধান হল পবিত্র কুরআন। তাই আল্লাহ পাকের সেই সু-ললিত বাণী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে নবী, রাসূল, সূফী-দরবেশ, পীর, আউলিয়া এ কাজ করে গেছেন। ইসলামকে সু-প্রতিষ্ঠা করেছেন।

হযরত শাহ্ তুর্কান শহীদ (র.)

ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে এদেশে আগমন করেন শাহ্ তুর্কান শহীদ তিনি মূলত বগুড়া জেলায় ইসলাম প্রচারে অনবদ্ধ অবদান রেখে গেছেন।

(Statistical account of Bogra গ্রন্থে)

WW. Hunter বলেন,

Turkan Shahid was a Gazi Slain in battle by Hindoo king Ballal Sen, One Shrine is called "Sir –Mokam" where the head fell and

the other "Dhar Mokam" Where his body fell. The Shrines of Darghas of Turkan shahid are higly revered.[47]

ইসলাম প্রচারের জন্য

বাংলার তৎকালীন রাজা বল্লাল সেনের সৈন্যদের সাথে যিনি যুদ্ধে আত্মদান করেন, তিনি হলেন তুর্কান শহীদ (র.)। করতোয়া নদীর তীরে তার আস্তানা।

তুর্কান শহীদ অমুসলিম অর্থাৎ হিন্দু রাজা বল্লাল সেনের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার দেহ দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তার মস্তক খানা যেখানে পড়ে, সেখানে দাফন করা হয়, যাকে বলা হয় "শির মোকাম" এবং দেহ যেখানে পড়ে সে স্থানেই তাকে দাফন করা হয়, তাকে বলা হয় "ধড় মোকাম" । তাই এই আস্তানা শেরপুরের নিকটবর্তী। এভাবে নিজের জীবন দিয়ে শাহ্ তুর্কান ইসলাম প্রচারের পথকে আরো সু-প্রশস্ত ও সুগম করে দিয়েছিলেন। মানুষ আজো তার দরগাহের সমাধীতে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

হযরত শাহ্ বন্দেগী গাজী (র.)

হযরত বাবা আদম শহীদ যে ক'জন অনুচর নিয়ে এদেশে আগমন করেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত শাহ্ বন্দেগী গাজী (র.) অন্যতম ছিলেন। তিনি গাজী হয়েছিলেন। শেরপুরের অন্তর্গত বগুড়া জেলায় তাঁর দরগাহ মোবারক অবস্থিত। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন্ বখতিয়ার খলজির গৌড় জয়ের পর দলে দলে এদেশে সূফী-সাধকগণ আগমন করেন। গৌড় জয়ের পূর্বেও বহু দরবেশ এদেশে ইসলাম প্রচার করতে এসে আর নিজ দেশে ফিরে যাননি। তাই দেখা যায়, বগুড়ার প্রতিটি থানায় একাধিক মাযার অবস্থিত। এদের অনেকের নাম জানা গেছে, আবার অনেকের নাম স্মৃতির পাতায় ময়লা জমে একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। যা জানার কোন উপায় আমার জানা নেই।

[৪৭]ড. গোলাম সাকলায়েন, "বাংলাদেশের সূফী-সাধক" ই. ফা.বা. সপ্তম সংস্করণ ২০১১ পৃ: ৮৮।

ইসলামের শান্তির বাণী প্রতিষ্ঠা কল্পে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। বিভিন্ন সময় তারা রাজা ও শাসকদের দ্বারা বাঁধা গ্রস্থ হয়েছেন, তবুও পিছ পা হয়নি। তাদের অত্যাচার, অনাচারকে প্রতিহত করতে কখনো বা তারা বীর মুজাহিদের[৪৮]ভূমিকা ও পালন করেছিলেন। বগুড়ার শেরপুরে তিনি চির নিদ্রায় শায়িত আছেন। এছাড়া বগুড়ায় বহু নাম না জানা পীরের মাযারআছে।

নিমাই পীর বা মীর সৈয়দ রুকনুদ্দীন

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস আলোচনায় বহু পীর-দরবেশদের আগমনের ইতিহাস ও গতি ধারা চলে আসে। নিমাই পীর, যাকে অনেকে হিন্দু বলে ধারণা করেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত নাম মীর সৈয়দ রুকনুদ্দীন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল নিমাই। ৪৩৯ হিজরীর শেষ ভাগে সুলতান বলখীর আগমনের সময়, তার শিষ্য নিমাই এদেশে আগমন করেন। গুরুর নির্দেশে তিনি পাথর ঘাটায় আস্তানা স্থাপন করেন। ইসলাম প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। জানা যায়, ১২ কোণ বিশিষ্ট সিংহ মুখাকৃতি কারুকার্য খচিত পাথরে বসে নিমাই ধ্যান মগ্ন থাকতেন। এবং জনতার উদ্দেশ্যে ওয়াজ-নসিহত করতেন। ছোট-বড় কয়েকটি পাথর আজো সেখানে দেখা যায়। পীর সাহেবের "আসা" বলে একটি পাথর আজো মাটিতে প্রোথিত আছে। পাঁচ বিবি থানা থেকে চার মাইল দূরে পূর্ব দিকে তুলসী গঙ্গা নদীর তীরে পাথর ঘাটায় তাঁর মাযার অবস্থিত।

দেওয়ান শাহ্াদাত হোসেন

১২০১ খৃস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খৃস্টাব্দে মধ্যে বাংলাদেশে তুর্কী শাসকদের আমলে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সমরকন্দ থেকে তালিম নিয়ে দেওয়ান শাহ্াদাত হোসেন এসেছিলেন। ইসলামের অমিয়বাণীকে অমুসলিম অর্থাৎ বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে প্রচার করতেন এবং অসংখ্য লোক ইসলামের ছায়াতলে সমাসীন হন। কথিত আছে, হযরত দেওয়ান শাহাদাত এ অঞ্চলে না পৌঁছলে, কবে ঐখানে ইসলামের আলো পৌঁছত তা কেউ বলতে পারত না।

[৪৮]মুজাহিদঃ অর্থ যোদ্ধা, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা স্বশস্ত্র ও স্বক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তারাই মুজাহিদ।

তিনি একজন কামেল পীর। তাঁর নূর-ই-ইলাহীর আকর্ষণে সর্বদা ধ্যান মগ্ন থাকতেন। জয়পুর হাটে নেঙ্গাপীর গ্রামে হযরত দেওয়ার শাহ্াদাত হোসেনের মাযারঅবস্থিত। তাঁর বংশে অনেক কামেল পীর জন্ম গ্রহণ করে। মানুষকে তিনি চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতেন। বর্তমানে তাঁরবংশের কামেল পীর হলেন দেওয়ান জমির উদ্দীন। লোকে তাকে পাগলা দেওয়ান বলতো।

মাওলানা তকী উদ্দীন আরাবী (র.)

ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে মাওলানা তকী উদ্দীন আরাবী বাংলাদেশে আসেন বলে অনুমান করা হয়। তিনি ছিলেন আরবীয়। তাই তার নামের সাথে "আরাবী" শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। তবে তিনি কবে কখন বাংলাদেশে আগমন করেন তার সঠিক কোন তথ্য জানা যায়নি। শাহ্ শোয়ায়েব লিখিত "মানাকিবুল আসাফিয়া" গ্রন্থ থেকে জানা যায়, সূফী আলেম শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মানেরীর পিতা শায়খ ইয়াহ্ইয়া মানের মাওলানা তকী উদ্দীন আরাবীর কাছে মাহিসুনে বিদ্যা শিক্ষা করেন। বর্তমানে রাজশাহী জেলার মাহিসন্তোষই হলো মাহিসুন।[৪৯] ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি আরব দেশ থেকে বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি বাংলাদেশে যে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন তা, বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষায়তন বলা হত। তিনি ইসলামী শাস্ত্রে বেশ পারদর্শী ছিলেন। যার ফলে তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি ভারতের ছাত্ররা মাহিসুনে প্রতিষ্ঠিত তাঁরশিক্ষায়তনে পড়া জন্য সমবেত হতো।

তিনি কতদিন জীবিত ছিলেন, কোথায় ইন্তিকাল করেছিলেন তা জানা যায়নি। তবে বাংলাদেশেই তিনি সারাজীবন কাটিয়েছিলেন কি-না এসম্পর্কেও কোন প্রামাণ্য তথ্য নেই।

[49]History of Bengal, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৭

শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা

শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা। তিনি ছিলেন বিখ্যাত হানাফী আইনবিদ। তাসাউফের সাধক এবং হাদিস শাস্ত্রে ছিল তাঁরঅগাধ পান্ডিত্য। রসায়নও প্রকৃতি বিজ্ঞানে তাঁর জ্ঞানের তুলনা হয় না। ইসলামের সেবক ও রক্ষক শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা মধ্য বাংলার ঘরে ঘরে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিতে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন এবং সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

আবু তাওয়ামা বোখারা নগরে জন্মগ্রহণ করে। বুখারা ছিল জ্ঞানানুশীলনের অন্যতম কেন্দ্র এবং খোরাসানে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তার পান্ডিত্য স্ফুলিঙ্গের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি আনুমানিক ১২৬০ খৃস্টাব্দে তিনি দিল্লীতে আগমন করেন। ধীরে ধীরে দিল্লীর জনগণ তাঁর ভক্তে পরিণত হতে থাকে। তার জনপ্রিয়তা দেখে গিয়াসুদ্দীন বলবন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এবং পরবর্তীতে তারই পরামর্শে সোনারগাঁও চলে আসেন। শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা গিয়াসুদ্দীন বলবনের দুর্বলতা কোথায় তা খুব সহজেই বুঝতে পারেন। তিনি ভাবেন সুলতানের সাথে বিরোধীতা করে দিল্লীতে থাকা তার অশোভনীয় বিষয়। তাই পরিশেষে তিনি সোনারগাঁয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। বাংলাদেশে আগমনের পথে তিনি কিছুদিন বিহারে অবস্থান করেন এবং সেখানে তিনি "মানের" নামক স্থানে ছিলেন বলে জানা যায়। জীবন চলার পথে ঘটে যায় কত ঘটনা। ঠিক তেমনি ভাবে শায়খ শরফুদ্দীনের ক্ষেত্রে ও তা ব্যতিক্রম নয়। তিনি পথে শায়খ ইয়াহ্ইয়া মানেরীর অতিথি হলেন। ইয়াহ্ইয়া মানেরীর অল্প বয়ষ্ক এক পুত্র সন্তান ছিল। তার নাম ও ছিল শরফুদ্দীন । প্রচন্ড মেধাবী ছিলেন বালক শরফুদ্দীন। শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ তাকে নিজের শিষ্য করে নেন। বালক শরফুদ্দীন, তাঁরওস্তাদ শরফুদ্দীনের পান্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তার সাথে সোনারগাঁও চলে আসেন।

"মানাকিবুল আসাফিয়া" গ্রন্থ অবলম্বনে ড. সগীর হাসান আল মাসুমী বলেছেন যে, শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মানেরী ১২৬৩ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ছয় সাত বছর বয়সে তিনি ওস্তাদের সাথে সোনারগাঁয়ে চলে আসেন। ১২৭০ খৃস্টাব্দে সুলতান গিয়াস উদ্দীনের আমলে সোনারগাঁয়ে আগমন করেন। "মানাকিবুল আসাফিয়ায়" বর্ণনা করা হয় যে, শায়খ

শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মানেরী বয়:প্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন ধর্ম শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পর ওস্তাদ শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার সাথে সাক্ষাৎ ঘটে এবং তাঁরহাত ধরে সোনারগাঁয়ে চলে আসেন। কাজেই ছয়-সাত বছর বয়সে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর নয়[৫০]। কম পক্ষে ১৫ বছর বয়সের প্রয়োজন। কাজেই বলা যায় ১২৬৩ খৃস্টাব্দে তার জন্ম এবং ১২৭৮ খৃস্টাব্দে তিনি সোনারগাঁয়ে আগমন করেন।

শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা সোনারগাঁয়ে আগমনের সময়, সোনারগাঁও দিল্লীর সুলতানের অধীনে ছিল। সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের রাজত্বের প্রথম দিকে সোনারগাঁ সুলতানদের অধিকারে আসেনি। ১২৭১ খৃস্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন বলবন মুগীসুদ্দীন তুগলককে বাংলার গভর্নর করে পাঠান। ১২৭৮ খৃস্টপূর্বে মুগীসুদ্দীন পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন এলাকা জয় করে সোনারগাঁ পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন।

এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, ১২৭২ খৃস্টাব্দে পর থেকে ১২৭৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সোনারগাঁ মুসলমানদের অধীনে ছিল এবং ১২৯১ খৃস্টাব্দের পর থেকে এ অধিকার শুরু স্থায়ীভাবে। সুতরাং বলা যায় শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা ১২৭৮ খৃস্টাব্দে সোনারগাঁও আগমন করেন।

পরবর্তীতে তিনি বাংলার প্রাচীর রাজধানী সোনারগাঁও এ ইসলাম প্রচার শুরু করেন এবং সাধারণ শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তে তিনি একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এটি ছিল তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে বড় মাদরাসা। বহু দূর-দূরান্ত থেকে জ্ঞান-পিপাসু ছাত্র ও সাধক সোনারগাঁওয়ে আসতে থাকে এবং ধীরে ধীরে সোনারগাঁও ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হতে থাকল। শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার পূর্বে তকী উদ্দীন আরাবী ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এমনকি তিনি মাদ্রাসা ও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার ইসলাম ও সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপকতা ছিল খুব বেশি। তাই শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাকে ইসলামী শিক্ষার

[৫০]প্রসঙ্গত উলেণ্ডখ্য, ইমাম শাফিঈ ১৫ বছর বয়ক্রমকালে সকল শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।

পথিকৃত বলা হয়। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে, পরবর্তীতে বাংলাদেশে ইসলামী সমাজ গঠনে, এই মহৎ উদ্যোগ আমাদের যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

বাংলাদেশের ইসলামী সমাজ গঠন কল্পে অসাধারণ ভূমিকা রেখে এ মহা মানব (৭০০ হিজরীতে) ১৩০০ খৃস্টাব্দেইন্তিকাল করেন। এবং সোনারগাঁয়েই তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।[৫১]

সোনারগাঁও সম্পর্কে ড. এম. এ রহিম বলেন, "Sonargaon was a lively sent of learning from the later years of the thirteenth century. It began under the proitious patronage of the renowned scholar Maulana Sharf al din Abu Tawwama. He founded this seminary of advanced learning and devoted his life to teaching at this place, his renown as a scholar attracted students from far and near"[52]

হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মানেরী

শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার অন্যতম ছাত্র ও যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়ামানেরী। নাম শরফুদ্দীন। পিতার নাম ইয়াহ্ইয়া । বিহারের মানের শহরের অধিবাসী। তিনি ছিলেন বিখ্যাত আলিম। বাল্যকাল থেকেই ইসলামী জ্ঞান ছাড়া ও নানা বিষয়ে ছিল তার অগাধ জ্ঞান। তিনি শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা যখন দিল্লী থেকে বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন সেই সময়ে তাঁর হাত ধরে সোনারগাঁওয়ে আগমন ঘটেছিলইয়াহ্ইয়া মানেরীর। ওস্তাদ তার ছাত্রের জ্ঞানের গভীরতা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে সঙ্গে করেই বাংলায় আগমন করেন। ইয়াহ্ইয়া মানেরী দীর্ঘ ১৫ বছর বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভে এতই বিভোর ছিলেন যে, তাঁর বাড়ী থেকে আসা চিঠি পর্যন্ত পড়বার অবসর পেতেন না। অনেক দিন পর তাঁরসযত্নে রাখা চিঠিগুলো পড়তে শুরু করলেন হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন এক চিঠিতে তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ। দীর্ঘ ১৫ বছর শিক্ষা লাভের মধ্যে দিয়ে

[৫১] দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা ১৩৭৩, ৫ মাঘ।

[৫২] Dr. M .A Rahim, "Social &Cultural History of Bengal" Vl-11, Karachi, 1st end. 1967, P. 289

শিক্ষক ও ছাত্র সম্পর্ক এতই ভাল হল যে, পরবর্তীতে ওস্তাদ আবু তাওয়ামাহ তাঁর মেয়েকে বিয়ে দিয়ে সম্পর্ককে মধুর থেকে মধুরতর করে তুললেন। ধীরে ধীরে ওস্তাদও শিক্ষকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ও ইসলামী জীবন ধাারা বেগবান হতে থাকে। অত:পর জন্মভূমির টানে ১২৯৩ সালে তাকে সোনারগাঁও ত্যাগ করে মানেরে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে যেয়েও তিনি ইসলামী শিক্ষাদানে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন।তাঁর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মানেরী বহু মূল্যবান ইসলামী গ্রন্থও রচনা করেন।

হযরত শাহ্-সূফী শহীদ (র.)

পশ্চিম বাংলার প্রবেশ দ্বার সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও। বাংলার শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক বন্দর। হুগলীর নিকটবর্তী সপ্তগ্রাম। যে বন্দরে নোঙ্গর করতো নানা দেশি-বিদেশ জাহাজ গুলো। বিশেষ করে সেখানে নোঙ্গর করতো আরব ও ইরানের জাহাজ। আমরা জানি, আরব বণিকরাই প্রথম ইসলামের সত্যবাণী নিয়ে এদেশে আগমন করেছিলেন। ১২৯০ খৃস্টাব্দে তিনি দরবেশ ছিলেন। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। সপ্তগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় রাজত্ব করত হিন্দু রাজাগণ।

কথিত আছে যে, ভূবেদ নামক এক অত্যাচারী রাজা বাস করতো ত্রিবেনী অঞ্চলে। একদা এক নওমুসলিম তার নব জাতক ছেলের আকীকা দেওয়ার জন্য গরু কোরবানী করে। এ সংবাদ রাজা ভূবেদের কাছে পৌঁছলে তিনি গরু কোরবানী করার অপরাধে নওমুসলিম লোকটির সামনেই অত্যাচারী রাজা নবজাতক শিশুটিকে হত্যা করে।

সুলতান রুকনুদ্দীন কাইকাউসের (১২৯১-১৩০১) খৃস্টাব্দ নিকট ফরিয়াদ করেন দরবেশ শাহ্ সূফী।। সুলতানের নির্দেশে এক বিরাট বাহিনী এসে ত্রিবেনী আক্রমণ করে। ঐ যুদ্ধে রাজা পরাজিত হন এবং সে অঞ্চলে ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তোলন হয়।

যুদ্ধে মুসলমানশক্তি জয়ী হলেও শাহ্ সূফী যুদ্ধ ক্ষেত্রেই শাহাদাত বরণ করেন। পান্ডুয়াতে তাঁর সমাধি। ভক্তরা তাঁকে আজো শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

হযরত শায়খ আবদুল্লাহ কিরমানী (র.)

ইরানের কিরমান শহরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সুলতান বখোরদার শাহ্। তিনি পারস্যের কিরমানের শাসনকর্তা ছিলেন। আবদুল্লাহ ওলি এই শহরে জন্ম গ্রহণ করেন বলে তিনি "কিরমানী" শব্দটি ব্যবহার করেন।[৫৩] বাংলাদেশে তুর্কী রাজত্বের সূচনা লগ্নে এ দেশে আগমন করেন শায়খ আবদুল্লাহ কিরমান। শাহ্ মাহমুদ গজনবী যেভাবে ইসলাম প্রচারে রাজশক্তির সহায়তা পেয়েছিলেন, তিনি সেভাবে কোন সহায়তা পাননি। ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কল্পে তিনি যা কিছু করেছেন তা তিনি তাঁর দায়িত্ববোধ থেকেই করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বীরভূম ও বাকুড়া জেলায় ইসলাম প্রচার হয়েছিল। সে সময় শাহ মাহমুদ গজনবী বর্ধমানের মঙ্গল কোটে ইসলাম প্রচার করেন।

ঠিক সেই সময়ে বীরভূমে ইসলাম প্রচার করেছিলেন শায়খ আবদুল্লাহ কিরমানী। তিনি ৯৫৫ হিজরী ৪ সফর ইন্তিকাল করেন। প্রতিবছর ১১ ফাল্গুন তাঁর ওরস উদযাপিত হয়।[৫৪] বীরভূমের "খুস্তিগিরী" নামক স্থানে এই সূফীর মাযারঅবস্থিত।

আমীর খান লোহানী

মুসলিম শাসনের প্রথম যুগে রাঢ় বঙ্গে বা মেদিনীপুর অঞ্চলে যিনি আগমন করেছিলেন তিনি হলেন আমীর লোহানী। মেদেনীপুর জেলায় খড়গপুরে ইন্দাস গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত। এটি মূলত পাথর দ্বারা তৈরি। কিংবদন্তীতে আছে যে, মন্দিরের পাথর দিয়েই তার মাযার নির্মিত হয়। মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সম্মুখে প্রতিদিন একটি করে নরবলি দেওয়া হতো। আমির খানের প্রচেষ্টায় এ প্রথার উচ্ছেদ হয় এবং তাঁর জন্যই ঐ অঞ্চলের লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সুযোগ পায়। অনুমান করা হয় তিনি আফগানিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

---

[৫৩] Dr. Md. Enamul Haq "Sufism in Bengal"Ibid. P. 197-198

[৫৪] "দৈনিক লিপি" (বিশেষ ক্রোড়পত্র) বীরভূম (প.বঙ্গ), ভারত, রবিবার, ১৩ মার্চ ১৯৮৩।

উলগ-ই-আযম জাফর খাঁ গাজী

উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গে ইসলাম প্রচারে যারা অনবদ্ধঅবদান রেখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে উলুগ-ই-আযম জাফর খাঁ গাজী ছিলেন অন্যতম মুজাহিদ। ইসলাম প্রচার ও প্রসারে তিনি বার বার বিজয়ী হয়েছিলেন। উত্তোলন করেছিলেন ইসলামের পতাকা। ধারণা করা হয় তিনি লাখনৌতির সুলতান কাইকাউসের সেনাপতি ছিলেন। সুলতানের নির্দেশে বহু অভিযান পরিচালনা করেন তিনি। এমনকি বরেন্দ্র ভূমিতে তিনি ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে একটি মসজিদ ও নির্মাণ করেছিলেন। এটি দিনাজপুর জেলায় দেবকোটে অবস্থিত।

এটি হিজরী ৬৯৭ এবং মুহররম মাসের প্রথম তারিখ অর্থাৎ ১২৯৭ খৃস্টাব্দে ১৯ অক্টোবর মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, জাফর খাঁ কে সুলতান রুকনুদ্দীন কাইকাউসের অধীনস্থ একজন রাজ পুরুষ বলে ধারণা করেছেন।

ইতিপূর্বে আমরা শাহ্ সূফী শহীদদের ঘটনা আলোচনায় জাফর খাঁ গাজীর ত্রিবেনী বিজয়ের ঘটনা উল্লেখ করেছি । শুধু তাই নয়, ত্রিবেনী বিজয়ের পূর্বে মান-নৃ-পতি নামক রাজাকে পরাস্ত করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। ভূবেদ রাজার অত্যাচারের কাহিনী শুনে তাকেও শাস্তি দেওয়ার জন্য ত্রিবেনীতে অভিযান পরিচালনা করেন। মোট কথা তিনি বহু অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। ১২৯৮ খৃস্টাব্দে তিনি হুগলীর পান্ডুয়ায় একটি মসজিদ নির্মাণকরেন। এ মসজিদের শিলা লিপিতে জাফর গাজীর পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তিনি প্রতি অভিযানে ভারতের বিভিন্ন নগর জয় করেন এবং তীক্ষ্ণ তরবারি ও বর্শার আঘাতে পাষাণ হৃদয়বিধর্মীদের ধ্বংস করেন।"[৫৫] এছাড়া ছোট পান্ডুয়ায় তিনি মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন।

তাই নি:সন্দেহে বলা যায় যে,ইসলাম কে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। শক্ত হাতে তরবারি ধরেছেন। জাফর-খাঁ- গাজী ১৩১৩ খৃস্টাব্দে ত্রিবেনীতে ইন্তিকাল করেন এবং সেই পাথর দ্বারা নির্মিত মন্দিরেই তাকে সমাহিত করা হয়। তাঁর দুই ছেলে ছিল তাদের একজনের নাম বড় খান গাজী ও অন্যজন উগওয়ান খান। তাঁর কবরের পাশে, তাঁর এ দু'পুত্রের কবর ও দেখা যায়।

---

[৫৫]রমেশ চন্দ্র মজুমদার, "বাংলাদেশের ইতিহাস", মধ্যযুগ, পৃ. ৫৬

পীর বদরুদ্দীন

কালের বিবর্তনে অসংখ্য সূফী দরবেশ এদেশে আগমন করেছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন পীর বদরুদ্দীন। গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্‌র (১৪৯৩-১৫১৯) রাজত্বকালে দিনাজপুরে অনেক হিন্দু লোক বাস করত। কথিত আছে, পীর বদরুদ্দীন মহেশ রাজার রাজত্বকালে বেশ কিছু ভক্তদের নিয়ে দিনাজপুরের হেমতাবাদ নামক স্থানে আগমন করে। মহেশ রাজার অত্যাচারে জনগণ অতিষ্ট হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে বদরুদ্দীন সুলতানের নির্দেশে মহেশ রাজাকে উচ্ছেদ করেন।

পীর বদরুদ্দীন এর প্রচেষ্টায় অসংখ্য হিন্দু, বৌদ্ধ ইসলামের ছায়াতলে সমাসীন হন। আর অন্যতম শিষ্য ছিলেন মখদুম গারীবুল ইসলাম। তিনি দীর্ঘ ১২ বছর সাধনায় মগ্ন ছিলেন। পীর বদরুদ্দীনের পর তাঁর দেহ মোবারক মহেশ রাজার রাজ প্রাসাদেই সমাহিত করা হয়। তাঁর পাশে তার ভক্ত অনুচরদের বেশ কিছু সমাধি দেখা যায়। পরবর্তীতে দরবেশের সমাধি পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

এছাড়া ও মাওলানা আতা ওহীদুদ্দীন বা আতাউর নামক এক দরবেশ (১৩০০-১৩৫০) খৃস্টাব্দে দিকে দিনাজপুরে আগমন করেন। তিনি ও ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সু-প্রসিদ্ধ "দলদীঘির" পাড়ে তিনি চির নিদ্রায় শায়িত হন। তিনি একটি গৃহ নির্মাণ কাজে হাত দিলে, তা সমাপ্তি হওয়ার পূর্বেই পরলোক গমন করেন। এই গৃহে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়, মাওলানা বদরুদ্দীন একজন শ্রেষ্ঠ আউলিয়া ও ইসলাম ধর্মের প্রদীপ স্বরূপ ছিলেন।[৫৬]

হযরত সৈয়দ নেকমর্দান (র.)

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের পূর্ব থেকে শুরু করে মোঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত অসংখ্য সূফী-সাধক, পীর, ফকীর ইসলাম প্রচারের জন্য বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন। তাদের মধ্যে সৈয়দ নেকমর্দান বা সৈয়দ নাসির উদ্দীন শাহ্ আউলিয়া অন্যতম। তিনি দিনাজপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। একসময়

[৫৬]মুহম্মদ এনামূল হক, "পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম" ১৯৪৮, পৃ. ৫৩

দিনাজপুর অঞ্চল হিন্দু সামন্তরাজাদের দ্বারা পরিচালিত হত। তারা নানা প্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন করত সাধারণ জনগণের উপর। শুধু তাই নয়, তিনি মুসলমান পরিব্রাজকদের উপর চালাতো নির্মম অত্যাচার। হিন্দু রাজাদের এই বর্বর আচরণের কথা নেকবাবা সৈয়দ নাসির উদ্দীন আউলিয়ার কানে পৌঁছাতেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশে উত্তরাঞ্চলে আগমন করে। তাঁর আগমনের কথা শুনে ভীমরাজ ও পৃথ্বীরাজ নানা ভাবে তাকে প্রতিহত করার চেষ্টায় চালায়। কিন্তু তারা ব্যর্থ হন। নেক বাবা দিনাজপুরে স্থায়ী ভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। এবং পরবর্তীতে এই নেক বাবার হাতেই তাদের পরাজয় ঘটে[৫৭]। তাদের অত্যাচারের অন্যতম কারণ ছিল যদি কোন পীর বা দরবেশ দিনাজপুরে আগমন করত তাহলে দলে দলে লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত।

কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায়, অত্যাচারী ভীমরাজও পৃথ্বী রাজা তাদের জনবল দিয়ে একবার নেক বাবাকে আটক করে কুলিক নদীর উপকূলে এক গহ্বরে রেখে অনাহারে তাকে হত্যার চেষ্টা চালায়। এ খবরে আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক পীর-দরবেশ দিনাজপুরের উত্তরাঞ্চলে আগমন করেন এবং অত্যাচারী ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করেন। এর পর থেকেই দিনাজ পুরের এ অঞ্চলকে "নেকমর্দ" বলা হয়। এবং সৈয়দ নাসির উদ্দীনকে নেকমর্দের পীর বলে অভিহিত করা হয়। জন-সাধারণের নিকট তিনি আজও "নেকমর্দ" নামে পরিচিত। আর অনেকে তাকে "নেকবাবা" নামেও ডাকত।পরবর্তীকালে নেকমর্দ নাম পরিবর্তন করে ভবানন্দপুর রাখা হয়। তিনি ছিলেন সেই অঞ্চলের সর্ব প্রাচীন ইসলাম প্রচারক।তাঁর মৃত্যুরপর তাঁরমাযার বহুদিন পর্যন্ত অনাবৃত পড়েছিল।

পরবর্তীতে বিষয়টি (১৬১৮-১৭০৭) সালের দিকে আওরঙ্গজেবের এক সেনাপতির গোচরীভূত হলে তা তিনি সম্রাটকে অভিহিত করেন। সম্রাট যখন জানতে পারলেন এটি পীরের মাযার তখন তিনি ৩০০ বিঘা জমি মাযার সংরক্ষণের জন্য দান করেন। জনগণ আজও নেকবাবার মাযারজিয়ারত করতে আসেন। প্রতিবছর ১ বৈশাখ খুব জাঁক-জমক করে উরস ও মেলা বসে। এই মেলা "নেকমর্দের মেলা" নামে অভিহিত।

[৫৭] মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান তালিব, "পূর্বোক্ত পৃ: ১৪৩।

শায়খ চিহিলগাজী (র.)

আরব, ইরান ও বাগদাদ থেকে যে সব ধর্ম প্রচারক বাংলাদেশে এসে ইসলাম প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে একদল দরবেশ দিনাজপুর জেলার উত্তরাঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। তৎকালীন সময়ে হিন্দু রাজাদের প্রভাব ছিলঅত্যন্ত বেশী। সূফীগণ আলণ্ঢাহ তায়ালার একত্ববাদের বাণীকে সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। হিন্দু রাজাগণ নানা ভাবে তাদের কাজেবাঁধা দিতেন। এক পর্যায়ে অমুসলিমগণদরবেশদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং একে একে ৪০ জন দরবেশ মৃত্যু বরণ করেন। তাদেরকে একসাথে সমাহিত করা হয় । তাদের সহযোদ্ধা বা অনুচরদের কে ও তাদের আশে-পাশে কবর দেওয়া হয়। ৪০ জন দরবেশের কবর একত্রে ৫৪ ফুট দীর্ঘ। এটিকে মাত্র একটি কবর বলা হয়।

প্রকৃত পক্ষে ৪০ জন গাজীর নাম আমাদের আজও অজানা রয়ে গেছে। তবে তাদের দলপতি নাম জানা যায় বিভিন্ন গবেষণা থেকে। ধারণা করা হয় তিনিই "চিহিল গাজী" নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁরনাম হযরত শেখ জয়েন উদ্দীন সোহেল বাগদাদী।

দিনাজপুর জেলায় চিহিলগাজী দরবেশেদের মাযার বিদ্যমান। এটি দিনাজপুর শহর থেকে ৩ মাইল উত্তরে। "চিহিল" ফারসী শব্দ এর "অর্থ চল্লিশ"। তাই চল্লিশজন দরবেশকে বুঝানোর জন্য "চিহিল" শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সম্প্রতি গাজীর মসজিদ থেকে যে তিনটি শিলালিপি আবিস্কৃত হয়েছে তার কোথাও চিহিল গাজীর নাম পাওয়া যায়নি। সময়ের আবর্তে তা অবলুপ্ত প্রায়। বিখ্যাত দরবেশ হযরত কুতুবুদ্দীন, বখতিয়ার কাকী (র.) ছিলেন তাঁর মুর্শিদ। তাঁর মৃত্যুর পর চিহিল গাজী স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে, মুর্শিদের আদেশ পাল করতেই দিনাজপুরে উপস্থিত হয়েছিলেন। কাজেই বলা যায়, তের শতকের ১২৩৭ খৃস্টাব্দে রাজা বখতিয়ার কাকী ইন্তিকাল করেন এবং তের শতকের মাঝা-মাঝি সময়ে চিহিল গাজী দিনাজপুরে আসেন। তের শতকের শেষের দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে চিহিল গাজীর মাযারথেকে যে আরবী শিলালিপি সংগ্রহ করেন তাতে তাঁর নামের উল্লেখ নেই।

মার্টিন কর্তৃক লিখিত "Eastern India" গ্রন্থে এই মসজিদের কথা উল্লেখ আছে। প্রাচীন বাংলার অন্যতম মসজিদ চিহিল গাজী মসজিদ। মসজিদ সম্পর্কে মি. ওয়েষ্ট মেকট বলেছেন,

"From the strength of the brick arches, the workmanship of the dome and the fact that the hewn stones which are built inner side of each archway, have been cut to fit their places although bearing marks of clamps to show that they have been taken from another building."[৫৮]

এছাড়াও দিনাজপুরে অসংখ্যা পীর দরবেশের মাযার অবস্থিত দিনাজপুরে মানিক জাহান, বিবি সুয়া, বালা শহীদ সাহেব, পাগল দেওয়ান, ঘোড়া শহীদ সাহেব প্রমুখ পীর দরবেশের মাযার লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বাংলাদেশের ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শিক্ষার বিকাশে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। যা আজও কালের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। যাদেরকে মানুষ আজও গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

সাইয়েদ আব্বাস আলী মক্কী ও রওশন আরা

বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার বশির হাট মহকুমায় হাড়োয়া নামক গ্রামে যে দুজন মহান সাধক মুজাহিদ ইসলামের ললিত বাণী জনমনে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তাদের একজন হলেন সাইয়েদ আব্বাস আলী মক্কীও তার ভগ্নী রওশন আরা। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ইসলাম প্রচারে তাদের অবদান অতুলনীয়। তিনি "গোরা চাঁদ" নামেও পরিচিত। ৬৬৪ হি. সনে (১২৬৫ খৃস্টাব্দে) মক্কা নগরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩২১ খৃস্টাব্দে বাদশা গিয়াসউদ্দীন তোগলকের রাজত্বকালে দিল্লীতে আসেন। পরে ১৩২৪ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশের বিদ্রোহ দমনকল্পে, দিল্লীর সুলতানের সাথে বাংলাদেশে আগমন করেন। বাদশা পরবর্তীতে ১৩২৫ খৃস্টাব্দে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু সাইয়েদ আব্বাস আলী মক্কী আর ফিরে না

[৫৮]ড. গোলাম সাকলায়েন, পূর্বোক্ত পৃঃ ৬৫।

গিয়ে, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের গতি ধারাকে আরো বেগবান করে তুলেন। আব্বাস আলী মক্কী মূলত লাখনৌতি থেকে সাতগাঁও রাজ্যে চলে আসেন এবং এখানে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। প্রচলিত আছে যে, আব্বাস আলী মক্কী যখন চব্বিশ পরগণাজেলায় ইসলাম প্রচার করতে লাগলেন, তখন চন্দ্রকেতু নামে এক স্থায়ী শক্তিশালী হিন্দু রাজা রাজত্ব করতেন। ইসলাম প্রচার কার্যে নানা ভাবে বাধা দেওয়ার অপচেষ্টা চালালে রাজাচন্দ্র কেতুর সাথে তাঁর সংঘর্ষ হয়। সাতগাঁও এর তৎকালীন গভর্নর ছিলেন মালিক ইজ্জুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া। তার সহায়তায় রাজা চন্দ্রকেতুকে পরাজিত ও নিহত করতে সক্ষম হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পরে অক্ষয়ানন্দ ও বকানন্দ নামে দু'জন হিন্দুরাজার সাথে তাঁর বিরোধবাঁধে। বকানন্দ, আব্বাস মক্কীর হাতে নিহত হয়। আহত হলেন তিনি নিজেই। পরে হাড়োয়ায় এসে তিনি মৃত্যু বরণ করেন বলে জানা যায়। অন্য দিকে রওশন আরা ছিলেন আব্বাস আলী মক্কীর ভগ্নি। তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু ছিলেন। ১২৭৯ খৃস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভ্রাতা আব্বাস আলীর সাথে প্রথমে দিল্লী ও পরে বাংলায় আসেন এবং তারাগুনিয়ায় ইসলাম প্রচার করেন। ১৩৪২ খৃস্টাব্দে ৬৪ বছর বয়সে ইন্তিকালকরেন।[৫৯]

গৌড়ের সুলতান আলা উদ্দীন আলী শাহ্ পীর গোরাচাঁদ এর মাযারের উপর এক সৌধ তৈরী করেছিলেন।[৬০]

কাত্তাল পীর (র.)

বাংলাদেশের ইসলাম প্রচার কার্যে অসংখ্য নাম না-জানা পীর দরবেশদের আগমন ঘটেছে। তাঁরা আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের বাণীকে সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন। তেমনি একজন নাম না-জানা পীর হলেন কাত্তাল পীর। জনমনে তিনি কাত্তাল পীর নামে পরিচিত। তাঁর এ ধরণের নামের কারণে ঐ স্থানের নাম করা হয় "কাত্তালগঞ্জ"। এছাড়া শাহ্মোল্লাহ, শাহ্নূর, শাহ্ আশরাফ, কাবুলী শাহ্, শাহ্ মুবারক, আলী প্রমূখ সূফীদের কবর ও চট্টগ্রামের চন্দনপুর মহল্লায় একটি উঁচু টিলার উপর। কথিত আছে যে,

---

[৫৯]Dr. M.A. Rahim, Ibid Vol-1, 1963 P.126

[৬০]বিস্তৃত তথ্য ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ," বাংলা সাহিত্যের কথা "২য় খন্ড, ঢাকা, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ পৃ. ৪৬৮-৪৭৫। সেইসঙ্গে BengalDistric Gazeetteers (24 Parganas) Calcutta, 1914.

তারা শাহ্ বদরের সমসাময়িক দরবেশ। কাত্তাল আরবী অর্থে দুর্দান্ত, অসম সাহসী, যিনি শত্রু নিপাতন করেন। তিনি চট্টগ্রামে এসে ইসলামের সু-মহান বাণীকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইসলাম প্রচারের গতিকে করেছেন আরো বেগবান।

হযরত শাহ্ বদরুদ্দীন আল্লামা (র.)

চট্টগ্রাম সর্ব প্রথম বিজিত হয় কদল খান গাজীর হাতে। বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের সেনাপতি কদলখান গাজী।[৬১] ১৩৪০ খৃস্টাব্দে শাহ্ বদরুদ্দীন আল্লামা দরবেশ বাহিনীর সহায়তায় চট্টগ্রাম জয় করেন। সুতরাং বদরুদ্দীন আল্লামা ১৩৪০ খৃস্টাব্দে জীবিত ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। শাহ্ বদর বা বদর পীরের প্রভাব এত বেশি ছিল যে, বিশেষ করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের নদী পথ ভ্রমণ করলে তা সহজেই বুঝা যায়। সেখান যারা হিন্দু মুসলিম মাঝি- মাল্লারা নৌকায় আরোহণের পূর্বে বদর পীরের নাম উচ্চারণ করে। ধারণা করা হয় তিনি হয়তো আমাদের শাহ্ বদরুদ্দীন আল্লামা। চট্টগ্রাম শহরে বখশী বাজার মার্কেটের দক্ষিণে তাঁর মাযার অবস্থিত। শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মানেরীর একখানা পত্র তাঁকে নিয়ে নানাবিধ মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে ধারণা করেছেন যে, শাহ্ বদরুদ্দীন বিহারের অধিবাসী ছিলেন।

ইয়াহ্ইয়া মানেরী পত্রে যার নাম উল্লেখ করেন তিনি হলেন, শাহ্ মখদুম বদরুদ্দীন বদরে আলম জাহেদী। তিনি পঞ্চদশ শতকের লোক বলে জানা যায়।

জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, আমাদের আলোচ্য পীর বদর চট্টগ্রামের আস্তানা গেড়ে সকল প্রকার জ্বিন-পরীদের আস্তানাকে উৎখাত করে দেন। চট্টগ্রামের লোকজন একসময় জ্বিন-পরীদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে দুরূহ জীবন যাপন করতেন। যেখানে মগ দস্যুদের ও আস্তানা ছিল। কিন্তু বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান মুবারক শাহের সেনাপতি কদলখান গাজীর সহায়তায় বদরপীর মগদের পরাজিত করে মুসলিম শাসনে সূচনা করেছিলেন।

৬১ East Bengal District Gazetteers, Chittagong 1908, P. 20-21

হযরত শাহ্জালাল মুজাররাদ (র.)

বাংলাদেশের ইসলাম প্রচারে সূফীও আলিম গণের ভূমিকা অপরিসীম। মহান আল্লাহ পাকের একত্ববাদের বাণীকে সু-প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নানা সময়ে, নানা ভাবে আগমন ঘটেছে সূফী-সাধকদের। সেই ধারা বাহিকতায় পূর্ববঙ্গ ও আসামে ইসলাম প্রচারে যে সু-মহান ব্যক্তিত্ব আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি হলেন শাহ্ জালাল মুজাররাদ-ই-ইয়ামানী।[৬২] শাহ্ জালাল প্রকৃত পক্ষে শায়খ জালাল নামে পরিচিত ছিলেন। এবং পরবর্তীতে শায়খ "শাহ্" শব্দে রূপান্তরিত হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল মুহাম্মদ এবং তিনি ছিলেন কুনিয়া শহরের অধিবাসী। তাঁর নামে "মুজাররাদ" শব্দটি ব্যবহার করার কারণ তিনি ছিলেন চির কুমার।

তাঁর পিতা মুহাম্মদ ও ছিলেন একজন সূফী। ছোট বেলায় তিনি তাঁর পিতা মাতা কে হারান । তাঁর মাতুল বিখ্যাত সূফী সাইয়েদ আহম্মদ কবীর সুহরাওয়ার্দী তাঁর লালন পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁরমামার সঙ্গে কাটান। শাহ্ জালাল উদ্দীনকে তাঁরখালু সূফীশাহ্ জালাল উদ্দীন বুখারী নামক এক দরবেশের নির্দেশে জাহেরী ও বাতেনী উভয় শাস্ত্রে শিক্ষাদান করেন এবং তার আপন মাতুলের নিকট সুহরাওয়ার্দী তরীকা ও শিক্ষা করেন।

পরে তিনি খুব অল্প সময়ে কামালিয়াত লাভ করেন এবংএই খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে । মাতুল তাঁকে একদন্ড মাটি দিয়ে দূর দেশে গমনের নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, এই মাটির অনুরূপ মাটি যেখানে পাওয়া যাবে, সেখানেই যেন তিনি আস্তানা বা খানকা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইসলাম প্রচার কার্য চালান। তিনি মাতুলের আদেশ রক্ষা কল্পে ইয়েমেন থেকে বহির্দেশ যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু ইয়েমেনের বাদশা তাকে কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন করেনি।

ইয়েমেনের বাদশা ছিলেন খুব চতুর রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব। হযরতের আগমনের কথা শুনে তিনি তার মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের কে ডেকে বললেন, "আমার অনেক দিনের ইচ্ছা যে, আমার দেশে একজন কামিল দরবেশ এসে খেদমত করুক। শুনেছি একজন দরবেশ আমার রাজ্যে

[৬২]ইয়েমেনে তাঁর জন্মস্থান কি-না এ সম্পর্কে ড. শহীদুল্লাহ ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, তাঁর বাসস্থান ছিল তুরস্কের কুনিয়া। মাহে নও, ১৯৬২, পৃ.৩

এসেছেন। তাঁকে পরীক্ষা করতে চাই, তিনি সত্যিকারের কামিল কি-না।" বাদশাহ্ হযরতের কাছে একপাত্র শরবতে বিষ মিশিয়ে তা পান করতে পাঠালেন। শাহ্ জালাল ব্যাপারটা জানতে পারলেন। তিনি আনন্দের সাথে শরবত পান করলেন। কিন্তু যেমন কর্ম তেমন ফল। দরবেশের জন্য বিষ মেশানো শরবত অমৃত, কিন্তু শরবত দাতার হল প্রাণহানী। বাদশা পরবর্তীতে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। বিষয়টি রাজার ছেলে অনুধাবন করে রাজ্য ও রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করে দরবেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। দরবেশের হাত ধরে নিজ দেশ ত্যাগ করে বহি:র্দেশ গমন করেন। হযরত শাহ্ জালাল মুজর্রদ ও শাহ্যাদা প্রথমে ভারতের দিল্লীতে এসে উপস্থিত হন। সেখানে বিখ্যাত দরবেশ নিজামউদ্দীন আউলিয়া, হযরত শাহ্ জালালকে কতগুলি জালালী কবুতর উপহার দেন।

দিল্লী থেকে রওয়ানা হয়ে বহু দেশ পেরিয়ে বাংলাদেশে এসে হাজির হয়েছিলেন তিনি । সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের(১৩০১-১৩২২) আমলে বাংলাদেশের সিলেটে এসে হাজির হয়েছিলেন। সিলেটে তখন রাজা গৌরগোবিন্দ নামে এক অত্যাচারী রাজা রাজত্ব করত। জনগণহিন্দু রাজার অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠে। "গুলজার-ই-আবরার"ও"সুহাইল-ই-ইয়ামান" গ্রন্থদ্বয় একমত প্রকাশ করেছে।

ঘটনা: শায়খ বোরহানুদ্দীন নামক একজন মুসলমান সিলেটে বাস করতেন। তার এক পুত্র সন্তানের জন্ম উপলক্ষ্যে তিনি গরু কোরবানী করেন। এ সংবাদ পেয়ে রাজা গৌরগোবিন্দ গো হত্যার শাস্তি স্বরূপ তার ডান হাত কেটে ফেলেন এবং নবজাতককে ও হত্যার নির্দেশ দেন। তার সন্তানকে হত্যা করা হল। শাস্তি প্রাপ্ত বোরহান উদ্দীন, গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের দরবারে উপনীত হয়ে, এ অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিকারের জন্য ফরিয়াদ জানান। সুলতান, সিকান্দার খান কে সেনা বাহিনী নিয়ে সিলেট আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। রাজা গৌর গোবিন্দের হাতে সিকান্দর বাহিনী পরাজিত হন। এ পরাজয়ের খবর শুনে সাতগাঁও এর গভর্নর নাসীরুদ্দীন কে, সিকান্দর বাহিনীকে সাহায্য করার নির্দেশ দেন। পরে হযরত শাহ্ জালাল তাঁর ৩৬০ জন শিষ্যসহ যুদ্ধ করেন এবং রাজা গৌরগোবিন্দ শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরণ করেন । তিনি আসামের পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন।[৬৩]

[৬৩] Dr. Md. Enamul Haq, Ibidm p.220

সিলেট বিজিত হবার পর শাহ্ জালাল সেখানেই নিজের কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং তাঁর শিষ্যদের এক অংশ গৌড়ের সেনাদের সাথে ফিরে আসেন। তাঁরা বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। বাকীরা তাঁর সহযোগী হয়ে থাকে। যার ফলে সিলেট ও তার চার পাশের জেলা সমূহ ও আসামের অগণিত লোক ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হতে থাকেন । তাঁর শিষ্যগণ শুধু শ্রীহট্টে নয় বাংলাদেশের ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, রংপুর, চট্টগ্রাম ও আসামের বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। হযরত শাহ্ জালালের আগমনের পূর্বে, সিলেটে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। রাজা গৌর গোবিন্দের অকথ্য নির্যাতনের হাত থেকে যখন সিলেট বিজিত হল, তখন সূফী-সাধকদের মন মুগ্ধকর আচরণে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে।

ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের (১৩৩৮-১৩৫০) আমলে মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলায় আগমন করেন। বিখ্যাত এই পরিব্রাজক হযরত শাহ জালাল সম্পর্কে বলেন,"Once calls the saint Tabrizi and once shiraji, Which shows that he was not sure of what he was either- no serious doubt is now entertained that he was shah jalal, the famous saint of sylhet, Whom the traveller went to see. "[64]

হযরত শাহ্ জালালের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য নৌপথে চট্টগ্রামে অবতরণ করেন এবং তিনি শাহ্ জালালের অস্তানায় অবস্থান করেন। তিনি আরো বলেন, "শাহ্ জালাল লম্বা ও পাতলা গড়নের ছিলেন। দেখতে অনেকটা হালকা পাতলা ছিলেন। তিনি সারা রাত আল্লাহর ইবাদত করতেন। একাদিক্রমে ৪০দিন রোজা রাখতেন। দশ দিন পরপর তিনি গাভীর দুধ নিয়ে ইফতার করতেন।"

ইবনে বতুতা লিখেছেনঃ

[৬৪]N.K. Bhattasali, Coins and Chronology of Early Independent Sultans of Bangal, England 1982 (W Heffer S. Sons)

হযরত শাহ্ জালাল লোকালয় থেকে দূরে একটি গুহায় বসবাস করতেন। কিন্তু গুহার বাইরে ছিল তার খানকাহ্ সেটি ও লোকালয় থেকে দূরে । নানা অঞ্চল থেকে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ এবং সূর্যের উপাসক তার দর্শণ লাভের আশায় সমবেত হতো। তারা তাঁর জন্য তোহফা ও নজরানা নিয়ে আসতো। সে গুলো শাহ্ জালাল নিজে ভোগ করতেন না। সকল ফকীর, মিসকিনদের মধ্যে সে আহার বিতরণ করে দিতেন। কিন্তু দরবেশ নিজে শুধু গাভীর দুধ পান করে দিন কাটাতেন। সেই গাভীটি তাঁর নিজের গাভী ছিল।

হযরত শাহ্ জালাল সকলকে যেমন ভালোবাসতেন, তেমনি আমাকেও যথেষ্ট ভালোবাসতেন। আমার প্রতি খুব সদয় ছিলেন। আমাকে তাঁর মেহমান খানায় নিয়ে তিন দিন পর্যন্ত খুব আদর আপ্যায়ন করলেন।

আমার সাথে সাক্ষাৎ লাভের পূর্বেই শায়খ তাঁর অনুচরদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, "আরব দেশ থেকে এখানে একজন পর্যটক আমার নিকট আসছেন। তাকে আগমনী শুভেচ্ছা জানাতে হবে। শায়খের নির্দেশ মত তাঁরা আমার নিকট হাজির হয়ে গেল। কিন্তু আমার আগমন সম্পর্কে শায়খ কিছুই জানতেন না। মহান আল্লাহ যাকে অলৌকিক ক্ষমতা দান করেছেন তার পক্ষে সবই সম্ভব হয় । আমি শায়খের নিকট হাজির হলাম। দেখলাম তাঁর গায়ে একটি জোব্বা। তাঁরসাথে কোলাকুলি করলাম। আমার দেশের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরপরনের জোব্বাটি দেখে মনে মনে ভাবলাম শায়খ যদি জোব্বাটি আমাকে দিতেন তবে কতই না ভাল হতো। কিন্তু আমার বিদায় বেলায় শায়খ গুহার এক কোণায় গিয়ে জোব্বাটি খুলে আমাকে পরিয়ে দিলেন। নিজের মাথার টুপিটিও তিনি আমাকে পরিয়ে দিলেন। তাঁর অনুচরদের থেকে জানতে সক্ষম হলাম যে,তিনি জোব্বা পড়তে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। কেবলমাত্র আমার আগমনের খবর শুনে তিনি এ জোব্বাটি পরেন।"

শাহ্জালাল বলেছিলেন, "মরক্কো অধিবাসী আমার নিকট জোব্বাটি চাইবে। অত:পর কাফির বাদশাহ্ তাঁর নিকট থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে,আমার ভাই বোরহানুদ্দীনকে দান করবে।"

অনুচরদের কাছ থেকে এ কথা শুনে ইবনে বতুতা দৃঢ় সংকল্প করে ফেললেন যে, শায়খ এর দেয়া উপহার জোব্বা ও টুপি তাঁর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ, কাজেই তিনি তা পরিধান করে কোন মুসলামান বা কাফির বাদশার সম্মুখে যাবেন না।

হযরত শাহ্ জালালের ভবিষ্যৎবানী সত্যে পরিণত হল। বছর দুই পরে চীন দেশ ভ্রমণ করতে গিয়ে তিনি তার প্রমাণ পেয়ে গেলেন। বাংলাদেশ থেকে তিনি জাভা, সুমাত্রা দ্বীপ পেরিয়ে চীনে গিয়ে পৌঁছেন।

ইবনে বতুতা লিখেছেন, "আমি চীনের খানসা" (হাং-চৌ-ফু) শহরে গেলাম । শহরে নেমে সংগী সাথীদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। প্রচন্ড ভীড়ে কিছুটা আলাদা হয়ে গেলাম। আমি জোব্বা পরিহিত ছিলাম। পথিমধ্যে দেখতে পেলাম জনৈক মন্ত্রী, তিনি আমাকে ডেকে হাত ধরে আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। অত:পর তাঁর দরবার মহলে আমাকে নিয়ে গেলেন। বার বার আমি বিদায় নেওয়ার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হলাম। তিনি কোন মতেই আমাকে বিদায় দিতে রাজি হলেন না। আমার নিকট বাদশাহ্দের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। কিছুক্ষণ পরেই আমার জোব্বাটির উপর তাঁর নজর পড়ে। জোব্বাটির বিভিন্ন প্রশংসা সুলভ বাক্য বলতে এক পর্যায়ে জোব্বাটি খুলে তাকে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। এমতাবস্থায় আমাকে জোব্বাটি খুলে মন্ত্রীকে দিতে হল। আমার হ্যাঁ বা না বলা কোন উপায় বা পরিস্থিতি ছিল না। আমি অনেকটাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে জোব্বাটি খুলে দিলাম। বাদশা জোব্বাটি নিয়ে নিলেন। বিনিময় হিসাবে আমাকে দিলেন দশ জোড়া পোশাক ও সাজ-সরঞ্জামসহ একটি অশ্ব ও নগদ কিছু টাকা। ভীষণ দু:খ হল আমার। মনে করতে লাগলাম শাহ্ জালালের কথা। অনেকটাই হতবাক, অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম আমি।

বছর খানেক পর চীনের রাজধানী খান বালিক পিকিং শহরে গেলাম। সেখানকার বিখ্যাত দরবেশ হযরত শায়খ বোরহান উদ্দীন শীর্ঘজের খানকায় যাওয়ার সুযোগ পেলাম। খানকায় উপস্থিত হয়ে দেখলাম, শায়খ সেই জোব্বাটি পরিধান অবস্থায় কিতাব পাঠ করছেন। অবাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে পরে জোব্বাটি নাড়াচাড়া করে দেখলাম। শায়খ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি জোব্বাটি চেন?" আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ চিনি, খানসার বাদশা এটি আমার থেকে নিয়েছিলেন।[৬৫]শায়খ বললেন, এ জোব্বাটি শায়খ জালাল উদ্দীন আমার জন্যই তৈরি করেছিলেন। আমাকে পত্র দিয়ে জানিয়ে ছিলেন, অমুক ব্যক্তির মারফত জোব্বাটি আমার কাছে পৌঁছবে। শায়খ আমাকে পত্রটি দেখালেন। পত্রটি পড়ে এবং

[৬৫]ইবনে বতুতা, "আজায়েবুল আসফার", "উর্দূ অনুবাদ", ২য় খন্ড পৃ. ৩৮৩।

শায়খের সত্য ভবিষ্যৎ বাণীর জন্য বিস্মিত হলাম। পরে শায়খ বোরহান উদ্দীনের নিকট আমার ইতিপূর্বে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনার বর্ণনা করলাম।

শেখ বোরহান উদ্দীন মন্তব্য করলেন, "আমার ভাই শেখ জালাল উদ্দীনের মর্যাদা এর চাইতে ও অনেক বেশি। এক আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী। এর চাইতেও অধিক অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন তিনি।"[৬৬]

ইবনে বতুতার এই বর্ণনা ঐতিহাসিক সত্য। একে উপেক্ষা করা যায় না। শায়খ জালাল উদ্দীন কিরূপ আধ্যাত্মিক সাধনায় উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন, তা আর বলার বা বুঝার অপেক্ষা রাখে না । তিনি শায়খ বোরহান উদ্দীনের কাছ থেকে, শায়খ জালাল উ্দ্দীনের ওফাতের সংবাদ শুনতে পেলেন। ইবনে বতুতা তার "সফর" নামায় সেগুলো উল্লেখ করেছেন। ইসলাম প্রচার ও প্রসারে তার ভূমিকা ছিল বর্ণনাতীত। শায়খ তার আধ্যাত্মিক সাধনার সকল শক্তিকে ইসলাম প্রচারের কাজে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি খানকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেখানে বসে তিনি ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজ করতেন। বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম প্রচার কাজ করতেন। অন্যদিকে তিনি তার খানকাটিকে গরীব-দু:খী অসহায়দের জন্য সাহায্য-সংস্থা রূপে গড়ে তুলেছিলেন। তার সহচরগণ বাংলাও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং ইসলাম প্রচার কার্যে নিজেদের নিয়োজিত করেন।

উত্তর বঙ্গে ইসলাম প্রচারে হযরত জালাল উদ্দীন তাবরিজী, আসামে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে হযরত শাহ্জালাল (র.) ভূমিকা তার অনুরূপ।

নিরীহ সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাঁর ও তাঁর সহচরদের ভূমিকা ব্যাপক শক্তিশালী ও সুদূর প্রসারী।

হযরত শাহ্জালাল এর মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১৫০ বছর। ইবনে বতুতা ১৩৪৬ সালে বাংলা ত্যাগ করেন। ৪০ দিন পর আরাকানহয়ে জাভা,সুমাত্রায় পৌঁছেন। সেখান থেকে শ্যাম ও কম্বোডিয়ায় পৌঁছেন, পরে চিনের উদ্দেশ্যে রওনা করেন। প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে বেশ কিছু উপকূলীয় অঞ্চল ভ্রমণ করে পরে চীনের কুন-চুন-ফু শহরে প্রবেশ করেন। সেখানে ১৫দিন অবস্থানের পর সফর শেষে খানসা শহরে উপস্থিত হন। পরবর্তীতে

---

[৬৬]ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, "ইসলাম প্রসঙ্গ", নতুন সংস্করণ ১৯৭০, পৃ.১৫০-১৫২

তিনি পিকিং শহরে পৌঁছেন এবং বোরহান উদ্দীনের কাছ থেকে শাহ্ জালালের মৃত্যুর সংবাদ পান। এভাবে বছরে খানেক সময় লেগে যায় তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনতে। কাজেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে, ইবনে বতুতা ১৩৪৬ সালে বাংলা ত্যাগ করেন এবং ১৩৪৭ সালে হযরত শাহ জালাল (র) ইন্তিকাল করেন। অপর আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায়, তাঁর মাযার সংলগ্ন সমাধি ফলক থেকে।

প্রথমটি সুলতান মুবারক শাহ্র পুত্র শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ্র সময়ে ১৪৭৪-১৪৮১ খৃস্টাব্দে, দ্বিতীয়টি ১৫০৫ খৃস্টাব্দে হুসেন শাহ্র রাজত্ব কালে ১৪৯৩-১৫১৯ খৃস্টাব্দে, তৃতীয়টি প্রস্তর লিপি থেকে ১৩০৩ খৃস্টাব্দে ফিরোজ শাহ্র রাজত্বকালে সিকান্দার খান গাজী সিলেট জয় করেন তার আদেশে।

সুতরাং একথা সহজেই বুঝা যায় যে, প্রস্তর খন্ডে ফিরোজ শাহ্ গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ্ ১৩০২-১৩২২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। দিল্লীর সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবনের দৌহিত্র ছিলেন।

এই সূত্রে নিজের নামের সাথে দেহলভী সংযুক্ত আছে। সুতরাং পাথর খন্ডে"সুহল-ই-ইয়ামেন" এর সুলতান সিকান্দার শাহ্ ছাড়া আর কেউ নয়।

হযরত শাহ্ জালাল এর মৃত্যুর পূর্বে নির্দেশিত তাঁর উপাসনা গৃহের অতি নিকটে তাঁর পবিত্র রওজা মুবারক। সেখানেই তিনি চির নিদ্রায় শায়িত। তাঁর মৃত্যুর পর সর্বসাধারণের পরম শ্রদ্ধাও ভালোবাসায় একটি সৌধ নির্মাণ করা হয়। যা বর্তমানে হযরত "শাহ্জালাল (র.) এর দরগাহ"নামে পরিচিত।

এই দরগাহ শরীফে হযরতের ব্যবহৃত "জুলফিকার" নামক তরবারি, তাঁর কাঠের নির্মিত পাদুকা ও দুটি তামার পেয়ালা এখনও সংরক্ষিত আছে।

হযরত শাহ্ জালাল (র.) শ্রীহট্টে আড়াই হাত লম্বা ও দুই হাত প্রস্থ হুজরাতে বসে ৩০ বছর ইবাদত বন্দেগীতে নিমগ্ন ছিলেন এবং বাষট্টি বছর বয়সে ২০ যিলকদ চাঁদ জুমারাতে

ইন্তিকাল করেন। ডবিণ্টউ হান্টার বলেন, ১৩৪৮ খৃস্টাব্দে শাহ্ জালাল সিলেটে আসেন। ৫১০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকালকরে।[৬৭]

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের ইসলাম আগমন প্রচার ও প্রসারে তাঁর ভূমিকা কোন মাপ কাঠিতে পরিমাপ করা যাবে না। ইসলামের ইতিহাসে এই শায়খ হযরত শাহ্জালাল (র.) এর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বাংলাদেশের সকল শ্রেণী পেশার হাজার হাজার লোক প্রতিদিন তার মাযারজিয়ারত করতে যান। নানা দেশি-বিদেশি পর্যটকগণও তাঁর মাযার জিয়ারত করতে আসেন। সকলেই তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করে। তিনি চিরস্মরণীয় ও বরণীয়।

শাহ্ কামাল (র.)

হযরত শাহ্জালাল (র.) এর সহচর ছিলেন শাহ্ কামাল। ময়মনসিংহ জেলার গারো পাহাড়ের নিকটবর্তী ব্রহ্মপুত্রের তীরে তাঁর মাযার অবস্থিত। তিনি হযরত শাহ্জালাল (র.) এর সহচর হিসেবে বাংলাদেশে আগমন করে এবং শাহ্জালাল (র.) এর নির্দেশে ইসলাম প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। একই নামে কুমিল্লার উতখড়া গ্রামে একজন সূফীর মাযার লক্ষ্য করা যায়। এক ব্যক্তির দু' মাযার হওয়া সম্ভব পর নয়। ফলে, ধারণা করা হয়, একই নামে হযরত শাহ্ জালালের দু'জন শিষ্য ছিলেন। তাঁদের দু'জনের মাযার দু'স্থানে অবস্থিত।

অধ্যক্ষ শায়খ শরফুদ্দীন, "সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইয়ামেন দেশীয় শাহ্ কামালুদ্দীন ১৩৮৫ খৃস্টাব্দে নিজের স্ত্রী ও নয়জন শিষ্যসহ, তাঁর পিতা শাহ্ বোরহান উদ্দীনের খুঁজে সিলেটে আসেন। শাহ্ বোরহান উদ্দীন ছিলেন, হযরত শাহ্ জালালের একজন প্রধান শিষ্য। শাহ্ কামাল সিলেটে এসে, হযরত শাহ্ জালাল (র.) এর মুরিদ হন। পীরের আদেশে শাহ্ কামাল কয়েকজন শিষ্যসহ সুনামগঞ্জের "শাহ্ারপাড়া" নামক স্থানে গিয়ে আস্তানা স্থাপন করেন এবং তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার

[৬৭]ড. মুহাম্মদ এনামূল হক, " পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম", ঢাকা ১৯৪৮, পৃ.৬১-৬২।

করেন।[৬৮] ড.এনামূল হক বলেন, সিলেটের হযরত শাহজালালের দুই শিষ্য ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কুমিল্লা থেকে সাত আট মাইল দূরবর্তী "উটখারা" নামক গ্রামে ইসলাম প্রচার করেছিলেন।

সাইয়েদ আহমদ কল্লা শহীদ

হযরত শাহ্ জালাল (র.) এর অন্যতম শিষ্য ছিলেন সাইয়েদ আহমদ কল্লা শহীদ। শাহ্ জালাল সিলেট জয় করার পর তাঁর শিষ্য বা ভক্তদের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার কার্যের নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। বিশেষ করে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন এলাকায়। নোয়াখালী ও কুমিল্লা উভয় জেলায় ইসলাম প্রচারে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তিনি হলেন সাইয়েদ আহমদ কল্লা শহীদ। তরফপুর পরগণায়ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হয়, সাইয়েদ নাসিরুদ্দীনের নেতৃত্বে এগারজন শিষ্যের উপর। এ দলে ছিলেন সাইয়েদ আহমদ। তাঁর মাথার চুল ছিল লম্বা। এজন্য তাকে "গেছু দারাজ" বলা হতো।

অমুসলিমদের কাছ থেকে বহু বাঁধার সম্মুখীন হয়েও ইসলাম প্রচার কার্য থেকে এতটুকু পিছ পা হননি। বরং এক পর্যায়ে তিনি বিরুদ্ধবাদীদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। তরফে হিন্দু রাজা আচক নারায়নের সাথে এ যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। যুদ্ধে মুসলমান পক্ষে সাইয়েদ নাসিরুদ্দীন নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধে মুসলিম শক্তির জয় হলেও সাইয়েদ আহমদ "শহীদ" হন। তাঁরএক ভক্ত তাঁর মস্তকটির সন্ধান পান এবং ১৫/১৬ মাইল দূরে গিয়ে খড়মপুরে এনে তা সমাধিস্থ করেন।[৬৯] কেউ কেউ বলেন খড়মপুরের জেলে সম্প্রদায় নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে তার মস্তকটি পান। পরে তারা নদীর তীরে সমাহিত করেন। তিনি কল্লা শহীদ নামেই সমাধিক প্রসিদ্ধ লাভ করেন। জানা যায়, খড়মপুর গ্রামের তিনি ইসলাম প্রচার করেছিলেন। খড়মপুর গ্রামটি কুমিল্লা জেলায়। তা আখাউড়া রেল স্টেশনের খুব নিকটে। নোয়াখালী জেলার শর্সদিয়াস্টেশনের কাছে এ দরবেশের আস্তানা রয়েছে । যুদ্ধে শাহ্াদাত বরণ করার

[৬৮] "পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম" ঢাকা, ১৯৪৮, পৃ. ৬৩

[৬৯] কেউ কেউ বলেন খড়মপুরের জেলে সম্প্রদায় নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে তার মস্তকটি পান। পরে তারা তাকে নদীর তীরে সমাহিত করেন। তিনি কল্লাশহীদ নামেই সমাধিক প্রসিদ্ধ লাভ করেন।

পর কেবল মাত্র তার মস্তকটি সমাধিস্থ করা হয় বলে তাকে "কল্লা শহীদ" বলা হয়। খড়মপুর গ্রামে হযরত সাইয়েদ আহমদ কল্লা শহীদের মাযারঅবস্থিত।

সাইয়েদ রিয়া বিয়াবানী

ইসলামের অমিয় বাণীকে সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অসংখ্য সূফীদরবেশ ও পীরদের আগমন ঘটে। সাইয়েদ রিয়া বিয়াবানী ছিলেন ইসলামের এক শক্তিশালী সাধক দরবেশ ও ইসলাম প্রচারক। গৌড় ও পান্ডুয়ায় আগমন কারী সূফী-সাধকদের মধ্যে ৩ জনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা হলেন, আখি **সিরা**জ উদ্দীন, আখি (র.) এর ছাত্র আলাউল হক, শেখ রাজা বিয়াবানী। তৎকালীন গৌড়ের সুলতান ছিলেন শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ (১৩৪২-১৩৫৮খৃস্টাব্দ)। তিনি বুজুর্গ ব্যক্তিদের খুবই সম্মান করতেন। তারই ধারাবাহিকতায় আলাউল হক ও শেখ রাজা বিয়াবানীর সাথে তার ছিল গভীর সম্পর্ক।[৭০]

১৩৫৩ খৃস্টাব্দে গৌড় আক্রমণ করলে তিনি, ফিরোজ শাহ্‌ীর (১৩৫১-১৩৮৮) সৈন্য দ্বারা এক ডালা দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন এবং তাঁর মৃত্যু হয়। সুলতান ইলিয়াস শাহ্ পরম শ্রদ্ধা করতেন শাহ্ রাজা বিয়াবানীকে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য তিনি ফকিরের ছদ্মবেশে দুর্গ থেকে বের হয়ে তাঁর জানাযা ও দাফনে অংশগ্রহণ করেন এবং পরে দুর্গে ফিরে আসেন। চতুর্দশ শতকে (১৩৪২-১৩৫৭ খৃস্টাব্দে) শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের আমলে বিয়াবানী ইন্তিকাল করেন।[৭১]

শরীফ শাহ্

সুন্দরবন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ছিলেন তিনি হলেন শরীফ শাহ্। তাঁর আগমনের সময় কাল সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয় সৈয়দ আব্বাস আলী মক্কীর পর পরই তিনি আগমন করেন। তাঁর সময়ে ইসলাম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। বিভিন্ন সময়ে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারকদের আগমন ঘটেছিল। কিন্তু প্রচলিত

[৭০] সুখময় মুখোপাধ্যায়, "বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর" কোলকাতা, ২য় সংস্করণ। ১৯৬৬ পৃ.৪৫

[৭১] রমেশচন্দ্র মজুমদার, "বাংলাদেশের ইতিহাস", ২য় খন্ড, কোলকাতা ৩য় সংস্করণ। ১৩৮৫ পৃ.৩৬

কিংবদন্তী থেকে তাঁদের প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বিকৃত ধর্ম বিশ্বাস, ইসলাম প্রচারক ও মুজাহিদের চেহারা ও বিকৃত করে দিয়েছিল বলে জানা যায়। ইসলাম প্রচারের এ শ্রেষ্ঠ মুজাহিদের আস্তানাও মাযার গুলিকে শরীয়ত বিরোধী কার্য কলাপের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেছে। পশ্চিম বাংলার ঘুটিয়ার শরীফ এ তালিকার শীর্ষ স্থান লাভ করেছে। কলকাতার দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত ক্যানিং শহরের নিকটবর্তী ঘুটিয়ার শরীফে শরীফ শাহ্ দরবেশের মাযারঅবস্থিত। প্রতি বছর পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত লোকজন উরস অনুষ্ঠান পালন করেন। শরীফ শাহ্ ইসলাম প্রচার ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করে।

বছর পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত লোকজন উরস অনুষ্ঠান পালন করেন। শরীফ শাহ্ ইসলাম প্রচার ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করে।

বড়খান গাজী

উলুগ-ই- আযম জাফর খাঁ[৭২] গাজীর সুযোগ্য পুত্র হলেন বড় খান গাজী। যশোর, চব্বিশ পরগণা ও খুলনা অঞ্চলে মুসিলম মুজাহিদ সম্পর্কে কিংবদন্তী মূলক বহুকাহিনী ছড়িয়ে আছে। বাংলা সাহিত্যের বিরাট অধ্যায় জুড়ে ও রয়েছে তার কাহিনী। হিন্দু রাজাদের সাথে যুদ্ধ, কৃষ্ণরাম দাসের "রাম মঙ্গল" কাব্য ও "গাজী-কালুর[৭৩]-চম্পাবতী" কাব্যে যশোর রাজ-মুকুট রায় ও দক্ষিণ দেশের রাজাদক্ষিণা রায়ের সাথে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে গাজী জয় লাভ করেন। ত্রিবেনীতে জাফর খাঁ গাজীর মাযারের পাশেতাঁরমাযার অবস্থিত। উলুগ-ই-আযম জাফর খাঁ গাজীর ত্রিবেনী বিজয়ের পর দক্ষিণ দেশের প্রতিরোধ দুর্গ ভেঙ্গে গেলে, বড় খান গাজী সুযোগে দক্ষিণ বিজয় অভিযান পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে বড় খান গাজী দক্ষিণ দিকের জেলা সমূহে ইসলাম প্রচার কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ইসলাম প্রচার ও প্রসারে তার ভূমিকা বর্ণনাতীত।

[৭২]উলুগ-ই-আযম জাফর খাঁ গাজীর উপাধি। তিনি একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন।

[৭৩]গাজী কালু-চম্পবতী হলো পুঁথি সাহিত্য। রাতে জনগন কোন একস্থানে একত্রিত হতো এবং গাজী কালু-চম্পবতীর পুঁথি পাঠ করা হতো জনগণ মনোযোগসহ পুঁথি শুনে মুগ্ধ হতো।

হযরত মাওলানা আতা

ইসলামের বিখ্যাত সূফী মাওলানা আতা। তিনি বিশেষজ্ঞ আলিম ছিলেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন আপোসহীন যোদ্ধা। মাওলানা আতা দিনাজপুর জেলার দেবীকোটে ইসলাম প্রচার করেন। সম্ভবত ১৩০০ -১৩৫০ সালের দিকে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন।

দিনাজপুর জেলার দেবীকোটে তাঁরমাযার অবস্থিত। গৌড়ের সুলতান সিকান্দার শাহ্ (১৩৫৮-১৩৮৮) তাঁর মাযারের পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তার দরগাহ ৪টি শিলালিপির তারিখ হচ্ছে ১৩৬৩, ১৪৮২, ১৪৯১ ও ১৫১২খৃস্টাব্দ। প্রথমটি সিকান্দার শাহ্ স্থাপন করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

শাহ্ মালেক ইয়ামনী

সিলেট বিজয়ের পর হযরত শাহ্ জালালের অসংখ্য শিষ্য বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় জেলায় ইসলাম প্রচারের জন্য ছড়িয়ে পড়েন। হযরত শাহ্ জালাল (র.) এর অন্যতম শিষ্য শাহ্ মালেক ইয়ামনী[৭৪]। তিনি ঢাকা জেলায় ইসলাম প্রচারের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। ঢাকার ইডেন বিল্ডিং এর দক্ষিণ পূর্ব কোণে হযরত শাহ্ মালেক ইয়ামনীরমাযার অবস্থিত। তাঁর মাযারের পাশে ভক্ত শাহ্ বলখীর মাযারও রয়েছে। ইসলাম প্রচার কার্যে তিনি শাহ্ মালেক কে ব্যাপক সহায়তা দান করেছিলেন।

শায়খ আখি সিরাজ উদ্দীন

দিল্লীর হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার (১২৩৬-১৩২৫ খৃস্টাব্দে) অন্যতম শিষ্য ছিলেন শায়খ আখি **সিরা**জ উদ্দীন[৭৫]। তিনি জ্ঞান, বুদ্ধি, পারদর্শীতা, আধ্যাত্মিকতায় ছিলেন এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর এ সকল গুনে মুগ্ধ হয়ে হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া তাকে "আইয়ানে হিন্দ

[৭৪]শাহ মালেক হযরত শাহজালালের সঙ্গী সাথীদের একজন, তিনি ইয়ামনের অধিবাসী ছিলেন বলে তাকে ইয়ামনী বলা হয়।

[৭৫]আখি সিরাজউদ্দীন জাহিরীও বাতিনী জ্ঞানে ধন্য ছিলেন। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা ছিলনা যেখানে তার পদচারনা ছিলনা।

বা হিন্দুস্থানের মুকুট" উপাধি দিয়েছেন। চতুর্দশ শতকে তিনি বাংলায় আগমন করেন বলে ধারণা করা হয়। বাল্যকাল থেকেই তিনি নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরবারে থেকে, সেখানে ওস্তাদ মাওলানা ফখরুদ্দীন জাররদীর নিকট শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন। খুব অল্প সময়েই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করেন। ওস্তাদ রুকনুদ্দীনের কাছেও বেশ কিছু দিন শিক্ষা লাভ করেন। তাছাড়া তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলিমও পন্ডিতদের কাছ থেকে জ্ঞান চর্চা করে, খুব অল্প সময়ে-ই হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ আলিমে পরিণত হন।

"সিয়ারুল আরেফীন" গ্রন্থে তাঁর বিদ্যার্জনের নানা বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "তৎকালীন হিন্দুস্থানে তার সমকক্ষ কোনো আলিম ছিল না। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করার যোগ্যতাও কারোর ছিলনা।" ইসলামী জ্ঞান শিক্ষার শেষ পর্যায়ে হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া তাকে খিলাফত দান করেন এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দান করেন। নিজাম উদ্দীন আউলিয়া জীবিত থাকা কালে তিনিদিল্লী ত্যাগ করেননি। তবে, মায়ের অসুস্থতার খবর শুনে গৌড়ে আগমন করলেও কিছুদিন পর আবার তিনি দিল্লী ফিরে যায়। ১৩২৫ খৃস্টাব্দে নিজাম উদ্দীনের মৃত্যুর পর তিনি স্থায়ী ভাবেদিল্লী ত্যাগ করে গৌড়ে চলে আসেন।

পরবর্তীতে গরীব ও অসহায় মানুষের জন্য খানকাহ্ ও লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মূলত গৌড়ও পান্ডুয়ায় ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর জ্ঞানও পান্ডিত্য দেখে হিন্দু মুসলমান তার প্রতি ভীষণ আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং দলে দলে ইসলামের পতাকা তলে সমাসীন হতে থাকেন। তৎকালীন বাংলার সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ (১৩৪২-১৩৫৮) তার ভক্ত হয়ে যায়। সারা জীবন তিনি ইসলামের সেবক হয়ে কাজ করে গেছেন। মানবিকতার কোন অভাব ছিল না। ভিখারী, গরীব-দু:খী ও অভুক্তদের জন্য সর্বদা তার লঙ্গরখানায় খাবারের ব্যবস্থা থাকতো। শায়খ আখী**সিরা**জ উদ্দীন (র.) কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন তা নিয়ে বেশ মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মীর্জা মুহাম্মদ আখতার দেহলবীর মতে তিনি বাদায়ূনের অধিবাসী। (তাজকিয়ায়ে আউলিয়ায়ে হিন্দ) রফিক উল আরেফীনের মতে, শায়খ আখি **সিরা**জউদ্দীন অযোধ্যার অধিবাসী।

কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে, তিনি বাংলাদশের অধিবাসী। তবে সর্বজন গ্রাহ্য মত হল তিনি বাংলাদেশের অধিবাসী। মায়ের মৃত্যু ছাড়াও নিজাম উদ্দীন আউলিয়ার মৃত্যুর পর তিঁনি বাংলাদেশে আগমন করেন। ইসলাম প্রচারে তিনি অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁর অন্যতম শিষ্য আলাউল হক[৭৬] ও বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৩৫৭ খৃস্টাব্দে (৭৫৮হি.) গৌড়ে শায়খ আখী**সিরা**জউদ্দীন ইন্তিকাল করেন। গৌড়ের "সাগর দীঘি" নামক স্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

শাহ্মুহাম্মদবাগদাদী

শাহ্ মুহাম্মদ বাগদাদী ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী। এজন্য তার নামের সাথে "বাগদাদী" শব্দটি উল্লেখ আছে। তিনি শাহ্ আলী মৌজাটি সুলতান ফিরোজ শাহ্ তোগলকের কাছ থেকে নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে লাভ করে, সেখানেই আস্তানা স্থাপন করেন। তিনি এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং সফলকাম হয়েছিলেন। কুমিল্লার শাহ্তলীতেতাঁরমাযার অবস্থিত।

রাসতি শাহ্

হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) এর বংশধর বলে আমরা যাকে জানি, তিনি হলেন রাসতি শাহ্ (র.)[৭৭]। রাসতি শাহ্ ও শাহ্ মুহাম্মদ বাগদাদী সমসাময়িক ছিলেন। তিনি মূলত কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলায় ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৩৫১ -১৩৮৮ খৃস্টাব্দে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ্ তোগলকের শাসন আমলে, বাংলাদেশে আগমণ করেন। এছাড়া হযরত সাইয়েদ আহমদ তান্নুরীর সাথে নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুরে আগমনকরেন বলে জানা যায়। কুমিল্লা কালিবাড়ী স্টেশনের পূর্বে শ্রীপুর গ্রামে তাঁরমাযার মোবারক অবস্থিত।

---

[৭৬]বাংলা সাহিত্যে আলাউল (১৬০৭-৮০) এক সময় শাহজাদা সুজার সভা-কবি ছিলেন। তিনি ইরানের প্রখ্যাত কপি নিযামীর 'সিকান্দার নাম' ও 'হাফ্ত-এ-পায়কারা' এর বংগানুবাদ করেন।

[৭৭]রাসতি শাহ কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। কুমিল্লা জেলার একটি এলাকার নাম শাহ রাসতি। খুব সম্ভব উক্ত দরবেশের নামানুসারে উক্ত এলাকার নাম শাহ রাসতি রাখান হয়।

শায়খ বখতিয়ার মাইসূর

শায়খ বখতিয়ার**মাইসূর**(র.) সাইয়েদ আহমদ তান্নুরীর সাথে দিল্লী থেকে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করতে আসেন বলে জানা যায়। তিনি মূলত দ্বীপাঞ্চল অর্থাৎ বাংলার দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সন্ধীপে তাঁরমাযারমোবারক অবস্থিত।

মখদুম শাহ্ জালালুদ্দীন জাঁহা গাশ্ত বুখারী

মখদুম শাহ্ জালালুদ্দীন জাঁহা গাশ্ত বুখারী*[৭৮] রংপুর জেলায় ইসলাম প্রচার কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। উত্তর ভারতে ইসলাম প্রচার কার্য পরিচালনার জন্য নানা স্থানে পরিভ্রমণ করে পরে বাংলাদেশে আগমন করেন। বাংলার বিখ্যাত আলেম আলাউল হকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

১৩০৭ খৃস্টাব্দে ইসলামী জ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্র বুখারায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৩৮৩ খৃস্টাব্দে পাঞ্জাবের উছ নগরে তিনি ইন্তিকাল করেন। রংপুর জেলায় তাঁর আস্তানা রয়েছে।

হযরত শাহ্ লঙ্গর (র.)

সমাজের গরীব দু:খী অভাবী, অসহায় ও নওমুসলিমদের জন্য নিরবে কাজ করে যেতেন যিনি, তিনি হলেন শাহ্ লঙ্গর (র.)। তাঁর প্রকৃত নাম জানা আজো সম্ভব হয়নি। সমাজের নির্যাতিত-নিপীড়িত, মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য কাজ করা, খানা-পিনার ব্যবস্থা করেছিলেন বলেই তিনি "শাহ্ লঙ্গর" নামেই প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন। "লঙ্গর" শব্দটি মূলত কোন নাম হতে পারে না। এটি লঙ্গরখানার শব্দের অংশ বিশেষ। এ লঙ্গর খানাই তার ইসলাম প্রচারের ব্যাপকতা প্রমাণ করে। বিশালতার সাক্ষ্য বহন করে। ধারণা করা হয় শাহ্ লঙ্গর চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে বা তারও পূর্বেইসলাম প্রচারক ছিলেন। ঢাকা জেলার রূপগঞ্জ থানার মুয়াজ্জাম পুর গ্রামে শাহ্ লঙ্গরেরমাযারঅবস্থিত। ১৪৩১-১৪৪২ খৃস্টাব্দে গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন আহমদ শাহ্ তাঁর মাযারসংলগ্ন একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।[৭৯]

[৭৮]এর কুনরো নামক স্থানে জন্ম বলে তাকে জালানুদ্দীন বুখারী বলা হয়।

[৭৯]East Bengal District Gaze tteers, Dhaka, 1912, P-65

শাহ্ লঙ্গর বাগদাদের কোন শাহ্জাদা বলেও পাকিস্তানের সূফীসাধক বলে উল্লেখ করেছেন। ঢাকা জেলায় ইসলাম প্রচারে তার ভূমিকা অনবদ্ধ।

সাইয়েদুল আরেফীন

খৃস্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে তৈমুর লং (১৩৬১-১৪০৫) এর নির্দেশে সাইয়েদুল আরেফীন বাংলায় আগমন করে। তিনি মূলত মধ্য এশিয়া থেকে এদেশে এসেছিলেন। সাইয়েদুল আরেফীন পটুয়াখালী ও বরিশাল এলাকায় ইসলাম প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। প্রথমে তিনি সমগ্র এলাকা ঘুরে দেখলেন এমন কোন অঞ্চল আছে কি-না? যেখানে ইসলামের অমীয় বাণী পৌঁছেনি। তিনি দেখলেন বাংলার প্রতিটি আনাচে-কানাচে ইসলামের আলো পৌঁছে গেছে। কিন্তু অসংখ্য নদী নালা ঘেরা বাকেরগঞ্জ জেলার বহুস্থান পরিভ্রমণ করে দেখে, যেখানে কোন মুসলিম মানুষের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। এমনস্থান গুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল কালিশুড়ি। সেখানেই তিনি আস্তানা স্থাপন করলেন। পরবর্তীতে সে এলাকার অসংখ্য অমুসলিদের কে তিনি ইসলামের পাতাকা তলেসমাসীন করতে পেরেছিলেন। তিনি এ অঞ্চলেই ইন্তিকাল করেন। বর্তমান পটুয়াখালী জেলারঅন্তর্গত বাউফল থানার কালিশুড়ি গ্রামে হযরত সায়েদুল আরেফীনেরমাযারঅবস্থিত। তিনি সর্ব প্রথম বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

শায়খ আলাউদ্দীন আলাউল হক

হযরত শায়খ আলাউদ্দীন আলাউল হক ইসলামের বিখ্যাত সেবক, ইসলাম প্রচারক। পিতার নাম শেখ ওমর বিন আসাদ। মুসলিম সমাজের ভিত্তি কে মজবুত করার লক্ষ্যে তিনি ওতাঁর পরিবার অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। কখনো বা ইসলাম ধর্মের ভিত্তি কে সুদৃঢ় করনোর লক্ষ্যে পরিবারের কিছু সদস্য কে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। তবুও তিনি থেমে যাননি। ইসলাম প্রচারের সর্বক্ষেত্রে তিনি অসীম ধৈর্য, ত্যাগ ও সাহসীকতার পরিচয় দিয়েছেন। যুগের পর যুগ তাঁর এই কর্মের ধারা চলছে, যা আজো কালের সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

সম্ভবত ১৩০১ খৃস্টাব্দে আলাউল হকের পিতা ওমর ইবনে আসাদ খালিদী লাহোর থেকে বাংলায় আগমন করেন। তিনি খালেদ ইবনে অলীদ (রা:) বংশধর। শায়খ আলাউল হক বাংলাদেশের সূফী ছিলেন কি-না তা স্পষ্ট করে বলা যায় না। তবে তাঁরবংশের অন্যান্য সূফীদেরকে ফার্সী ভাষায় লিখিত "আউলিয়া জীবনী" সম্পর্কিত গ্রন্থে বাঙ্গালী হিসেবে দেখানো হয়েছে। তবে আলাউল হকের বাল্যকাল বাংলাদেশে কেটেছে বলে বহু প্রমাণ মেলে।

শেখ আলাউল হক ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। জ্ঞান, বুদ্ধি, অসাধারণ পান্ডিত্য ও তাঁরচরিত্র মাধুর্যের জন্য তিনি "গঞ্জে নওবাত" বা **(মিষ্টান্ন ভান্ডার)** উপাধি লাভে করেছিলেন। গরীব, নিঃস্ব, অসহায় শিক্ষার্থীদের ভরণ পোষণের জন্য মুক্ত হস্তে দান করতেন। শুধু তাই নয়, দরিদ্র ছাত্র ও মুসাফিরদের জন্য পান্ডুয়ায় একটি খানকা ও লঙ্গরখানা নির্মাণ করেছিলেন। এই লঙ্গর খানায় তিনি প্রচুর অর্থ খরচ করতেন। তাঁর এ বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করতেন বলে সুলতান সিকান্দার**শাহ্** (১৩৫৮-১৩৮৯ খৃ:) অনেকেটাই ভীত হয়ে পড়ে। এবং তাঁকে সোঁনারগা চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। আলাউল হক রাজধানী পান্ডুয়া থেকে সোনারগাঁ গমন করেন।[৮০]

সোনারগাঁ নির্বাসিত হওয়ার পর পুনরায় তিনি খানকা ও লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রচারের ধারাকে অব্যাহত রাখেন। দুই বছর পর পুনরায় তিনি পান্ডুয়ায় ফিরে আসেন। তবে সে সময় সুলতান সিকান্দার শাহ ইন্তিকাল করেন।

ধনাঢ্য পরিবেশে আলাউল হকের জীবন শুরু হয়। বংশ, আভিজাত্য, পান্ডিত্য, বিদ্যা লাভের পারদর্শিতা এসব গুণের সমন্ধয়ে আলাউল হক খুব অল্প সময়ে খ্যাতির শীর্ষ স্থানে পৌঁচেছেন। এর কিছু কাল পর ১৩২৫ খৃস্টাব্দে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মৃত্যু পর তাঁর অন্যতম শিষ্য শায়খ আখী সিরাজ পান্ডুয়া আগমন করেন। শায়খ আখী সিরাজ উদ্দীনের অসাধারণ পান্ডিত্য,আধ্যাত্মিক শক্তি, চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে আলাউল হক তার কাছে ছাত্রত্ব

[৮০]বুকাননের বিবরনীতে, 'আখবার অল্-আখয়ার' -এ এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। এতে লেখা আছেঃ
The most celebrated person in the reign of Sekundur, was a holy man named Mukdum Alalhuk, whose son, Azem khan was Commander of the troops. The saint having taken disguest at some part of the kings conduct retired to sonargaon, near Dhaka. The good man was however, soon after induced to retire.
(সুখময় মুখোপাধ্যয়, "বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর", ২য় সং, ১৯৬৬, পৃঃ ৫৭)

বরণ করলেন। তাঁর বংশ,আভিজাত্য ত্যাগ করে তিনি ত্যাগের মহিমায় নিজেকে সোপর্দ করলেন। খুব অল্প সময়ে তিনিও আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধ হন।

পরবর্তী কালে তাঁর উস্তাদ ইসলামের যে আলোক বর্তিকা প্রজ্জল করেছিলেন সেটাকে সমুন্নোত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতি অল্প সময়ে তিনি পান্ডুয়াকে ইসলামী জ্ঞান সাধনার কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। বংশ-বিত্ত, আভিজাত্যের কোন মোহতাঁকে আটকাতে পারেনি। বাংলার বাইরেও তাঁর সু-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হয়ে মধ্য এশিয়ার জ্ঞান-পিপাসু সাইয়েদ আশরাফ জাঁহাগীর সিম্নানী ও নাসিরুদ্দীনমানিকপুরী তাঁর খিদমত করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

ইসলামের শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ সাইয়েদ নূর কুত্বুল আলম তাঁর পুত্র, যিনি তার পিতার নিকট আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ১৩৯৮ খৃস্টাব্দে মতান্তরে ৭৮৬ হিজরী (১৩৮৪ খৃস্টাব্দ) শায়খ আলাউল হক ইন্তিকাল করেন। পান্ডুয়ার ছোট দরগাহে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।[৮১]

হযরতশাহ্ নূর কুত্বুল আলম (র.)

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসার কল্পে যুগে যুগে অসংখ্যা পীর-দরবেশদের আগমন ঘটেছিল। কিন্তু তাঁর নানা বাঁধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রচারের ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতকের শেষ অবধি যারা বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেছিলেন তাদের পথ পূর্বে বর্ণিত সূফী সাধকদের চেয়ে অনেকটাই সু-গম ছিল। তাঁদের মধ্যে **শাহ্**নূর আলম কুত্বুল আলম ছিলেন অন্যতম এক সূফী। যিনি আলাউল হকের সুযোগ্য পুত্র। তাঁর প্রকৃত নাম হযরত নূর উদ্দীন নুরুল হক।[৮২] আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধ হয়ে উপাধি লাভ করেন নূর কুত্বুল আলম (র.)। অর্থাৎ "জগতের ধ্রবতারা"। সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেও তিনি খুব সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। পিতা হযরত আলাউদ্দীন আলাউল হকের নিকট তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধনায় কামালিয়াত লাভ করে। ধনাঢ্য

[৮১] M. Abid Ali khan, "Memoris, of Gour and Pandua", Calcata," 1942 গ্রন্থে, এই দরবেশের মৃত্যুর তারিখ ৭৮৬ হিজরী অর্থাৎ ১৩৪৮ খৃস্টাব্দ, পৃ. ১০৯।

[৮২] নূরুল হক হলেও তিনি নূর কুতবুল আলম নামেই বিশেষভাবে পরিচিত।

পরিবেশে বড় হয়ে এরকম সরল জীবন যাপন করাটা সত্যিই বিস্ময়কর। মহান আল্লাহ পাক যার কল্যান, চান তাকেই এমনি রহমত দান করেন। পিতার নিকট কামালিয়াত ভাল ও কৃচ্ছ সাধনার যে শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন তা সত্যিই জগতে নজিরবিহীন।

শাহ্নূর কুত্বুল আলম এর জন্ম স্থান নিয়েও বেশ মতভেদ লক্ষ্য করা যায়।"আইন-ই আকবরীর" বর্ণনায় তিনি লাহোরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সূফী শায়খ আলাউল হকের পুত্রের জন্মের পূর্বে বা পরে বাংলার বাইরে বসবাস করার কোন প্রমাণ মেলেনি। এ থেকে ধারণা করা হয় ১৩৫০ খৃস্টাব্দে তিনি পান্ডুয়ায়[৮৩] জন্মগ্রহণ করেন। কেননাতাঁর প্রথম শিক্ষক ছিলেন কাজী হামিদুদ্দীন কুঞ্জনশীন নাগোরী (১২৫৬-১৩৬০)। যিনি যোধপুরে বসবাস করতেন। সুতরাং এটাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি পান্ডুয়ায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পান্ডুয়ার মুকুট মনি। ভোগ বিলাসিতার প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। সর্বদা ফকীর, ভিখারী, মুসাফির, অসহায়, দরিদ্র মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। যথেষ্ট কায়িক পরিশ্রম ও করতেন তিনি। সামান্য ভিখারী, মুসাফিরদের জামা কাপড় নিজ হাতে ধৌত করতেন। তাদের কল্যাণের জন্য খানকাহ ও লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠাকরেছিলেন। লঙ্গরখানায় কাঠ দিয়ে রান্না করা হতো বলে, তিনি নিজে বন থেকে কাঠ কেটে নিয়ে আসতেন। তাতেও কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ করতেন না। সর্বদা আল্লাহ তায়ালার ধ্যানে মশগুল থাকতেন।

তিনি তাসাউফ সাধনার এক মহান সাধক। ড. এম এ রহিমের বর্ণনা তাই বলা হয়:

"The Khanqa of the vastly learned sufi Shaikh Ala-al-Haq and his distinguished son shaikh Nur Qutb Alam was renowned Seat of Iearning as well as spiritul knowledge.,"[84]

বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ পুরুষ হযরত **শাহ্** নূর কুত্বুল আলম। তাঁরসু-খ্যাতি শুধু বাংলাদেশ নয় সুদূর ভারতে ও ব্যাপক প্রসারতা লাভ করেছিল। তিনি ছিলেন

[৮৩]পান্ডুয়া রাজশাহী জেলার চাঁপাইনবাবনঞ্জ শহরের উত্তরপশ্চিমের এবং মালদহ জেলা শহর থেকে দুমাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

[৮৪]Dr. M.A Rahim, "Social and Cultural History of Bengal", Vol-II, Karachi, 1967, P. 289

বিখ্যাত মুসলিম নেতা। বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংকট কালীন সময়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সেগুলোর মোকাবেলা করতেও তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। ইসলাম প্রচারের পথে সকল প্রকার বাঁধাবিপত্তিকে প্রতিহত করে, ইসলাম প্রচারের পথকে সুগম করেছিলেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম **শাহ্** (রাজত্ব **১৩৯৮-১৪১০**খৃস্টাব্দ) ছিলতাঁর সহপাঠি। তাঁদের শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত সূফী হযরত হামিদুদ্দীন নাগোরী (র.)। পঞ্চদশ শতকে ইসলামের প্রচার ও উন্নতি কল্পে তাঁর ভূমিকা ছিল অসামান্য। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও নির্লোভ জীবন যাপনতাঁকেতাসাউফ সাধনার চূড়ান্ত সফলতায় পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। নূর কুত্বুল আলম ও সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম **শাহ্** এর মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সুলতান প্রায় সময়ই এই দরবেশ বন্ধুর কাছে থেকে নানা ব্যাপারে পরামর্শ নিতেন। দরবেশের দেয়া উপদেশ ও গ্রহণ করতেন। সংগ্রহ গ্রন্থ "রফিকুল আরিফিন" থেকে জানা যায় যে, "সুলতান গিয়াস উদ্দীন হযরত নূর কুত্বুল আলমকে প্রশ্ন করলেন, হাদিসের বর্ণনায় বলা হয়েছে আচার পালন কারী ও আচার বর্জনকারী দু'দলই আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত হতে পারে, এই উক্তিটির অর্থ কী?" উত্তরে দরবেশ বললেন, "প্রথমটি রাজা ও তার পারিষদবর্গদের জন্য প্রযোজ্য, অর্থাৎ তারা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করে আচার নিষ্ঠ হলে, তারা আল্লাহ পাকের অভিশাপ লাভ করবে। আর দ্বিতীয়টি হল সূফী সাধকদের জন্য প্রযোজ্য, যার অর্থ তাঁরা আচার বা অনুশাসন বর্জন করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা লানত পারে। স্রষ্টার সৃষ্টিকে সেবা করা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। রাজা ও তার পারিষদের একান্ত কর্তব্য, তা বাদ দিয়ে অন্য কাজের অজুহাত দিয়ে সেই কর্তব্যে বাধা পড়লে তবে তা অত্যন্ত বিপদজনক হয়ে উঠবে।"[৮৫]

"রফিকুল আরেফিন" গ্রন্থের অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, "একদা সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম **শাহ্**কুত্বুল আলমকে কিছু খাবার পাঠালেন, কুত্বুল আলম তা অত্যন্ত সম্মানের সাথে গ্রহণ করলেন।"কিন্তু পরদিন পীর কুত্বুল (র.) আলাকে "মসাবিহ" আনতে বললে, আমি অনেকটাই বিব্রতবোধ করছিলাম। মনে হচ্ছিল আমিতাঁর অসন্তোষ সৃষ্টি করেছি। কুত্বুল আলম (র.) সে বই থেকে পড়ে শুনালেন, রাসূল (সা.)বলেছেন,"যে তাঁর

[৮৫]সুখময় মুখোপাধ্যায়, "বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর" ২য় সংস্করণ ১৯৬৬, পৃ. ৬৭

নেতাকে সম্মান করে, সে তাকেই সম্মান করে।" তার পর তিনি বললেন,আমরা রাজা ও রাজ পুরুষদের সম্মান করি, যাতে আমাদের সন্তানেরা আমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণকরে চলে এবং যার যার প্রাপ্য সম্মান তাকে প্রদর্শন করে।[৮৬]

শাহ্নূর কুত্বুল আলম[৮৭] এর পান্ডিত্য ও আধ্যাত্মিকতার সুনাম যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, তখন তাঁর বন্ধু সুলতান গিয়াস উদ্দীন ইন্তিকাল করেন। ঠিক তখনই কিছু সংখ্যক হিন্দু রাজাও তার পারিষদবর্গ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সুলতান ইলিয়াস শাহীর আমলেই বেশ কিছু বড় বড় পদে হিন্দু সভাসদগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। যাদের অত্যাচারের হাত থেকে সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ রক্ষা পায়নি। তৎকালীন জৌন পুরের বিখ্যাত হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (র.), যাকে**শাহ্**শর্কী অত্যন্ত ভয় করতেন। কেননা তিনি ছিলেন হযরত নূর কুত্বুল আলম এর পিতার শিষ্য। হযরত আশরাফ সিমনানীর লেখা, রাজা গণেশের অত্যাচারের কাহিনী সম্বলিত চিঠিসহ মোট তিনটি চিঠি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। যেখানে গণেশ রাজার ঘটনার পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। পরবর্তীতে হযরত**শাহ্** নূরকুত্বুল আলম (র.) এই চিঠি পাবার পর সুলতান ইব্রাহীম তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে আশরাফ সিমনানী (র.) এর কাছে উপদেশ চেয়ে পত্র লিখেছিলেন। উত্তরে হযরত সিম্নানী লিখেছেন,"কাফের গণেশ জোর করে ক্ষমতা দখল করার বিরোদ্ধে আপনার সাহায্য কামনা করে নূর কুত্বুল আলম আপনাকে চিঠি লিখেছেন।"

তার সারসংক্ষেপ হল:

"প্রায় ৩০০ বছর পর ইসলামের পীঠস্থান বাংলাদেশে ধর্ম নষ্টকারী কাফেরদের দ্বারা দেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে। মুসলমানরা নানাভাবে অসম্মানিত হচ্ছে। যে দেশে ইসলামের আলোক বর্তিকা প্রতিটি কোণায় কোণায় পৌঁছেছে,সে দেশে কানস্ রায় ইসলামী বিশ্বাসেরবি**রু**দ্ধে যে ঝড় তুলেছে, তাতে করে ইসলামের আলোক বর্তিকা প্রায় নিভে যাচ্ছে। আপনার বিজয়ী সেনাবাহিনী দিয়ে নূরী (স্বয়ং নূর কুত্বুল আলম) আর শেখ হোসেনির আলোক বর্তিকাকে প্রজ্জলিত করুন। ইসলামের পীঠ স্থানের এই অবস্থা হচ্ছে, তখন আপনি

[৮৬]পূর্বোক্ত পৃ.৬৯

[৮৭]নূর কুতবুল আলম বংশ মর্যাদায় দীনদারী ও আধ্যাতিক সাধনায় তার পূর্ব পুরুষের ধারাবাহিকতা রক্ষাকারী হিসাবে সুযোগ্য উত্তরসূরী।

কেন শান্ত ও সুখী মনে সিংহাসনে বসে রয়েছেন? জেগে উঠুন ধর্মের সাহায্যে এগিয়ে আসুন। আপনার এত শক্তি সামর্থ রয়েছে যেখানে সেখানে আপনার অগ্রণী ভূমিকা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। যে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতাও অন্যায় অত্যাচারে বাংলাদেশ ধ্বংস হচ্ছে, আপনি কিভাবে, তা সহ্য করছেন।

কাফেরদের কাফেরী আগুন যখন জ্বলছে তখন আপনি তরবারি খাঁপে ভরে রেখেছেন! এরূপ অবস্থায় কোন বন্ধু নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পারে না। এটি সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। বাংলাদেশকে যেখানে "স্বর্গ" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, সেখানে নরক অনলে তা নি:চিহ্ন হতে পারে না। আর এক মুহূর্ত সময় নেই বিশ্রাম নেবার। "এবার জেগে উঠুন। আসুন আপনার তলোয়ার দিয়ে শেষ করে দিন এই সমস্ত কাফির নাস্তিকদের।"

এ হচ্ছে মহান দরবেশ হযরত নূরের চিঠির মর্ম।পীর দরবেশ, সূফী-সাধক, গাউস কুতুবের দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের এমন কোন জেলা নেই যেখানে সূফীগণ ইসলাম প্রচার করেননি বা এখনো করছেন না। বাংলার আনাচে কানাচে পৌঁচ্ছে ইসলামের জ্যোতি।

রাজা গণেশ মুসলামানদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক আলেম, সূফী, দরবেশদের কে হত্যা করেন। তার এরূপ কর্মকান্ডে সূফী দরবেশগণ যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। নিজের সার্থকে চরিতার্থ করার লক্ষ্যে নিজ পুত্রকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার নির্দেশ দিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনি।[৮৮]

জনৈক লেখক বলেন,

Raja Ganesh was not a clear minded man, He did not made himself Muslim but his son.

[৮৮]ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, "ইসলাম প্রসঙ্গ", ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ১৬৪।রমেশচন্দ্র মজুমদার," বাংলাদেশের ইতিহাস" কোলকাতা ৩য় সংস্করণ ১৩৮৫, পৃ.৪৭

"রিয়াজ উস সালাতিন" গ্রন্থে বলা হয়েছে–

When Sultan Shamsuddin died Raja Kans (Ganesh) a Hindu Zaminder gaining supremacy over all the country of Bengal, sat down on the seat of the ruler and began to practice oppression and bloodshed, Setling himself to the slaughter of Muslims, he put to the sword many of the theological scholars and shaiks and wish to root out Islam from his realm.

The saint Nur Qutub ul Alam excited by the news of the infidels supermacy and his slaughter of muslims wrote to sultan Ibrahim sharqi to invade Bengal and save Islam.

রাজা গণেশের অত্যাচারে মুসলমানগণ প্রায় দিশেহারা। এমতাবস্থায় হযরত নূর কুত্বুল আলম জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শর্কীকে বাংলা আক্রমণ করে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য যে অনুরোধ পত্র লিখেছিলেন। পত্র পাওয়ার পর শর্কী দ্রুত সৈন্য পরিচালনা করে মালদাহ শিবির স্থাপন করে।

এ খবর শুনে রাজা গণেশ কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে, হযরত নূর কুত্বুল আলমের কাছে এসে বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এমনকি শেষ পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ইচ্ছা ও প্রকাশ করলেন। কিন্তু স্ত্রীরবাঁধায় তিনি আবারও পরাজিত হলেন। পরে নিজ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিজপুত্র যদু (জিত্মল) কে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। নূর কুত্বুল প্রস্তাবে রাজি হলে এবং তাকে কালিমা পড়িয়ে মুসলমান করলেন এবং তার নাম পরিবর্তন করে রাখলেন জালালুদ্দীন। জালালুদ্দীন গৌড়ের সিংহাসনে বসলেন। [৮৯]

রাজা গণেশ বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। নূর কুত্বুল আলম এর অনুরোধে সুলতান শর্কী সৈন্যদল নিয়ে যখন জৌনপুরে চলে এলেন। আবারও রাজা গণেশ এর মুখোশ খুলে যায়। সে পুনরায় মুসলমানদের রাজা, পরিবার-পরিজন, চাকর-বাকর সকলের উপর অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে তুললে নূর কুত্বুলতাঁরছেলে আনোয়ার ও

[৮৯]ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, "ইসলাম প্রসঙ্গ", ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ১৬৫

পৌত্র শায়খ জাহিদকে সোনারগাঁও এ নির্বাসিত করলেন এবং সেখানে আনোয়ারকে হত্যা করা হল।

কথিত আছে, "যেদিন এবং ঠিক যেইমুহূর্তেআনোয়ারের রক্তে সোনারগাঁও রঞ্জিত হল, ঠিক সেই দিন রাজা গণেশের মৃত্যু হল।"

গণেশের মৃত্যুর পর নূর কুত্বুল আলম পুনরায় জালাল উদ্দীনকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। জালাল উদ্দীন ইসলামের চরম ভক্ত হয়ে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। রাজা গণেশের মৃত্যুর পরও নূর কুত্বুল আলম বেঁচে ছিলেন। তার দুই পুত্র শায়খ বরকত উদ্দীন, শায়খ আনোয়ার শহীদ এবং পৌত্র শায়খ জাহিদ ইতিহাস বিখ্যাত আলিম ছিলেন।

নূর কুত্বুল আলম এর মৃত্যু সন নিয়ে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। "তাজকিরার" বর্ণনায় তিনি ১৪৪৭ খৃস্টাব্দইন্তিকাল করেন। "আইন-ই-আকবরীর" মতে, ১৪০৫ খৃস্টাব্দ মৃত্যু বরণ করেন। "মিরআতুল আশরার" গ্রন্থে বলা হয়েছে তিনি ৮১৮ হিজরী (১৪১৫-১৬)ইন্তিকাল করেন। ব্লকম্যান তার মৃত্যুর সন ৮৫১হিজরী বা ১৪৪৭ খৃস্টাব্দ বলে উল্লেখ করেন, এই তারিখটি অধিক গ্রহণযোগ্য।[৯০]

নূর কুত্বুল আলম ছিলেন ইসলামের মহান সাধক। ইসলামের সেবক। যার প্রচেষ্টায় বাংলার প্রতিটি ঘরে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল । পান্ডুয়ায় প্রতিষ্ঠিত তাঁর খানকায় দেশ বিদেশের জ্ঞানী-গুনির সমাবেশ হতো। এমন মহৎ প্রতিষ্ঠান সেকালে আর কোথাও ছিল না।[৯১] পান্ডুয়ায়তাঁরমাযার মোবারক অবস্থিত।তাঁর অসংখ্য ভক্ত, ছাত্র, শিষ্য বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ইসলাম প্রচারে এই মহান সাধকের কোন তুলনা হয় না। তিনি চির অম্লান হয়ে থাকবেন বাংলার বুকে। ইসলামের ইতিহাসে। তারা চিশতিয়া তরীকাভুক্ত[৯২] ছিলেন।

---

[৯০]ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, "ইসলাম প্রসঙ্গ", ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ১৬৫

[৯১]The khanqa of the vastly Learned Sufi Shaikh Ala-al-Haq and his distinguished Son Shaikh Nur QutbAlam was a renowned Seat of Learning as well as Spiritual Knowledge, Dr. M.A. Rahim,"Social and Cultural History of Bengal", Vol-11, Karachi, 1967, P.289.

[৯২]খাজা মঈনুদ্দীন চিশতির তরীকাকে চিশতিয়া তরীকা বলা হয়।

শেখ জাহিদ(র.)

বাংলার মহাসাধক, ইসলাম ধর্মের সেবক ও প্রচারক হযরত নূর কুতবুল আলম (র.) এর দুই পুত্র ছিলেন। শায়খ জাহিদ ছিলেন তাঁর প্রথম পুত্র শায়খ বরকত উদ্দীন বা রিফাত উদ্দীনের পুত্র। জগতের ধ্রুবতারা ও তৎকালীন গৌড় ও পান্ডুয়ার মুকুট মনি নূর কুত্বুল আলম এর হাতেই তিনি মুরীদ হয়েছিলেন। শায়খ জাহিদ তার দাদার বা পিতামহের ন্যায় সর্বক্ষণ খোদা প্রেমে মশগুল থাকতেন। অত্যাচারী রাজা গণেশের পুত্র যদু ওরফে সুলতান জালাল উদ্দীন মুহম্মদ শাহ (১৪১৮-১৪৩১ খৃস্টাব্দ) শেখ জাহিদ (র.) হাতে মুরিদ হয়েছিলেন। পীর জাহিদ গণেশ রাজার অত্যাচারে কিছু কালের জন্য সোনারগাঁও এ নির্বাসিত হলেও, পরবর্তী সময়ে অত্যন্ত সম্মান পূর্বক রাজার ছেলে যদু ওরফে জালাল উদ্দীন মুহম্মদ শাহ তাকে পান্ডুয়ায় ফিরিয়ে আনেন।[৯৩] ১৪৫৫ খৃস্টাব্দে পান্ডুয়ায় এই সাধক পরলোক গমন করেন। তার দাদা নূর কুত্বুল আলম তাকে "বংশের আলো" বলে আখ্যায়িত করত।

শেখ আনোয়ার (র.)

শেখ আনোয়ার ইসলামের মহান সেবক। হযরত নূর কুত্বুল আলম (র.) এর দ্বিতীয় পুত্র। অত্যাচারী রাজা গণেশের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত হয়েছিলেন।[৯৪] তার পরও রক্ষা পেলেন না অত্যাচারী রাজার অত্যাচার থেকে। সোনারগাঁও এর মাটিতে শায়খ আনোয়ারকে হত্যা করা হল। শহীদ হলেন শায়খ আনোয়ার। এইরূপ মৃত্যুর জন্য তাকে "শহীদের" সম্মানে সম্মানীত করা হল। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি গভীর ভালবাসায় নিমগ্ন থাকতেন তিনি। ১৪১৮খৃস্টাব্দে শায়খ আনোয়ারইন্তিকাল করেন। বাংলার জনগণ তাঁর গোটা বংশের কাছে চিরস্মরণীয় ও চির ঋণী হয়ে রইল।

[৯৩]M.A. Rahim," Social and Cultural History of Bengal, " Vol 11, Karachi, 1967, P.175.
[৯৪]Abdul Karim "Social History of the Muslim in Bengal" Dhaka 1959. P.111

শেখ বদরুল ইসলাম শহীদ (র.)

পূর্বেই বলা হয়েছে অসংখ্য পীর আউলিয়ার আবাস ভূমি আমাদের এই বাংলাদেশ। এদেশে ইসলামকে সু-প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সূফী সাধকগণ আমরণ সংগ্রাম চালিয়েছে। অসংখ্য আলেম শহীদ হয়েছেন। ইসলাম ধর্মকে রক্ষা করার জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিলেন যারা তাদেরই একজন হলেন শেখ বদরুল ইসলাম শহীদ (র.)। তিনি হযরত নূর কুত্বুল আলম(র.) এর সমসাময়িক কালে গৌড় ও পান্ডুয়ায় ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। যার ফলশ্রুতিতে রাজা গণেশ ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ।গণেশ রাজার নির্যাতনের কাহিনী "রিয়াযুস সালাতীন " গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।

"একদা মইনউদ্দীন আব্বাসের পিতা শায়খ বদরুল ইসলাম রাজা গণেশকে সালাম না দিয়ে সভায় বসে পড়ায়, রাজা অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হয়ে তাকে সালাম না দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে শায়খ বললেন, "আলেমদের পক্ষে পৌত্তলিকদেরকে সালাম করা শোভনীয় নয়। বিশেষ করে তোমার মত অত্যাচারী, রক্তপিপাসু বিধর্মীদেরকে। যে মুসলমানদের রক্তপাত ঘটায় কারণে অকারণে।"

রাজা গণেশ শায়খ বদরুল ইসলামের এরূপ জবাবে ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। রাজা গণেশ শায়খ বদরুল ইসলাম কে তার ভাই এর সাথে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাবার নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে তাদেরকে হত্যা করলেন। বাকী আলিমদেরকে নৌকায় নিয়ে মাঝ নদীতে ডুবিয়ে হত্যা করা হলো।[৯৫] জৌন পুরের সুলতানইব্রাহীম শর্কীর কাছে লিখিত পত্রেই তার প্রমাণমেলে।

হযরত মীর সাইয়েদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিম্নানী (র.)

বাংলার শায়খ আলাউল হকের অন্যতম শিষ্য ছিলেন মীর সাইয়েদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিম্নানী(র.)। মহান রাব্বুল আলামীনের প্রেমে পাগল পারা ছিলেন। তাই তো রাজ সিংহাসন, রাজ পরিবার, আর্থিক সচ্ছলতা কোন কিছুই তাকে আটকাতে পারেনি। সর্বদা খোদা প্রেমে মশগুল থাকতেন। সকল লোভ, লালশা বর্জন করে তাসাউফ সাধনায় নিজেকে নিমগ্ন রাখতেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের জন্য নানা দেশ পরিভ্রমণ করতেন। পরে

[৯৫]গোলাম হোসেন সলীম, "রিয়াযুস সালাতীন" বাংলা অনুবাদ, পৃ.৮৭

হিন্দুস্থানে এসে আলাউল হকের সুখ্যাতির কথা শুনে, তিনি পান্ডুয়ায় এসে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেন।[৯৬] আলাউল হক পান্ডুয়ায় যে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মীর সাইয়েদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী সেই মাদরাসারই ছাত্র। সুলতান শর্কি সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিম্‌নানী(র.) কে খুব শ্রদ্ধা করতেন।

মীর সাইয়েদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিম্‌নানী বাংলাকে ভীষণ ভালবাসতেন।[৯৭] তিনি বাংলায় স্থায়ীভাবে না থাকলেও ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রাজা গণেশের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য ইবরাহিম শর্কিকে নানাভাবে পরামর্শ দিতেন। জৌনপুরের সুলতান শর্কির কাছে লেখা এক পত্র থেকে তার প্রমাণ মেলে।[৯৮]

হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর সিম্‌নানীর মাযার উত্তর প্রদেশেরে ফৈজাবাদ জেলার "কাছোছা শরীফ"নামক জায়গায় বিদ্যমান।

হযরত শেখ হেশাম উদ্দীন মানিকপুরী (র.)

হযরত নূর কুত্‌বুল আলমের অসংখ্য শিষ্যদের মধ্যে শেখ হেশাম উদ্দীন মানিকপুরী[৯৯](র.) অন্যতম একজন শিষ্য। ইসলামের ইতিহাসে তিনি খুব উচ্চ মাপের এক সূফী ও বটে। বিভিন্ন ধারায় তিনি ইবাদত বন্দেগী পালন করতেন। এমনকি একাধারে সাত বছর রোযাও রেখেছেন। তিনি ভীষণভাবে ইবাদত করতেন বলে কখনোতাঁর মধ্যে আত্মহংকার ছিল না। ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করতেন। তিনি মূলত বাংলা ও বিহারের বিশাল এলাকায় ইসলাম প্রচার কার্য পরিচালনা করতেন। বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের পূর্ণিয়া জেলার মানিকপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাই তার নামের সাথে "মানিকপুরী" শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। হেশাম উদ্দীন মানিকপুরী অত্যন্ত জ্ঞান পিপাসু ছিলেন বলেই নিজ দেশ ত্যাগ করে লখনৌতির পীরদের প্রতি আকৃষ্ট হন। এবং হযরত নূর কুত্‌বুল আলম (র.) এর নিকট মুরীদ হন। বহু বছর সাধনার পর তিনি মারেফত তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তীতে হযরত নূর কুত্‌বুল আলম তাঁকে নিজ দেশে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দিলে, তিনি

---

[৯৬]Quoted by Professor Hasan Askari in Bengal, 1948, Past and Presents. Vol, LXVII Serial No 130,1948PP. 4536

[৯৭]সুখময় মুখোপাধ্যায়, "বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর" ২য় সংস্করণ ১৯৬৬, পৃ. ৬৯

[৯৮]Quoted by Professor Hasan Askari in Bengal 1948, Past and Presents. Vol LXVII Serial No 130, PP. 45&36

[৯৯]মানিকপুর পশ্চিম বংগের পুনিয়া জেলায় অবস্থিত। শেখ হেশাম উদ্দীন সে স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন বলে তাকে মানিকপুরী বলা হয়।

সেখানে চলে যান। এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। হেশাম উদ্দীনের অসংখ্য শিষ্য ছিলেন। "রফিকুল আরিফিন" গ্রন্থে হেশাম উদ্দীনের পীর, হযরত নূর কুত্বুল আলম সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

ঘটনা

শেখ হেশাম উদ্দীন তাঁর পীরের সাথে দেখা করতে বাড়ী থেকে রওয়ানা করলেন। পথিমধ্যে বার বার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলেন। প্রতিবারই তিনি স্বপ্নে দেখছিলেনতাঁরপীর তাকে বলছেন, আমি তোমার বরাবর আছি, কোন ভয় নেই। তিনি যখন নৌকায় চড়েন তখন তাঁর সাথে একজন দরবেশ ও সঙ্গী হয়েছিলেন। তিনি তীরে উঠলেই সেই দরবেশ পানিতে পড়ে যান, তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। পীরের খানকায় এসে তিনি আশ্চর্য হলেন যে, সেই দরবেশ ও পীরের আকৃতিতে কোন পার্থক্য নেই। শেখ হেসাম উদ্দীনের বেশ কিছু উক্তি ও লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর শিষ্যগণ। যেমন:

দরবেশ চারটি বিষয় নিষ্ঠাবান হওয়ার গুরুত্ব দিয়েছিলেন ঃ

১) একিন বা বিশ্বাস

২) দ্বীন বা ধর্ম

৩) সংসারের প্রতি পুরোপুরি সংযুক্ত না থাকা এবং

৪) লোভ মোহ ত্যাগ করা।

কুরআন তিলাওয়াত নিয়েও তিনি মুল্যবান উক্তি উপস্থাপন করেছিলেন।

প্রথম দিকে আমি ১৫ পারা কুরআন পড়তাম। পরে প্রতিদিন ভোরে তেলাওয়াত করতে শুরু করি এবং এ প্রহরে সমাপ্ত করি। তফসীর কাছেই থাকতো, প্রয়োজন হলে তা দেখে নিতাম। এতে আনন্দ ও পেতাম। কারো জন্যই কুরআন তিলাওয়াত ছেড়ে দেওয়া অন্যায়, প্রতিদিন কমপক্ষে একপারা পড়া দরকার।

সুতরাং বলা যায়, শেখ হেশাম উদ্দীন ছিলেন ইসলাম ধর্মের মহান সাধক দরবেশ।[১০০] ১৪৪৯ মতান্তরে ১৪৭৭ খৃস্টাব্দে মানিকপুরে তিনি ইন্তিকাল করে।

শায়খ হোসাইন যুক্কার পোশ

[১০০]ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, "ইসলাম প্রসঙ্গ" ঢাকা পরিবর্তিত নতুন সংস্করণ, ১৯৭০, পৃ. ১৬৩।

ইসলাম ধর্মের অন্যতম সেবক শায়খ হোসাইন যুক্কার পোশ। "যুক্কার পোশ" অর্থ"ধূলি ধূসরিত"। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট দরবেশ শায়খ আলাউল হকের অন্যতম শিষ্য[১০১]। তিনি ছিলেন ইসলাম প্রচারে এক নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি। রাজা গণেশের অত্যাচারে, ইসলাম প্রচারের কারণে তাঁর পুত্রকে অকাতরে প্রাণ দিতে হয়েছিল। সে সময়েই তিনি গৌড় ত্যাগ করে পূর্ণিয়ায় চলে যান। শায়খ আলাউদ্দীন আলাউল হকের কাছে থেকে খিলাফত লাভ করে। বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের পূর্ণিয়ায় তার মাযার অবস্থিত।

হযরতশাহ্ কাকু (র.)

বিখ্যাত দরবেশ হযরত নূর কুত্বুল আলম (র.)এর বিশিষ্ট মুরীদ হযরতশাহ্ কাকু (র.)।তিনি মূলত: লাহোরের অধিবাসী ছিলেন। বহু বছর ওস্তাদ এর আস্তানায় কাটানোর পর সূফী সাধনার তত্ত্ব সমূহের রহস্য কি? এবংতাঁর সমাধানের উপায় জানতে পারলেন এবং কামালিয়াত লাভ করেন। ১৪৭৭ খৃস্টাব্দে লাহোরেই তিনি ইন্তিকাল করেন। লাহোরে ইসলাম প্রচারে তিনি যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন।

হযরত মাওলানা বরখুর্দার (র.)

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গৌড়ে ইসলাম প্রচারে যে ব্যক্তি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন, তিনি মাওলানা বরখুর্দার (র.)। তিনি ছিলেন একজন আমিরের পুত্র। ইহজগতের সকল সুখ, বিলাসিতা, সাচ্ছন্দ্য পরিহার করে খোদা প্রেমে বিভোর হয়ে পড়ে।তাঁরপিতার নাম ছিল তাজ খাঁ। বরখুর্দার আসল নাম কি তা জানা যায়নি। "বরখুর্দার" ছিল তাঁর উপাধি বিশেষ। এর অর্থ হচ্ছে "সাহেবজাদা বা সম্মানীয় ব্যক্তির পুত্র"। ১৪৮৬ খৃস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

খালাসখাঁন

[১০১]শায়াখ আলাউল হকের বহু শিষ্য ছিল। শায়খ হোসাইন যুক্কার পোশ এর অন্যতম শিষ্য ছিল।

খালাস খাঁন তুর্কী সুলতানদের রাজত্ব কালে বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন। সুন্দরবনের "দেবকেশী" নামক স্থানটিতে ইসলাম প্রচার কেন্দ্র তৈরি করেছিলেন। ধারণা করা হয় যশোহর ও সুন্দরবন অঞ্চলে প্রথম ইসলাম ধর্ম প্রচারক ছিলেন তিনি। ধারণা করা হয় তাঁর সমসাময়িক কালে বড়খান গাজী ও খাঁন জাহান আলী যশোর জেলার অন্যান্য অঞ্চলে এসেছিলেন। তিনি দেবকেশী গ্রামে একটি দীঘি খনন করেন। এতে বুঝা যায়, তিনি জনহিতকর কাজের মধ্যে দিয়ে[১০২]ইসলাম প্রচার অভিযান চালিয়ে ছিলেন। একত্ববাদের শিক্ষা কে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আজীবন সংগ্রাম ও সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। দেবকেশী গ্রামে " খালাস খাঁ দীঘির" পাড়েতাঁর মাযার অবস্থিত।

হযরতশাহ্ মজলিস (র.)

শাহ্ মজলিসকে পঞ্চদশ শতকের ইসলাম প্রচারক বলে ধারণা করা হয়। সুলতান হোসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯খৃস্টাব্দ) পূর্বেই শাহ্ মজলিস এদেশে ইসলাম প্রচার করতে আসেন। হযরত**বদরুদ্দীন** বদরে আলম যাহিদীর (মৃত্যু ১৪৪০ খৃ:) সহকর্মী মনে করেন।**বদরুদ্দীন** বদরে আলম যাহিদী (র.) তাঁর তিন-চারশ সঙ্গী নিয়ে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিলেন। হযরত শাহ্ মজলিস তাদেরই একজন এতে কোন সন্দেহ নেই। বর্ধমানের কালনা শহরে **বদরুদ্দীন** বদরে আলমের মাযারের বেশ কিছুটা (আনুমানিক ২ মাইল) দূরে শাহ্ মজলিস দরবেশেরমাযারঅবস্থিত।

বদরুদ্দীন বদরে আলম যাহিদী (র.)

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য বাংলার বাইরে থেকে অসংখ্য সূফী দরবেশ এদেশে আগমন করেছিলেন। তেমনি একজন সূফী হলেন**বদরুদ্দীন**বদরে আলম যাহিদী। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন হযরত শিহাব উদ্দীন মাক্কী। বাল্য কালেই তিনি বিখ্যাত সূফী মখদুম

[১০২]একত্ববাদের শিক্ষা বলতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার শিক্ষা এবং শিরক বিরোধী শিক্ষা উদ্দেশ্য।

জালালুদ্দীন জাঁহানীয়া জাঁহাগশ্ত বুখারীর আশির্বাদ লাভ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান চর্চায় পারদর্শিতার পরিচয় দেন।

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, পিতার উপদেশ ও বিখ্যাত আলিম সূফী হযরত শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মানেরীর[১০৩] অনুমতিক্রমে তিনি চারশ দরবেশ কে সঙ্গে নিয়ে বাংলায় আসেন এবং চট্রগ্রামে কেন্দ্র স্থাপন করে ইবাদত বন্দেগীতে মনোনিবেশ করেন। ১৩৮০ সালে বিহারে হযরত মানেরীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়েছেলেন। তাঁর পুত্র হযরত ফখরুদ্দীন পিতার নির্দেশে হিন্দুস্তানে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন।

পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার কালনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন বলে জানা যায়। কালনা শহরে তাঁর আস্তানা।[১০৪]১৪৪০ খৃস্টাব্দে তিনি বিহারে ইন্তিকাল করেন এবং যেখানে তাঁর মাযার অবস্থিত।

শাহ্ সুলতানা আনসারী (র.)

শাহ্ সুলতান আনসারী ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে অন্যতম। বাংলার বাইরে থেকে এসে, ইসলাম অর্থাৎ মহান আল্লাহ পাকের তৌহিদের বাণী কে সু-প্রতিষ্ঠা করার মত মহৎ কর্মে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন তিনি। তাঁর নাম শাহ্ সুলতান আনসারী (র.)। তিনি মদিনায় জন্ম গ্রহণ করে ছিলেন বলে জন্ম সূত্রে তাঁর নামের সাথে "আনসারী" উপাধি যুক্ত হয়েছে। তিনি প্রথমে মুলতানে, পরে গুজরাটে এসেছিলেন। পরবর্তীতে বাংলায় ইসলাম প্রচার করার ব্রত নিয়ে পশ্চিম বঙ্গের মঙ্গল কোটে স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করেন। ধীরে ধীরে ইসলামের সু-মহান বাণী প্রচার করতে শুরু করলেন পৌত্তলিক সমাজে। ধারণা করা হয় ১৪৯৮ খৃস্টাব্দে তিনি মঙ্গল কোটে এসেছিলেন। মঙ্গল কোটে-ই তাঁর প্রধান কর্মস্থল। তাঁর অপরিসীম ত্যাগ তিতিক্ষা, ভালবাসার জন্য জনগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বহু দিন ইসলাম ধর্মের সেবা করতে করতে তিনি পরলোক গমন করেন। মঙ্গল কোটে তাঁরমাযারঅবস্থিত।

---

[১০৩]শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী ১২৬৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৩৭১ সালে ইন্তেকাল করেন।

[১০৪]চৌধুরী শামসুর রহমান, "পূর্ব পাকিস্থানে ইসলামের আলো" পৃ. ৯৬

শাহ্আব্দুল্লাহ গুজরাটি

শাহ্আব্দুল্লাহ গুজরাটি মঙ্গল কোটের[১০৫] অপর একজন মহা সাধক । সুলতান নাসির উদ্দীন নসরৎ শাহের রাজত্বকালে (১৫১৯-১৫৩২ খৃ) তিনি ভারতের গুজরাট থেকে মঙ্গল কোটে চলে আসেন। এবং সেখানে তাঁর আস্তানাস্থাপন করেন। শাহ্ সুলতান আনসারীর তাসাউফ সাধনায় মুগ্ধ হয়ে তিনি ও মঙ্গল কোটে আস্তানা স্থাপন করে। ইসলাম প্রচার কাজে তিনি সুলতান আনসারী কে যথেষ্ট সহায়তা দান করেছিলেন। মঙ্গল কোটেই তাঁর দরগাহ মোবরক অবস্থিত।

বাবা আদম (র.)

বগুড়া জেলায় ইসলাম প্রচারে যিনি অনবদ্ধ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তিনি বাবা আদম (র.) তৎকালীন বাংলার শাসন কর্তা বল্লাল সেনের অত্যাচারে জনগণ যখন অতিষ্ট হয়ে উঠেছিলে, তখনই বাবা আদম(র.)তাঁর বেশ কিছু শিষ্য নিয়ে শান্তাহার থেকে ৫ মাইল দূরে আস্তানা স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু সেখানে আস্তানা স্থাপনের পর পানির সংকট দেখা দেয়। কষ্ট নিবারণের জন্য তিনি সেখানে একটি পুকুর খনন করেন। পুকুরটি তাঁর নাম অনুসারেই "আদম দীঘি"[১০৬] নাম হয়েছে। ইসলাম প্রচারের কারণে হিন্দু রাজা ও রাজকর্মচারীদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়েও ইসলাম প্রচার থেকে এত টুকুও সরে জাননি। বিক্রম পুরে বাবা আদম ও বগুড়ার বাবা আদম এক কি-না তা বলা বেশ কঠিন। বগুড়ার শান্তাহার থেকে কিছু দূরে আদম দীঘিতে বাবা আদমের দরগাহ অবস্থিত।

শাহ্ মান্নাহ্

ইসলামের সত্যবাণী প্রচারের জন্য সোনারগাঁও এলাকায় যিনি আস্তানা স্থাপন করেছিলেন তিনি শাহ্মান্নাহ্। ঢাকার সোনারগাঁও এর মুগরাপাড়ায় তাঁরমাযার অবস্থিত। তাঁরমাযার সংলগ্ন শিলালিপি থেকে অনুমান করা যায় যে, ১৪৮৪ খৃস্টাব্দের পূর্বে হযরত শাহ্ মান্নাহ

[১০৫]মঙ্গলকোটে বহু সাধান ছিলেন। মাত্র আবদুল্লাহ গুজরাটি তাদের অন্যতম মদনকোটেই তাঁর সমাধি অবস্থিত।
[১০৬]আদমদীঘি বাবা আদম পুকুরটি খনন করেছিলেন বলে দীঘিটিকে "আদমদীঘি" বলা হয়।

ইন্তিকাল করেছিলেন। ইসলামের সত্যবাণীকে সু-প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সোনারগাঁও এলাকায় এসেছিলেন তিনি। সোনারগাঁও এ আগত ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে তিন অন্যতম ছিলেন। ইসলামের জন্য আমরণ সংগ্রাম করেছিলেন জীবনের শেষমুহূর্তটুকু পর্যন্ত। পরে এদেশেই শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

মখদুম শাহ্জহীরুদ্দীন

গৌড়ের সুলতান নুসরতশাহ্ এর রাজত্ব কালে (১৫১৯-৩২) বীরভূম জেলায় ইসলাম প্রচার করার জন্য দায়িত্ব পালন করেছিলেন। মখদুম শাহ জহরুদ্দীন পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে সর্বদা সংগ্রাম করেছিলেন। এবং পৌত্তলিকতার অন্ধকারে নিমজ্জিত লোকদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। বীরভূম জেলায়তাঁরনামে একটি নগরের নাম করণ করা হয়েছে "মখদুম নগর।" মখদুম নগরের অধিকাংশ লোকতাঁরহাতে ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। "মখদুম নগর" নামক স্থানেতাঁরমাযার অবস্থিত।

শায়খ জালাল হালবী

শায়খ জালাল হালব্ সিরিয়ার হালব নগরীতে ১৪৬২ খৃস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। বর্তমান আলেপ্পো নগরী। চট্টগ্রামের হাট হাজারী ও তার আশে পাশের এলাকায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করার মত মহান কাজটি করেছিলেন তিনি। জানা যায়, জালালাবাদে আজওতাঁরবংশধরগণ আছেন। বহুদিন ইসলাম প্রচারের পর ১৫৩৭ খৃস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন। হাটহাজারী থানার জালালাবাদ গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত।[১০৭]

[১০৭]চট্রগ্রাম ১২ আউলিয়ার দেশ। ১২ জন আউলিয়া চট্টগ্রামে বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। খায়খ জালাল তাদের একজন। জালালাবাদ গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত।

হাজী বাবা সালেহ

ইসলামের অন্যতম সেবক হাজী বাবা সালেহ। তিনি রাজ কর্মচারী ছিলেন।[১০৮] সুলতান জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহ্ ও তারপর সুলতানগণ তাঁর উপাধি দিয়েছিলেন "মালিক"। ইসলামের খেদমতের জন্য তিনি বহু মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। রাজকার্য করার মধ্য দিয়ে নানা উপায়ে ইসলাম প্রচার করে গেছেন। ফতেহ শাহ এর আমলে ঢাকার নারায়নগঞ্জ এ ৮৮৬ হিজরীতে একটি মসজিদনির্মাণকরেন। পরবর্তীতে সুলতান হোসেনশাহ এর আমলে বাবা সালেহ "আজিম নগর" নামক স্থানে একটি এবং ৯১২ হিজরী (১৫০৬ খৃস্টাব্দ) ও ৯১২ হিজরী (১৫০৬ খৃস্টাব্দ) দু'টি মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৫০৬ খৃস্টাব্দে হাজী বাবা সালেহ ইন্তিকাল করেন।

মুবারক গাজী

মুজাহিদ দরবেশ হিসাবে যিনি সর্বত্র পরিচিত তিনি হলেন মুবারক গাজী। সুন্দরবন অঞ্চলের কিংবদন্তির মহানায়ক। বাঘের হাত থেকে সুন্দরবনের মানুষকে বাঁচাবার জন্য তিনি যথেষ্ট সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর এই সংগামের মধ্যে দিয়ে তিনি ইসলাম প্রচারের পথকে অনেকটাই সুদূর প্রসারী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর কর্মে মুগ্ধ হয়ে অসংখ্য অমুসলিম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছিল। পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বাঁশড়ানামক স্থানে তাঁর মাযার অবস্থিত।

খাজা চিশ্‌তী বেহেশ্‌তী

১৫৬৬-১৬০৫ খৃস্টাব্দে বাদশা আকবরের রাজত্ব কালে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসেন খাজা**চিশ্‌তী**বেহেশ্‌**তী** । তাকে নওয়াব আলা উদ্দীন ইসলাম খান**চিশ্‌তী**র উত্তরপুরুষ বলে ধারণা করা হয়। ১৫৮৯ খৃস্টাব্দে (হিজরী ৯৯৮সনে) তিনি ইন্তিকাল করেন। ঢাকার সুপ্রীম কোর্টের পাশে হযরত খাজা **চিশ্‌তী**বেহেশ্‌**তী**রমাযারঅবস্থিত।[১০৯]

[১০৮]রাজকার্য করার পাশাপাশি ইসলাম প্রচারের কাজও তিনি আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

[১০৯]বহু লোক তাঁর মাযার যিয়ারত করে চলেছেন।

শাহ্ মুয়াজ্জাম দানিশ মন্দ

শাহ্ মুয়াজ্জাম ইসলামী শাস্ত্রের একজন বিখ্যাত পন্ডিত ছিলেন। তিনি খলিফা হারুনর রশীদের বংশধর। তিনি রাজশাহী জেলায় ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। তার প্রচেষ্টায় ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ইসলামের সুবিধার্থে তিনি একটি মাদরাসা ও খানকাহ স্থাপন করেন। যা সে অঞ্চলের মুসলমানদের জ্ঞান সাধনার পথকে সুগম করেছিল। রাজশাহীর "বাঘা মসজিদটি" আজো তাঁর ইসলাম প্রচারের সাক্ষ্য বহন করছে।[১১০] তিনি সুলতান নুসরাত শাহের আমলে(১৫১৯-১৫৩২খৃস্টাব্দে) বাগদাদ থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আসেন। ইসলাম প্রচারে **শাহ্**মুয়াজ্জাম দানিশ**মন্দ**ওতাঁরপরিবারের অবদান অপরিসীম।। রাজশাহীর বাঘায় তাঁর মাযার অবস্থিত।

সাইয়েদ আবদুল খালেক বুখারী

হযরত সৈয়দ আবদুল খালেক বুখারী ছিলেন অসীম সাহসী, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহাপুরুষ। টাঙ্গাইল মহকুমায় ইসলামের প্রদীপকে প্রজ্জলিত করার নিমিত্তে তিনি কঠোর সংগ্রাম করে গেছেন। বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার "পারসী গ্রামে" বসতি স্থাপন করেছিলেন। ইসলামে নীতি ও আদর্শ কে জনমনে ধারণ করাতে হযরত বাবা আদম কাশমীরি যতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন, ঠিক তেমনি ইসলাম ধর্মের উন্নতির ক্ষেত্রে হযরত বোখারীর অবদানকে এক বাক্যে স্বীকার করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। খালিক বোখারীর আধ্যাত্মিক শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে বীর চেঙ্গিসখান তার কাছে আশির্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁরপূর্বপুরুষগণও ছিলেন ইসলামের মহান সেবক। তারই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছিল বিখ্যাত দরবেশ সাইয়েদ আবদুল খালেক বুখার(র.) ।টাঙ্গাইলের"পারসী গ্রামে"তাঁরমাযারের ভগ্নাবশেষ এখনও রয়েছে।

[১১০] শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার, ১৯৮৪, পৃঃ ১১৩-১১৫

মাওলানা শাহ্আবদুর রহীম শহীদ (র.)

মাওলানা **শাহ্** আবদুর রহীম শহীদ সতের শতকের শেষ দিকে বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন। প্রথম দিকে মুর্শিদাবাদে আগমন করলেও পরবর্তীতে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। চিরকুমার এই দরবেশ বাংলাদেশে আগমনের সময় তাঁরএক ভাইয়ের ছেলে **শাহ্**নজমুদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। ঢাকা জেলায় ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। দীর্ঘ বিশ বছর খোদা প্রেমে মশগুল থাকার পর, তিনি হজ্জ পালনের জন্য মক্কা গমন করেন। পরবর্তীতে স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে আবার বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তিনি একজন সমাজ সংস্কারক ও বটে। শাহ আবদুর রহীম নকশ-বন্দিয়া তরীকা পন্থী ছিলেন।[১১১] তিনি মূলত হযরত আমানত **শাহ্** (র.) এর উত্তর সূরী হিসেবে ও পরিচিতি লাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি "মুজাদ্দেদিয়াতরীকা " ও গ্রহণ করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঢাকার লক্ষীবাজার মহল্লায় তার খানকাহ অবস্থিত। শাহ আব্দুর রহীম ১০৭৪ হিজরীতে কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ১১৫৮ হিজরীর ৭ শাবান এক পাগল তাঁর দেহে সাতটি তরবারির আঘাত করে। রমযান মাসের ৯ তারিখে তিনি ইন্তিকাল করেন। লক্ষীবাজার মহল্লায় তাঁরমাযার অবস্থিত।

শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ শাহে ওয়ালি (র.)

গৌড় ও পান্ডুয়ায় ইসলাম প্রচার কার্যে যার আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শাহ নিয়ামত উল্লাহ শাহেওয়ালি (র.)। দিল্লীর "কর্ণাল" নামক স্থানে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। বিভিন্ন দেশ থেকে দেশান্তরে পরিভ্রমণ করা তাঁর অত্যন্ত পছন্দের বিষয় ছিল। এভাবে দেশ পরিভ্রমণ করতে করতে রাজমহলে এসে হাজির হন। সেখানে কিছুদিন ইসলাম প্রচারের পর প্রাচীন গৌড়ের ফিরোজ পুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেশুরু করেলন। জ্ঞান, বিদ্যা, পান্ডিত্যের জন্য তাকে "জ্ঞানের সাগর" বলা হত।[১১২]

---

[১১১]বাহাউদ্দীন নকশবন্দ এ তরীকার প্রবর্তন ছিলেন বলে তাঁর প্রবর্তিত তরীকাকে নকশবন্দী তরীকাবলা হয়। বাংলাদেশে প্রবর্তিত ৪টি তরীকার মধ্যে এটি অন্যতম।

[১১২]ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল বলে তাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়।

সৈয়দ আব্বাস মক্কী ওরফে পীর গোরা চাঁদ (র.)

আরবের মক্কা নগরে হিজরী ৬৬৪ সালে (১২৬৫ খৃস্টাব্দ) সৈয়দ বংশে আব্বাস আলী মক্কী ওরফে পীর গোরাচাঁদ জন্ম গ্রহণ করে। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ করিমুল্লাহ। মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই তাঁর নামের সাথে "মক্কী" শব্দটি সংযোজন করা হয়েছে।অত্যন্ত খোদা ভীরুলোক ছিলেন। এরূপ খোদাভীতির কারণে ছোটকাল থেকে বনে জঙ্গলে ফল ফলাদি খেয়ে ১২ বছর আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। আল্লাহ পাকের স্বপ্নাদেশের কারণে তিনি দ্রুত বালান্ডা পরগণনায় চলে আসেন। সেখানে ইসলাম প্রচার কার্য পরিচালনা করেন ও অত্যাচারিত লোকজনকে রক্ষা করেন। স্বপ্নাদেশ পেয়ে প্রথমে হিন্দুস্থান ও পরে কিছুদিন গাজীপুরেও বসবাস করেন। পরবর্তীতে হযরত **শাহ্** জালাল (র.)এর মুরীদ হন ও তাঁর সেবা করতে শুরু করেন। হযরত শাহ জালাল র. অত্যন্ত ভালবাসতেন গোরা চাঁদ (র.)

কথিত আছে, সিলেটের প্রখ্যাত অলী আল্লাহ হযরত **শাহ্** জালাল (র.) তিনশত ষাটজন সহচর নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন। সৈয়দ আব্বাস মক্কী ওরফে গোরা চাঁদ(র.) ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে তাঁর ভূমিকা ছিল বর্ণনাতীত। হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকেই তাকে পরম শ্রদ্ধা করতেন। হাড়ো ও পেয়ারা গ্রামেতাঁরঅসংখ্য ভক্ত আজো রয়েছে। ১৩২৩ সালে গোরা চাঁদ বাংলাদেশে আগমন করেন।

গৌড়ের সুলতান আলা উদ্দীন আলী**শাহ্**, গোরাচাঁদ এর মাযারের উপর সমাধী সৌধ তৈরি করেছিলেন।[১১৩] এবং ১৫০০ বিঘা জমিও সম্পত্তি লাখেরাজ হিসেবে দান করেছিলেন। বালান্ডা পরগণার অন্তর্গত হাড়োয়া নামক স্থানে পীর গোরাচাঁদ এর মাযার অবস্থিত।

[১১৩]ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, "বাংলা সাহিত্যের কথা" ২য় খন্ড, ঢাকা পরিবর্তিত সংস্করণ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ পৃ.-৪৬৮-৪৭৫

হযরত শাহ্পীর (র.)

শাহ্ পীর (র.) এর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ ইউসূফ। তিনি আল্লাহর অলী। ইসলাম প্রচারে জন্য তিনি তিন-চারশ বছর পূর্বে চট্টগ্রামের সাত কানিয়া থানার এক গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সংগ্রাম ধর্মের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। সর্বদা খোদা প্রেমে মশগুল থাকতেন। মহান আল্লাহ পাকের একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম কে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। ধারণা করা হয় তিনি দিল্লীর শাহযাদা ছিলেন।

"**শাহ্**পীর" নামক অন্য আরেক জন পীরের কথা ভারতের মিরাট প্রদেশে শুনা যায়। তখন প্রশ্ন হচ্ছে মীরাটের এই**শাহ্**পীরের সঙ্গে চট্টগ্রামের **শাহ্**পীরের কোন সম্পর্ক আছে কি-না? তা বলা কঠিন। আবার এমন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। যেমন:**শাহ্**পীর মিরাটে আকিদা গ্রহণ করেছিলেন, পরে তার জীবদ্দশায় কোন এক সময় চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন। সাতকানিয়া ইসলাম প্রচার করে তিনি পুনরায় মিরাটে ফিরে যান এবং ১৬৩২ খৃস্টাব্দে পরলোক গমন করে।[১১৪] সাতকানিয়ায় এ দরবেশের মাযার অবস্থিত।মাযার থেকে খানিক দূরে দরবেশের নামে একটি হাট রয়েছে, যাকে জনগণের নিকট "দরবেশের হাট" বলে কথিত আছে।

অপর দিকে ভারতের মীরাটে "**শাহ্**পীর" এর মাযার বিদ্যমান রয়েছে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পত্নী সম্রাজ্ঞী নূর জাহান তাঁর মাযারের উপর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন।**শাহ্**পীর শততারী সম্প্রদায়ভূক্ত সুফী ছিলেন।

হযরত শাহ জামাল (র.)

সিলেটের হযরত শাহ্জালাল(র.) এর অন্যতম দুই শিষ্য **শাহ্**কামাল ও **শাহ্** জামাল। মুগল সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালে ইয়ামেন থেকে বাংলাদেশে আসেন। আদম কাশ্মীরীর একজন ভাগনে শাহ জামাল। এদের মধ্যে ও অভিন্নতা আছে কি-না বলা বেশ কঠিন। তিনিমূলত জামাল পুরে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। খোদা প্রেমে বিভোর থাকতেন সর্বক্ষণ। যথেষ্ট অলৌকিক ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির কথা সম্রাট জানতে পেরে জামাল

[১১৪]Dr. Md. Enamul Haq," A History of Sufism in Bengal", Dhaka 1st Edition, 1975. P. 255-256

পুরের জমি ও "সনদ" তাকে উপহার দেন। যা বর্তমানে "সিংহজানী মৌজা" নামে পরিচিত। পরবর্তীতে সিংহজানী মৌজাকেই জামালপুর নাম করণ করা হয়। ১৭৭৯খৃস্টাব্দে জমি জরিপ মানচিত্র থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। জামালপুর শহরের পশ্চিমে দিকে**শাহ্** জামাল (র.) এর মাযার অবস্থিত।[১১৫]

হযরত শাহ কামাল (র.)

শাহ্ কামাল একজন কামিল ওলী হিসেবে পরিচিত। তিনি ১৫০৩খৃস্টাব্দে ইয়ামেন থেকে প্রথম পাক ভারত উপমহাদেশে আগমন করেছিলেন।[১১৬] পরে নানা স্থান, নানা দেশ পেরিয়ে বাংলাদেশে আসেন, এবং জিঞ্জিরা নদী বা বর্তমান বক্ষপুত্র নদীর তীরে খোদা ধ্যানে মশগুল হয়ে যান। কথিত আছেন,**শাহ্**কামালের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে কড়াই বাড়ীর জমিদার তাকে আসামে বালকাই মৌজা দান করেন। **শাহ্**কামাল আধ্যাত্মিক ক্ষতার অধিকারী ছিলেন। স্থানীয় এক হিন্দু জমিদার পুত্র অর্ধাঙ্গ ব্যাধিতে ভুগছিলেন। কিন্তু**শাহ্**কামাল (র.)এর আশির্বাদে রোগ থেকে মুক্তি পেলেন।হিন্দু জমিদার তাকে কামালপুর,গেদরা অঞ্চল প্রদান করেছিলেন। হযরত**শাহ্** জালাল (র.) এর শিষ্য **শাহ্**কামাল ও **শাহ্**জামালের সাথে, ময়মনসিংহের শাহ জালাল (র). এর শিষ্য শাহ কামাল ও শাহ জামালের সাথে ময়মনসিংহের শাহকামাল ও **শাহ্**জামালের অভিন্নতা আছে কি-না তা বলা মুশকিল।

শাহ্ চাঁদ (র.)

চতুর্দশ শতাব্দীর অন্যতম সূফী শাহ্চাঁদ (র).। তিনি বশিরহাট[১১৭] মহকুমার বাদুড়িয়া থানার আঁধার মানিক গ্রামে আগমন করেন। তিনি এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। বাদুড়ি, হাবড়া, বশিরহাট অঞ্চলে **শাহ্**চাঁদ (র.) প্রভাব বিস্তৃত ছিল। আঁধার মানিক গ্রামেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

---

[১১৫]টাঙ্গাইল জেলার কাগমারীতে টাঙ্গাইল এলাসিন রাস্তার মিলনস্থলে একটি মাযার রয়েছে। অনেকে এটিকে হযরত শাহ জামালের মাযার বলে মনে করেন।

[১১৬] তুর্কী সুলতানগন যখন এদেশ শাসন করেন তখন বুহ সুফী দরবেশ এদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্য আগমন করেন হযরত শাহ কামাল তাদের একজন ছিলেন।

[১১৭]বশিরহাট মহকুমা নোয়াখালী জেলায় অবস্থিত।

হযরত পীর গোরা সাঈদ (র.)

হযরত আব্বাস আলী মক্কী (র.) ওরফে গোরাচাঁদের অন্যতম শিষ্য, পীর গোরা সাঈদ (র.)। তিনিতাঁর ওস্তাদ গোরাচাঁদকে ইসলাম প্রচারে একান্ত ভাবেই সহযোগীতা করেছিলেন। রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায় তাকে বহু বিঘা জমি পীরোত্তর দান করেন। তার জন্ম তারিখ, স্থান, মৃত্যু কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। সোহাই গ্রামে তাঁর দরগাহ আছে।

হযরত শাহ্শরীফ জিন্দানী (র.)

ইসলামের মহা তাপস, অলি-আল্লাহ শাহ্শরীফ জিন্দানী(র.)। ১৫২০ খৃস্টাব্দে সুলতান নসরতশাহ্র রাজত্বকালে বাগদাদের জিন্দানশহরের অধিবাসী শাহ্শরীফ জিন্দানী। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্যে আসেন। এবং সেখানেই তিনি খানকাহ তৈরি করেন। নুসরত শাহ ছিলেন বাংলার সুলতান হোসেন শাহর পুত্র। তিনি পাবনার নওগাঁয় ইসলাম প্রচার করেন।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে নওগাঁর অমুসলিম রাজা ছিলেন ভান সিংহ। তিনি ছিলেন জমিদার হিন্দু রাজা। ভীষণ অত্যাচারীও ছিলেন তিনি। নওগাঁর হিন্দু তীর্থস্থান করতোয়ায় চৈত্র মাসে অষ্টমী ও নবমীতে গঙ্গাস্নান ও বিজয়া দশমীর আয়োজন করা হতো।

কিংবদন্তীতে আছে,

একদা রাজ বাড়ীতে পূজা পালন হচ্ছিল। হযরত শাহ্শরীফ জিন্দানী সেই পূজা মন্ডপে উপস্থিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, " কিসের এত আয়োজন? " পূজারী বললেন, "দেবীর পূজা হচ্ছে।" শরীফ জিন্দানী বললেন, " এ কেমন কথা, পূজা হচ্ছে অথচ মূর্তি কিছু খাচ্ছে না? "পুরোহিত জবাবদিলেন, "পাথরের মূর্তি খায় না, সে নিরীক্ষণ করে মাত্র।"

হযরতশরীফ জিন্দানী বললেন," না; সে খাবে।"

হযরত মূর্তিকে খেতে আদেশ দিলেন, মূর্তি মুহূর্তেরমধ্যে খেতে শুরু করল। এরূপ অলৌকিক[১১৮] দৃশ্য অবলোকন করে পুরোহিতরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। বেশ কিছু আবার পালিয়ে গিয়েছেলেন। তারা ভান সিংহের নিকট যেয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন,

[১১৮]নবী-রাসূল থেকে অলৌকিক কান্ড প্রকাশিত হলে মুযিজা এবং ওলী থেকে প্রকাশিত হলে কারামত বলা হয়।

রাজা সৈন্য দল পাঠালেন, কিন্তু তারাও দরবেশের কথায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

মহান আল্লাহ পাকের দেয়া শক্তিকে উপেক্ষা করার শক্তি কারো নেই। রাজা অনেকটাই বিপদে পড়ে গেলেন। একদিন বজরা নৌকায় চড়ে রাজবাড়ির খিড়কীর পুকুরে স্ব-পরিবারে আত্মহত্যা করেন। এ সংবাদ শুনে রাজার দুই ছেলেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এবং রাজকুমারদ্বয় দরবেশকে একহাজার বিঘা সম্পত্তি দান করলেন।

নওগাঁ মসজিদটি শাহ্শরীফ জিন্দানী নির্মাণ করেন বলে ধারণা করা হয়। ১৫২৬ খৃস্টাব্দে ২১ এপ্রিল এই মসজিদটি তৈরি হয়। কেউ বলেন, সুলতান নুসরৎশাহ এই মসজিদটি অর্থদান করেছিলেন। মসজিদটি একটি বড় গম্বুজ ও চারকোণে চারটি ছোট গম্বুজ রয়েছে। প্রধান গম্বুজটি ২৬ ফুট। বাইরের দৈর্ঘ্য ৫০ফুট, প্রস্ত সাড়ে ৩৩ফুট, উচ্চতা ২২ফুট।

শরীফ জিন্দানী অত্যন্ত কামেল পীর ছিলেন।তাঁর কারামতের নানা প্রমাণ নানা সময়ে পাওয়া যায়। পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার তাড়াশ থানার নওগাঁ গ্রামে (নওগাঁ করতোয়া নদীও বটে)[১১৯] বিখ্যাত সাধক হযরতশাহ্ শরীফ জিন্দানীর মাযার আছে।মাযারটি প্রথমে খোলা আকাশেরনিচে থাকলেও ১৯৭২ সালে মাজারটি সংস্কার করা হয়।

হযরত বাবা আদম কাশ্মীরী (র.)

দিল্লীর বিখ্যাত সূফী শায়খ সলীম চিশতীর শিষ্য ছিলেন বাবা আদম কাশ্মীরী (র.)। কথিত আছে, চল্লিশ জন শিষ্য ও সহচরসহ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে টাঙ্গাইলে আটিয়াও শেরপুরে কেন্দ্র স্তাপন করেন। বাদশা আকবরের রাজত্বকালে মুঘল সেনাপতি সাঈদখানপন্নীর সাথে বাংলাদেশে আগমন করেন। জনমনে, তিনি বাবা নামে প্রসিদ্ধ। টাঙ্গাইলের আটিয়াও শেরপুরে ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আটিয়া গ্রামেই হযরত শাহ আদম কাশ্মীরী(র.)এর মাযার অবস্থিত।তাঁর ভাগিনা বিখ্যাত সূফী শাহ জামাল।[১২০] মামাকে খুঁজতেই তিনি টাঙ্গাইলের বহু জায়গায় ঘুরে বেড়ান। হযরত বাবা আদম কাশ্মীরী এর

[১১৯]বর্তমানে নদী মৃত প্রায়।

[১২০]খুব সম্ভব সূফী শাহজামাল জামালপুরে শায়িত আছেন। তার নামানুসারে জামাালপুর জিয়া হয়েছে।

মাযারের পাশে রয়েছে, হযরত সাদুল্লাহ বন্দেগী(র.) এরমাযার। তিনি ছিলেন বাবা আদমের অন্যমত শিষ্য ও সহচর। গুরু ও শিষ্য গভীর ভালবাসায় আবদ্ধছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে জনগণ বাবার মাযার জিয়ারত করতে এসে গভীর শ্রদ্ধার সাথে সাদুল্লাহ বন্দেগীরমাযার জিয়ারত করেন। আটিয়ার দরবেশদের মধ্যে তিনি সর্ব প্রাচীন ও বিখ্যাত। ৯১৩ হিজরী সালে বাবা আদম কাশ্মীরী পরলোক গমন করেন। তাঁরমাযার আজো ও সকলের কাছে পরম শ্রদ্ধার।

হযরত খান জাহান আলী (র.)

খান জাহান আলী (র.) এর প্রকৃত নাম হযরত উলুগ খান- ই- জাহান বা খান জাহান আলী। যশোহর ও খুলনা অঞ্চলের নাম উচ্চারণ করলেই ইসলামের মহান সাধক ও সেবক খান জাহান আলী (র.) এর কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। তিনি যশোহর ও খুলনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন । তিনি নিজে ইসলাম প্রচার করেই শুধু ক্ষান্ত হয়নি, পাশা-পাশি তাঁর শিষ্যদের কেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। খান জাহান আলী বহু কাল পর্যন্ত ইসলাম প্রচারও জনহিতকর কাজে নিয়োজিত ছিলেন। যশোর অঞ্চলের জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, যশোরের অতি প্রাচীন নগরী "বারোবাজারে" আগমন করেন। সেখানে তিনি একটি মসজিদ নির্মান করেন। মসজিদটি আজো বর্তমান আছে।[১২১]

খানজাহান আলী অত্যন্ত খোদাভীরু লোক ছিলেন। সর্বদা আল্লাহ প্রেমে মশগুল থাকতেন। তাঁর ধর্ম পরায়নতা, সততা, চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে অসংখ্য হিন্দু,বৌদ্ধ লোক শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ইসলাম প্রচারে আমরণ কাজ করে ছিলেন। তাঁর অসংখ্য শিষ্যদের মধ্যে বাহরাম শাহ গরীব শাহ অন্যতম। তাঁর প্রধান শাগরিদ পীর আলী পূর্বে হিন্দু ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় মোহাম্মদ তাছির। তিনি বহু ব্রাহ্মণ কে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে। তারা ঐ অঞ্চলে "পীরালী ব্রাহ্মণ" নামে আজো পরিচিত।[১২২]

---

[১২১] হোসে উদ্দীন হোসেন, "যশোরাদ্য দেশ", পৃ. ৭৫

[১২২] চৌধুরী শামসুর রহমান, "পূর্ব পাকিস্থানে ইসলামের আলো", পৃ.৯৬

খান জাহান আলীঅসংখ্য জনহিতকর কাজ করেছিলেন,যেমন: তার মধ্যে রাস্তা তৈরি, দীঘি খনন ও মসজিদ নির্মাণ। তাঁর অসংখ্য শিষ্য দুইটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একদল কপোতাক্ষ নদের তীর বেয়ে সুন্দর পর্যন্ত চলে যায়। অন্যদল চলে যায় পয়গ্রাম কসবায়। শিষ্যগণ গুরুর আদেশকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করতে। জনগণের পানির কষ্ট লাগবের জন্য খাল খনন করেন। খানপুর ও বিদ্যানন্দ কাঠিতে রাস্তা নির্মাণ এবং আটার অঞ্চলে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ ও নির্মাণ করেছিলেন। এছাড়া হাজী দীঘি ও সরল গ্রামে একটি বিশাল দীঘির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। খান জাহানের শিষ্যগণ সেগুলো তৈরি করেছিলেন। দক্ষিণ বঙ্গে বিশেষত যশোর খুলনায় খান জাহানের কীর্তি সমূহ আজোও কথা বলে। তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে ইসলামের প্রদীপ প্রজ্জলিত করেছিলেন।

খান জাহান খাঞ্জেপুর নামক স্থানে সর্বপ্রথম আস্তানা করেছিলেন। নদীর পাশেই নির্মাণ করেছিলেন তাঁর বাসস্থান, দরবার শরীফ, এবং মসজিদ। খান জাহান আলী সেখানে একটি শহর ও তৈরি করেন, তার মাঝখান দিয়ে একটি রাস্তা তৈরি করেছিলেন।[১২৩]

হিজরী ৮৬৩ সালে ২৬ জিলহজ্জ বুধবার রাত্রে তিনি পরলোক গমন করেন। ২৭ তারিখ তাকে সমাহিত করা হয়। শিলালিপির উল্লেখিত তারিখ থেকে জানা যায়, তিনি ১৪৫৮ খৃস্টাব্দেইন্তিকাল করেন। খুলনা জেলায় বাগেরহাটে তাঁর সমাধি অবস্থিত।

হযরতশাহ্আলী বাগদাদী (র.)

বাগদাদ থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে, একশজন দরবেশ নিয়ে মাত্র ২০ বছর বয়সে যিনি দিল্লীতে আসেন, তিনি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় হযরত শাহ আলী বাগদাদী ।[১২৪]দিল্লী থেকে প্রথমে ফরিদপুর ও পরে ঢাকায় ইসলাম প্রচার করার জন্য আগমন করে।তাঁর পিতার নাম শাহ ফখরুদ্দীন (র.)। ঢাকায় ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর সঙ্গীগণ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন।**শাহ্**আলী বাগদাদী বাগদাদে জন্মগ্রহণ

---

[১২৩]এ.এফ.এম. আব্দুল জলীল, " হযরত খান জাহান আলী," খুলনা, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৯ পৃ. ৩৩-৩৪

শেখ আবদুল আজিজ, "পীর খান জাহান আলি সাহেবের জীবনী" বাগেরহাট ১ম মুদ্রণ ১৯৬৬।

[১২৪]ড গোলাম সাকলায়েন এর মতে, হযরত শাহ আলী বাগদাদী (র.) এর উত্তরপুর"ষ জনাব সৈয়দ আলী আশরাফ এর কাছ থেকে প্রাপ্ত ফার্সী ও উর্দূ পান্ডুলিপি, এ পান্ডুলিপি দুশো বছরের পুরাতন বলে তিনি মনে করেন।

করেছিলেন। তাই তাঁর নামের সাথে বাগদাদী শব্দটি যুক্ত করা হয়। ৮৯৫ হিজরী (১৪৮৯খৃস্টাব্দ) তিনি বাংলাদেশে আগমন করেন।[১২৫] ৮৩৮ হিজরী (১৪১২) খৃস্টাব্দ তিনি দিল্লীতে আসেন। শুধুমাত্র ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে। দিল্লীতে তখন সৈয়দ বংশের রাজত্ব চলছিল। তিনি সৈয়দ বংশে বিবাহ করেন। **শাহ্**আলী একপুত্র সন্তানের পিতা হন। তাঁর নাম**শাহ্**উসমান।তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে উসমানতাঁরগদিতে বসেন।

কথিত আছে, হযরত **শাহ্**আলী বাগদাদীর বংশধরদের কিছু মুর্শিদাবাদের"ফতেহ আবাদ" নামক স্থানে এবং অন্য একদল ফরিদপুরের গের্দায় বসতি স্থাপন করেন। হযরত **শাহ্**আলী বাগদাদী গের্দা গোত্রের। অত্যন্ত খোদা প্রেমীক ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। ঢাকায় এসে তিনি **শাহ্** মুহাম্মদ বাবু (র.)এর কাছে চিশতীয়া তরীকায় মুরীদ হন। ওস্তাদের কাছ থেকে ইসলাম প্রচারে আদেশ পান।

হযরত**শাহ্**আলী বাগদাদী বাংলাদেশে এসে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। তিনি ঢাকার প্রায় আট মাইল উত্তর পশ্চিমে মীরপুর এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। বর্তমান মীরপুর তখন বনজঙ্গল ঘেরা একটি গ্রাম ছিল।**শাহ্**বাগদাদী(র.)একশ বছর জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়। ঢাকা গেজেটিয়ারের সংকলক বি.সি.এলেন এর মতে, **শাহ্** আলী ১৫৭৭ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[১২৬] ঢাকার মিরপুরে তাঁর মাযার অবস্থিত।

হযরত**শাহ্** আলী বাগদাদী(র) এর মৃত্যু সম্পর্কে "ঢাকা কালেক্টরী" যে বিবরণ আছে, তা হল:

হযরত **শাহ্** আলী বাগদাদী ছিলেন ভীষণ খোদা প্রেমিক দরবেশ। সর্বদা খোদার প্রেমে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। ঠিক তেমনি ভাবে তিনি ৪০দিনের জন্য হুজরা ঘরে সাধনায় মগ্ন হলেন।মুরী দদের হুকুম করে গেলেন, ৪০দিন গত না হওয়া পর্যন্ত কোন কারণেই যাতে ঘরের দরজা খোলা না হয়। ৩৯ দিন পার হওয়ার পর হুজরা ঘরের ভিতর থেকে করুণ আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। সহ্য করতে না পেরে মুরীদরা দরজা ভেঙ্গেফেললেন। দেখা গেল, সমস্ত ঘর রক্তে রঞ্জিত। দরবেশ মৃত। ঘর খোলার পূর্বে যে আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল, ঘরের

[১২৫]East Pakistan District Gazetteers, Dacca, 1969, p-98
[১২৬]Eastern Bengal Distrit Gazetteers, Dhaka, 1912,pp 1-65

দরজা খোলার পর সেই শব্দ ও বন্ধ হয়ে গেল। তখন সবাই মিলে মৃতদেহ সেই স্থানে কবর দিল। হযরত **শাহ্** আলীর বংশধর আজও জীবিত আছেন।

হযরত**শাহ্** আলী বাগদাদী(র.)এর বিবরণ "কুরসীনামা" এবং শেখ মোহারুল হক লিখিত হযরত **শাহ্** আলী বাগদাদী (র.) ছেলে শাহ উসমান (র.), **শাহ্** হাকীমে উত্তর পুরুষ শাহ হাফিজ। তাঁর বংশধরদের একজন **শাহ্** হোসেন তার ছেলে হাবীব ফরিদপুরে বসতি স্থাপন করেছেন। এছাড়া মাকরাইল ও আলোকদিয়ায় তাঁর কিছু ঐতিহ্য রয়েছে।[১২৭]

হযরত মাওলানা কারামত আলী (র.) জৌনপুরী

ভারতের উত্তর প্রদেশ জৌনপুর। মাওলানা কারামত আলী ছিলেন জৌনপুরের অধিবাসী। তাঁর ওস্তাদ বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক আন্দোলনের প্রবর্তক সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (১৭৮২-১৮৩১) । কারামত আলী জৌনপুরী ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্ব। তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।[১২৮] যুদ্ধবিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন তিনি। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবূবকর (রা.) উত্তরপুরুষ। মাত্র ১০ বছর বয়সে পাক কুরআন পাঠ শুরু করেন। বাল্যকাল থেকে অত্যন্ত মেধাবী ও ভাবুক স্বভাবের ছিলেন। তিনি গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায়তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। ২০বছর বয়সে উর্দু ভাষায় রচনা করেন "মিফতাহুল জান্নাত বা বেহেশতের চাবী" গ্রন্থটি। পরবর্তীতে গ্রন্থটি ১৮টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ে আরো ৪২টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তিনি।

পূর্ববঙ্গ, আসাম ও উত্তরবঙ্গে ইসলাম প্রচারে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরির ভূমিকা অপরিসীম। ইসলামের মর্মবাণী প্রচারে তার সমতুল্য কেউ ছিল না। ওস্তাদের নির্দেশ মত তিনি যখন সংস্কার কার্যে অংশ গ্রহণ করতেন, বার বার তাঁর বিরুদ্ধেবাদীরাতাঁর প্রাণ নাশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি গাজীপুর, ফয়জাবাদ, সুলতানপুর ও জৌনপুরে অনেক সংস্কার মূলক কাজ করেছিলেন। পরবর্তীতে কলকাতা থেকে খুলনা, যশোর, বরিশাল,

[১২৭]১মাসিক দিলরুবা, ১ম বর্ষ, ভাদ্র ১৩৫৬/৫সংখ্যা পৃ. ৩৪৬-৩৪৮

[১২৮]বিখ্যাত মাযহাবের সংখ্যা ৪টি যথা-হানাফী সাফিই মালেকী ও হাম্বলী।। মাওলানা কারামত আলী হানাফী মতাবলম্বী ছিলেন।

চট্টগ্রাম, সন্ধীপে , ঢাকা, সিলেট ও আসামে ইসলামের সংস্কার সাধনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন।[১২৯]

আসামে ইসলাম প্রচার করতে যেয়ে দেখেন, সেখানকার অবস্থা নগ্নপ্রায় মুসলমান। তিনি তাদের খিদমতে বিনা পয়সায় পোশাক পরিচ্ছদ, টুপি বিতরণ করেন। তাঁর এই চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বহু অমুসলমান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। একান্ন বছর ধরে বাংলাদেশ ও আসামে ইসলাম প্রচার ও ইসলামের সংস্কারমূলক কাজ পরিচালনা করেন। অবশেষে হঠাৎ তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে ১২৯০ খৃস্টাব্দে রবিউসানি মাসে ইন্তিকাল করেন। তাঁর এক মাস পরতাঁরস্ত্রী ইন্তিকাল করেন। রংপুরের মুনশীপাড়ায় তাকে সমাহিত করা হয়। সেখানে একটি মসজিদ ও নির্মাণ করা হয়েছে। রংপুর জেলা ছিল তাঁর কর্মস্থান।আজও হাজারহাজারভক্ততাঁর মাযার জিয়ারত করতে আসেন। কারামত আলীর সুযোগ্য পুত্র, মাওলানা হাফিজ আহমদ তার পিতার মৃত্যুর পর সংস্কার মূলক অনেক কাজ করেছেন। তাইতো Murray Titus বলেন,

His work has been Carried on by his son Moulvi Hafiz Ahmed, Who died in 1898, and by his nephew, Muhammad Mohsin: and there are certain disticts in the provice (Bengal) where his influence is still a living force.

মাওলানা কারামত আলীর কয়েকটি স্মরণীয় বাণী

১.মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে মানুষের জীবনে নেতা মনোনীত করে, শরীয়া ভিত্তিক জীবন যাপন করবে।

২.কোন লোক যখন খারাপ কাজে লিপ্ত হয় তখন তাঁর সমস্ত পরহেজগারী চলে যায়।

৩.পূণ্য কথা, দান-খয়রাত অপেক্ষা উত্তম।

৪.দুনিয়া ছায়ার ন্যায় এবং আখিরাত সূর্যের ন্যায় ।

৫.সমস্ত কথা ও কাজে ভাল মন্দ সন্ধান করা বান্দার একান্ত উচিত।

---

[১২৯]মাওলানা কারামত আলী দৌনপুরী তাঁর উস্তাদ সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাথে মিলিত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। উস্তাদ সৈয়দ আহমদ বেরলভী তাকে অসীম যুদ্ধ ত্যাগ করে মশীরু যুদ্ধে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিলেন এবং তাঁকে পূর্ব বঙ্গ ও আসামে ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করার আদেশ দেন মাওলানা কারামত আলী গুরুর পরামর্শ মুতাবিক কাজ করেন। তার ধর্ম প্রচার ছিল সুশৃঙ্খল তিনি বহু লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন।

৬.তরীকা হলো মানুষের পবিত্রতার জন্য এবং তার ভুল ত্রুটি সংশোধনের জন্য।

৭.যিকর করার উদ্দেশ্য হৃদয়ের শক্তিলাভ ও আল্লাহ তাআলার মুহাব্বাত লাভ করা।

৮.অলৌকিক কার্যকলাপ পীরের মর্যাদার পরিচায়ক নয়।

৯.নামায মুমিন ব্যক্তির জন্য মিরাজ। এর দ্বারা বান্দা আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী মোকামে পৌঁছায়।

১০.অলী- আল্লাহদের মধ্যে কেউ কেউ দুনিয়া কবুল করেছেন, যাতে অন্য ব্যক্তিরা উপকৃত হতে পারেন।

হযরত শাহ আমানত (র.)

শাহ আমানত ছিলেন বড় পীর আবদুল কাদির জিলানী (র.) এর বংশধর। চট্টগ্রাম শহরের একজন বিখ্যাত দরবেশ । ধারণা করা হয় একশ বছরের বেশী তিনি জীবিত ছিলেন। শাহ আমানত অত্যন্ত সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। কাউকে তিনি বুঝতে দিতেন না তাঁরআধ্যাত্মিক কর্মতৎপরতার কথা। গোপন করে রাখতে নিজের ক্ষমতা কে। তিনি প্রথমে বিহার ও পরে চট্টগ্রামে আগমন করেন। তৎকালীন বিহার ছিল মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। অসংখ্য সূফী দরবেশদের আগমন ঘটেছিল সেখানে। ইসলাম প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন দরগাহ, খানকাহ, মসজিদ ইত্যাদি। শাহ আমানত অত্যন্ত বড় মাপের এক সূফী হয়েও স্থানীয় জজ কোর্টে ছোট একটি চাকরি নেন। যেখানে অনেকেই তাকে 'খান সাহেব' বা 'মিয়া সাহেব' বলে ডাকতেন। সমাজের গরীব ও অসহায় মানুষের জন্য ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। মহান আল্লাহ পাকের ইবাদতে মনকে বিভোর করে রাখতেন। কথিত আছে যে, তিনি ইংরেজ শাসনামলের সূফী ছিলেন। আব্দুল ওহাব নামক জজকোর্টের এক উকিল হযরত আমানত শাহের আশির্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে আব্দুল ওহাব নিজ গ্রাম পটিয়ায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদটি আজো বর্তমান আছে।[১৩০]

চট্টগ্রামের লালদীঘির পূর্বদিকে শাহ আমানত(র.)এর কবর মোবারক। সেখানে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

[১৩০]Dr. Abdul Karim, " Social History of the Muslim in Bengal," Dhaka 1959, Page 103-109

হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজমপুরী (র.)

সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী ছিলেন, হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর পীর ভাই এবং হযরত আহমদ বেরেলভীর ছাত্র। তিনি নিজ ওস্তাদের সাথে বালাকোটে যুদ্ধে যোগাদান করেছিলেন। কিন্তুতাঁরওস্তাদ সেখানে শহীদ হলেন। দেশে ফিরে এলেন তিনি। যথেষ্ট অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। চিরকুমার এই সূফী দরবেশের কাছে কলকাতার অসংখ্য মুসলমান মুরীদ হন। আবূ বকর সিদ্দিকী ফুরফুরায়ী (র.) চট্টগ্রামের আমানত শাহ, মাইজভান্ডারের সৈয়দ আহমদুল্লাহ ও তাঁরশিষ্যত্ব লাভ করেছিলেন। সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী ঢাকার চকবাজার মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে চির নিদ্রায় শায়িত আছেন।

হযরত মাওলানা আবূ বকর সিদ্দিকী (র.)

হযরত মাওলানা আবূ বকর সিদ্দিকী (র.) ছিলেন ফুরফুরা[১৩১] শরীফের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সূফী। তিনি প্রতিষ্ঠিত পীর বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্জ আবদুল মুকতাদের ও মাতার নাম মুসাম্মৎ মুহবতুন্নেসা। আবূ বকর সিদ্দিকী ছিলেনতাঁরবাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। তিনি ইসলামিক জ্ঞানের পাশা-পাশি অন্যান্য বিষয়ে, গভীর জ্ঞান রাখতেন । তাঁর চরিত্র ছিল মাধুর্য পূর্ণ। এজন্য সকলেই তাকে ভালবাসতেন।তাঁর জ্ঞানের বিশালতা এত বেশি ছিল যে, তার সমকক্ষ হতে সামর্থ হয়নি কেউ। তিনি মারেফাতের চিন্তায় বিভোর থাকতেন। সর্বদা খোদা প্রেমে নিজেকে বিলীন করে দিতেন। সংসার ধর্ম তাকে ততটা আকৃষ্ট করতে পারেনি।আবূ বকর সিদ্দিকী (র.)এর স্ত্রী,পুত্র, কন্যা সব থাকা সত্বেও তিনি ফকীরের ন্যায় জীবন যাপন করতেন।[১৩২]

জানা যায়, পার্থিব কোন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তিনি রাতেরআঁধারে নির্জন জায়গা অথবা কোন গোরস্থানে বসে ধ্যান মগ্ন থাকতেন। যিকর করতেন, ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন ছিলেন। তবে এটাও ঠিক যে তিনি কেবল আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন ছিলেন

---

[১৩১]ফুরফুরা শরীফের মর্যাদা এখানে যে, পশ্চিম বাংলার এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ফুরফুরা। চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়া থেকে এখানকার সূফী সাধক ও দরবেশ মৌলভী ও মাওলানাগণ ইসলাম প্রচারের মহান কাজে বংশ পরম্পরায় নিযুক্ত আছেন। তারা মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ তৈরি করতেন, ধর্মোপদেশ দিতেন পথভ্রষ্ঠকে। শিক্ষা, প্রচার ও আধ্যাত্মিক সাধনার পথে দিশারী ছিলেন। সামগ্রিকভাবে, জাতি, ধর্ম, ও সমাজ সেবার কাজে ফুরফুরা পীর দরবেশগণ এক উলেণ্ঢখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছেন।

[১৩২]মুহম্মদ বাকি বিল্লাহ সিদ্দিকী,'ফুরফুরার পীর সাহেব(র.) এর জীবন চরিত' কলকাতা, বি.এন,প্রেস পৃ. ৫২
মাসউদ অর রহমান (হুগলী) এর "মুসলিম তীর্থ ফুরফুরা শরীফ", কলকাতা ১৯৮৪, ১ম প্রকাশ পৃ.৫২

না। দেশের ও সমাজের নানা জনহিতকর কাজ করতেন। মানুষকে ইলমে মারেফাতের জ্ঞান দান করতেন।

বাংলাদেশ, আসাম ছাড়াও সৌদি আরবের অসংখ্য নারী পুরুষকে বাতেনী ইলম শিক্ষা দিতেন। ইসলামের বিভিন্ন তরীকার জ্ঞান দিতেন মানুষকে তবে সেটা একই ধারায় নয়। যারা বেশি সময় দিতে পারত অর্থাৎ শিক্ষিত লোকরেদকে শিক্ষা দিতেন নকশ্‌বন্দিয়া ও মুযাদ্দেদিয়া তরীকা এবং বাকীদেরকে দীক্ষা দিতেন চিশ্‌তিয়া ও কাদেরিয়া তরীকার। জনগণের মধ্যে বাতেনী জ্ঞানের আলো বিচ্ছুরিত হোক এটাই তিনি মনে প্রাণে চাইতেন। এজন্য অনেকের মাঝে "পীর সাহেব কেবলা" নামে ও পরিচিত। ফুরফুরার অনেকে তাকে "দাদাপীর" বলে ডাকেন।

আবূ বকর সিদ্দিকী (র.) সকল প্রকার অহংকার হিংসা, ক্রোধ-মোহ, ধনদৌলতের মোহকে পরিহার করে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনার জন্য সারা জীবন তালিম দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, সকল প্রকার বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করে দেহ মনে পবিত্র হয়ে ইবাদত করলে তা সুফল হবে। সত্যিকার ঈমানদার হতে পারবে। সাধনার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে হলে বাতেনী ইলমের পদ্ধতি গুলোকে ক্রমান্বয়ে রপ্ত করতে হবে। তরীকা পন্থী পীরদের হাতে বায়াত গ্রহণ করে "বাতেনী ইলমে" কামালিয়াত লাভ করা যায়। সত্যিকার ঈমানদারদের অন্তরে নূরের প্রকাশ পায়। তিনি আরো বলেন, ঈবাদতের সময় নিরবতা পালন করার কথা। মনে প্রাণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল চিত্তের। সত্যকে প্রতিষ্ঠায় বজ্র কঠোর।

কথিত আছে যে, আবূ বকর সিদ্দিকী (র.) দেশের অরাজকতা, দু:খ, অশান্তি দূর করার লক্ষ্যে কলকাতার ওয়েলিংটনে বক্তব্য দেন। এতে দেশের অশান্তি দূরীভূত হয়। পরবর্তীতে তার এ বক্তব্য সপ্তম এডওয়ার্ড কর্তৃক বিলাতে পঠিত হয় এবং হিন্দুস্থানের যে কোন জায়গায় সভা করার অনুমতি এবং তাতে বাঁধা দেয়ার নিষেধাজ্ঞা জারি করে "সনদ" প্রদান করা হয়েছিল। তাছাড়া ইসলামের সেবায় নানা রকম জনহিত কর কাজ করেছিলেন। তাঁর শিষ্যদের তিনি কেবল "বাতেনী ইল্‌ম" শিক্ষা দিয়েই থেমে যাননি। তিনি রাজনীতি, সমাজনীতি, সংহতি রক্ষা, বিয়ে-শাদী, শরীয়ত অনুযায়ী জীবন যাপনের বাস্তবধর্মী শিক্ষাও

তিনি ভক্তদের দিয়ে ছিলেন। আবূ বকর সিদ্দিকী (র.) যথেষ্ট আধুনিক ও ছিলেন। ইহকাল ও পরকালকে পৃথক না করে, সমান গুরুত্ব দিতে হবে। প্রতিবেশীদের প্রতি তাঁর যে দায়িত্ব তা তিনি পুরোপুরি পালন করতেন। সবাই তাকে ভালবাসতেন। ধনী গরীবের কোন পার্থক্য তিনি কখনো করেনি। কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখে সেবা করা, এসকল ব্যাপারেই তাঁর ছিল উদার চিত্ত। বিচারের ক্ষেত্রে ও তিনি সত্য ও ন্যায় বিচার করতেন। কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করতেন না। মানুষকে দীনের শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ তায়ালার পথে নিয়োজিত করাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য। সবার জন্য তিনি মহান আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করতেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দিকী (র.) পরিধেয় বস্ত্র ছিল ফতুয়া (সুতী) পায়জামা, গোল টুপি, পায়ে পামশুজুতা কিন্তু ওযু করার সময় চটি জুতা বা খড়ম ব্যবহার করতেন। অতি বৃদ্ধাবস্থায় ও চশমা ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত করতেন। অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন করতেন তিনি। ঠিক সময়ে নামায, ওজিফা, ভক্তদের শিক্ষা দান, সর্ব সাধারণের আবেদন, দু:খ, কষ্টের কথা শোনা, তাহাজ্জুত পড়া, ফকীর মিসকিনদের দান করা, তাদের কষ্ট লাগব করা এরূপ নানাবিধ কাজ তিনি নির্ধারিত সময়ে করতেন। শবে বরাত, শবে মিরাজ, শবে কদর,এসব গুরুত্ব পূর্ণ দিন সারারাত জেগে ইবাদত বন্দেগী করতেন।

হযরত আবূ বকর (র.) ছিলেন মহা পন্ডিত। বাতেনী ইলমের পূর্ণ জ্ঞানতাঁরছিল বলে তাকে "মুজাদ্দিদ" বলা হয়। "মুজাদ্দিদ" হলো "মহা পন্ডিত"। জাহিরী ও বাতেনী ইলমের অধিকারী। তিনি ফুরফুরা গ্রামে মক্তব, মাদরাসা, গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস এবং ভক্তগণের জন্য "দায়রা শরীফ" প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন।[১৩৩]

হযরত আবূ বকর সিদ্দিকী (র.) এর সংসার স্ত্রী-পুত্র সবই ছিল। তাঁর ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন হলেন-

হযরত মাওলানা আলহাজ্জ আবদুল হাই সিদ্দিকী

হযরত মাওলানা আলহাজ্জ আবূ জাফর সিদ্দিকী

হযরত মাওলানা আবদুল কাদের সিদ্দিকী

হযরত মাওলানাআলহাজ্জ জুলফিকার আলী সিদ্দিকী

[১৩৩]মুহাম্মদ বাকিবিল্লাহ সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত পৃ: ৩৮-৩৯

হযরত মাওলানানজমুস শাহাদৎ সিদ্দিকী

সমাজে ইসলামের শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন তিনি। অবশেষে তিনি ফুরফুরায় চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন। তার মৃত্যু সম্পর্কে একটি পত্রিকায় বলা হয়েছে।

The Death occured yesterday morning at Furfura, At the age of ninety of his holiness, Hazrat Moulana Shah Sufi Hazi Mohammad Abu Bakar Siddiqia,a great Muslim divine and the spiritual guide of large number of Muslims in this country. The Moulana's name was a household world in Bengal. He was the founder of many Schools, Madrashas, Mosques, dispensaries and other charitable institution. By his Piety and benevolence he endeared himself to large Number of people of this Province Inespective of class or community.[134]

হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.) ভক্তদের উদ্দেশ্যে যা বলে গেছেন তা হল:

- সবাই কালেমা তৌহিদের উপর কায়েম থাকবেন।
- নবী(সা.) কে মান্য করবেন; কারণ তিনি শেষ নবী।
- শরীয়ত অনুসারে পোষাক পরবেন
- মেয়েদের মাথার চুল কাটবেন না; এটা নাজায়ে কাজ।
- মেয়েদের পর্দায় রাখতে হবে।
- নাজাতের একমাত্র পথ শরীয়ত ও তরীকত।
- পীরকে হাজের নাজের জানা শিরক।
- পূজা, মেলা ও তিহারে চাঁদা দেওয়া নিষেধ। ঈমান নষ্ট হবার ভয় আছে।
- হালাল চাকরি গ্রহণ করবেন। সাবধান হারাম চাকরির পয়সা হারম।

[১৩৪]The statesman, Saturday, 18 March, 1939.

- মেয়েদেরকে পুরুষের পোশাক পরাবেন না; এবং পুরুষদেরকে মেয়েদের পোশাক পরানো নিষিদ্ধ
- কেউ জমি কট বন্ধক রাখবেন না, কেউ সুদ খাবেন না, জুলুম করবেন না।
- কবর দোয়া পানি পান করা হারাম, কবর ধোয়ানো নিষেধ।
- পুত্র কন্যাদের দীনের ইলম শিক্ষা দিবেন।
- সুদখোর, ঘুষখোর মদ্যপায়ী, জেনাকারী ও ফাসিকের দাওয়াত গ্রহণ করবেন না।
- তাকওয়া ও পরহিজগারী যথাসাধ্য করবেন।
- মানুষের হকের দিকে খেয়াল রাখবেন, কারো হক নষ্ট করবেন না।
- যা উপার্জন করবেন, তিনভাগ করবেন একভাগ জমা রাখবেন, একভাগ দান খয়রাত করবেন, একভাগ সংসারে খরচ করবেন।
- কবর, আস্তানায় সিজদা করা বা চুম্বন করা নাজায়েজ
- বেদায়াৎ থেকে সাধান হবেন।
- যিকির মুরাকাবা দুইবেলা সকাল সন্ধ্যা করবেন।
- জুমার খুতবার সময়, আযানের পর ও নামাযের আযানের পর হাত উঠিয়ে দোয়া চাইবেন, এটা সুন্নত। এচাড়াও তিনি ভক্তদের উদ্দেশ্যে নানাবিধ উপদেশ দেন।[১৩৫]

[১৩৫]মুহাম্মদ বাকিবিলণ্ঢাহ সিদ্দিকী সংকলিত ও প্রকাশিত, ফুরফুরা পীর সাহেব (র.) এর জীবন চরিত, হুগলী

অধ্যায় ৫

বাংলাদেশের ইসলামের কাঠামোগতরূপ

(ক) প্রাচীন বাংলাদেশে মুসলিমগণের পালনীয় বিধি বিধান ও ইসলাম

সুলতান ও স্বাধীন সুলতানী- আমলে বাংলাদেশের[১] জনগোষ্ঠী ছিল অমুসলিম ও মুসলিমদের নিয়ে গঠিত। মুসলমান ছাড়া অন্য সকলকেই সাধারণ হিন্দু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। হিন্দুরাই সংখ্যায় ছিল বেশি। এর মধ্যে আসলে বৌদ্ধ, কিছু জৈন আদিবাসী বা পাহাড়ী এলাকার লোকজন এবং কিছু পার্শী অগ্নিপুজক ছিল। ষোল শতক থেকে পর্তুগীজ এবং আর্মেনীয়গণও কিছু কিছু করে বসাবাস করতে থাকে।[২] সেকালে জনসংখ্যার জরিপ জরিপ না হলেও মোটামুটি জানাযায় যে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে মহামন্বন্তরের আগে হিন্দু ও মুসলমানদের মিলিত জনসংখ্যা ছিল আড়াই কোটির ওপর। এর ভেরত এক কোটি চল্লিশ লক্ষ্যের ওপর ছিল হিন্দু এবং প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ্যের মত ছিল মুসলমান। এছাড়াও ছিল এনিমিস্ট বা সর্বপ্রাণবাদিগণ[৩] ও অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠী যাদের মিলিত সংখ্যা চার লক্ষ।

বাংলাদেশের মুসলমানদের ভেতর ছিল বহিরাগত মুসলমান এবং দেশীয় ধর্মান্তরিত মুসলমান। বহিরাগতদের মধ্যে তুর্কী, আফগান, মোগল, ইরানি এবং আরবিয়গণই ছিল প্রধান। এছাড়া কিছু ওসমানি (তাও তুর্কী?), আবিসিনিয় এবং অন্যান্য মিশ্র অধিবাসীও ছিল। ১৫৭০-এ বহিরাগত মুসলমান ধরা হয় ২৯.৬ ভাগ এবং ধর্মান্তরিত দেশীয় ধরা হয় ৭০.৪ ভাগ। একইভাবে ১৭১৭০-এ ৪০ লক্ষের মত স্থানীয় ধর্মান্তরিত।

বাংলার মুসলিম শাসনামলে দেশীয়া মুসলমানদের ভেতর বা বাহ্মণ থেকে শুরু করে চা ল পর্যন্ত ছিল। সমাজের নিচু স্তরের লোকেরাই বেশি ইসরাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল বলে জানা গেলেও, ধর্মন্তরিতদের একটা অংশ ছিল মিশ্র রক্ত ও হিন্দু উচ্চস্তরের লোকজন।

---

[১] বাংলাদেশ বলতে বর্তমান সীমারেখার বাংলাদেকে বুঝানো হয়েছে।

[২] ব্যাবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্য পর্তুগীজ ও আর্মেনীগণ এসে এদেশে বসবাস করতে থাকে।

[৩] সব কিছুর মধ্যে স্রষ্টা বিদ্যমান।

বহিরাগত বহু মুসলামন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ রমণী বিয়ে করেন। ইলিয়াস শাহ এক সুন্দরী বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা বিয়ে করেন বলে কথিত। কবি মোহাম্মদ খান-এর পূব পুরুষ ব্রাহ্মণ তরুণী বিয়ে করেছিরেন। বিজয় গুপ্ত জনৈক কাজীর উচ্চ বংশীয় হিন্দু নারী বিয়ে করার কথা জানিয়েছেন। ঈশা খাঁ শ্রীপুরের ব্রাহ্মণ জমিদার কেদার রায়-এর বোনা সোনামনিকে বিয়ে করেন। সোনামনির দুই পুত্র আবার কেদার রায়ের দুই কন্যা বিয়ে করেন। সমশের গাজীও ব্রাহ্মণ কন্যা বিয়ে করেছিলেন শোনা যায়। অমৃতকুম্ভ গ্রন্থ অনুযায়ী ভোজেরা ব্রাহ্মণ নামে জনৈক বেদান্ত জ্ঞানী ব্রাহ্মণ কাজী রকনউদ্দিন সমরকন্দির সংস্পর্শে এসে দর্শন আলোচনার মাধ্যমে ক্রমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[৪]

বাংলাদেশে এই ভাবে যে মিশ্র মুসলমান সমাজ গড়ে উঠেছিল তাতে শেখ সৈয়দ এবং উলেমারা ছিল বিশেষ ভাবে সম্মানিত। এরাই সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করতো। দ্বিতীয় স্তরে ছিল খান, মালিক, আমীর, সদর, কবীর, মারিফ ইত্যাদি। জমিদার, মুকদ্দম ও এমনি ধরনের চাকরি জীবীরা ছিল তৃতীয় স্তরে। আর চতুর্থ স্তরে ছিল ফকির সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদি। মঙ্গলকাব্যগুলো থেকে জানা যায় যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈশ্য, শূদ্র এবং মুসলমান তাঁতীসহ অন্যান্যদের বাসস্থান গ্রামে গ্রামে সুনির্দিষ্ট ছিল। শহরে সাধারণত উচ্চ শ্রেণীলর মুসলমানরা বাস করতো। বিদেশ থেকে আগত মুসলমানগণ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতো। থাকতো সাধারণত শহরাঞ্চলেই।

সাধারণভাবে সৈয়দ, শেখ, তুর্কি, মোগল, পাঠান প্রভৃতি বহিরাগত মুসলমানরা অভিজাত শ্রেণীভুক্ত হলেও এবং শিক্ষিতদের মধ্যে কাজী, মোল্লা, আলিম, সুফিসাধক, ফকির প্রভৃতি সমাজে মর্যাদাবান ও সম্মানিত হলেও বিদ্যা-ধন-মানের পরিবর্তনে সামাজিক মানেরও উন্নতি-অবনতি হতো। তাদের অবস্থাচ্যুত বংশধরগণ অতীত স্মৃতির পুঁজি নিয়ে কয়েক পুরুষ ধরে বাস্তব জীবনে মোড়লিপনা করতো। সৈয়দ, খনকার, মোল্লা, পুরুত, কায়স্থ, গোমস্তা, মুৎসুদ্দি ও ছোট বোনেরাই ছিল সে-যুগের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। নিরক্ষর সমাজে এদের চিল দোর্দম্ভ প্রতাপ। গ্রাম-সমাজে কর্তাব্যক্তি। তবে দরবারের বাইরে

[৪] সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ও ইসলাম কালিকলম প্রকাশনী ১৯৮৭ পৃ-২৩৮-২৩৯

রাজনীতি ছিল না বলে এদেরা কোন রাজনৈতিক ভূমিকা তেমন ছিল না। দেশে মুসলমানদের মধ্যে মুন্সি-মোল্লা খনকার-মৌলভী-কাজী-মুয়াজ্জিন উকিল এভং কুচিৎ কোনো সেনা সিপাই থাকলেও বড় চাকুরে বা দরবারের আমীর-উজির-লস্কর হতে পারতোা বলে জানাা যায় না। বড়পদে বহাল হত আরব ইরান ইরাক তুরান (তুরস্ক) ও উত্তর ভারত থেকে আগত মুসলমানরা।[৫] বৈষম্য ছিল দেশী- বিদেশীতে, ধনী-নির্ধনে, আশরাফে অতরাফ। সাধারণভাবে বিদেশী মুসলমানগণই ছিল আশরাফ। দেশীয়রা আতরাফ।[৬] আরবি-ফারসি উর্দু শিক্ষিত মুসলমানরা শহরাঞ্চলে বা প্রশাসনকেন্দ্রে বা করতো। গ্রামেগঞ্জে থাকতো অতিসামান্যই। মুখ্যত ধনই ছিল মানের মাপকাঠি।

ধন হোন্তে কুলীন হয়ত কুলীন
বিনি ধনে হয় না কুলীন মলিন।

সম্পদে গবিত ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে বলতে পারতো 'গত বছর জোলা ছিলাম, এবার শেখ হয়েছি, ফসল ভাল হলে আগামী বছর সৈয়দ হব।' কাব্যে আছেঃ

আগে ছিল উল্লা-তুল্লা পারে হইল মামুদ
পিছনের নাম আগে নিয়া এখন হৈল মোহাম্মদ।
কৃতি ও সফল পুরুষ ছিল সেই-ই
যে দোলা ঘোড়া চড়ে,
আর
দশ বিশ জন যার আগে পাছো নড়ে।[৭]

মুসলমান সমাজেও কোন কোন বৃত্তি-বেসাত ঘৃণ্য ছিল। সামাজিক বৈাহিক সম্পর্কও অবাধ ছিল না। 'নবীবংশে' আছেঃ

নারী বল আম্মি হই ধীবরের জাতি
আম্মাতু অধিক হীন নাহি কোন জাতি

---

[৫] ড. মুহা. আবদুল বাকী, বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামীক সাহিত্যর্চ্চা, ইফাবা,ম ২০০৫, পৃ-৯২
[৬] আশরাফ হলো উচু সম্মানীয় ব্যক্তি এবং আতরাফ হলো মধ্যম সম্মানী ব্যক্তি।
[৭] সৈয়দ আমীররুল ইসলাম পূর্বক্ত, পৃ-২৪৮

অথবা

জাতিকুল না জানিয়া বিহা দিলা তোরে

শুনি জ্ঞাতিগণ সবে গঞ্জিবেক মোরে।[৮]

প্রথমদিকে গায়ে-গঞ্জে মুসলামন ছিল খুবই কম।[৯] দীক্ষিত বা দেশজ কিছু কিছু থাকলেও তারা সবই ছিল নিম্নবর্ণের ও নিম্নবৃত্তির। জোলা, নিকোরি, কাহার, কৈবর্ত, মুলুঙ্গি, তেলি, ধুনকর, শালকর, বারুই, ছুতার, বাউল ইত্যাদি নানা ক্ষুদ্রপেশার। তারা আকমল বা আতরাফ হিসাবে বিবেচিত হত। ছিল নিরক্ষরও। অর্থের অভাবে শিক্ষাগ্রহণ ছিল অসম্ভব। অনাহার অর্ধাহার ছিল নিত্যসঙ্গী। ভাতচুরি উপোস ভিক্ষাবৃত্তি ভাঙ্গাঘর ছেঁড়াকাপড় তেনা-ন্যাকড়া দাসত্ব দুর্ভিক্ষ তাদের ললাটলিপি। এদের জীবন অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ছিল অকল্পনীয় যদিও জিনিস পাতির দাম ছিল খুবই সস্তা। গণমানুষ এতই দারিদ্র্য পীড়িত ছিল যে তাদের ক্রক্ষমতাই ছিল না। টংকা বা পয়সা ত দূরের কথা, সাধারণ্যে প্রচলিত কড়ি যোগাড়ই ছিল অতি শ্রমসাধ্য।

মুকুন্দরাম ও বিজয়গুপ্ত মুসলমান মোল্লাদের সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়েছেন। তারা মাত্র দশগ"া কড়ি পেতো মুরগি জবাই করে। খাসি জবাই করে পেতো এর মাথা আর ছয় কুড়ি কুড়ি। চার আনা পেতো বিয়ে পড়ানো বাবত। ধর্মকর্মের ব্যক্তি হিসাবে সমাজে সম্মান থাকলেও ইজার ও টুপি ছাড়া তাদের অনেকেই পরার কাপড়ও থাকতো না। অর্থাৎ কেনার সামর্থ ছিল না। হাসানহাটি নামে এক জায়গার জনৈক কাজীর মোল্লা কেবল ইজার পরে চলতো। বাড়ি বাড়ি ঘুরে জীবিকার্জন করতো। নিম্নস্তরের গারিব মুসলমানরা কেবল ধুতি লুঙ্গি নিমা ও টুপি পরতো। হাসানহাটির জনৈক তাঁতী সাপের কামড়ে মারা গেলে দেখা যায় যে সে মাত্র চার কড়ি (প্রায় আধ আনা) তার বিধবা স্ত্রীর জন্য রেখে যেতে পেরেছে। দরিদ্ররা পর্ণকুটিরো থাকতে বাধ্য হতো। আবুল ফজল বর্ণিত পণ্যমূল্যের তালিকায় একখানা সুতি কাপড়ের দাম মাত্র আট আনা এবং একখানা কম্বল মাত্র চার

---

[৮] ঐ

[৯] বাংলাদেশের মুসলিম কেউ কেউ ছিল বহিরাগত এবং বেশীর ভাগ মুসলিম ছিল ধর্মন্তারিত মুসলিম। তারা গ্রামে গঞ্জে বাস করতো।

আনা। অথচ দরিদ্র চাষী পয়সার অভাবে নেংটি পরে ও কাঁথা গায়ে দিয়ে দিন যাপন করে। কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 'মধ্যযুগের বাঙলা' গ্রন্থে জানান, 'সেকালে টাকায় পাঁচ মনের কম চাল কোনকালেই বিক্রয় হয় নি, কখনো তা সাত আট মন পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে, কিন্তু সেখানে সাধারণ শ্রমজীবীর দৈনিক মজুরী ছিল চার পয়সারও কম।'

দেশে মাঝে মাঝেই দুর্ভিক্ষ হতো। গণমানুষের দৈন্যদশা তখন উঠতো চরমে। ১৫৫৭-৫৮ তে আগ্রা ও বায়ানার নিকটবর্তী অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হলে বদাউনি লক্ষ্য করেছিলেন যে 'মানুষ স্বজাতিকে খাচ্ছে এবং দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত কঙ্কালগুলোর বিভৎস্য রূপে দেশ ছেড়ে গেছে। সারা দেশ জন্যশুন্য হয়ে গেছে। কৃষিকাজ করার জন্য একজনও কৃষক নেই।' ১৫৭২-এ গুরাটের মতো ধনধান্যে ভরা দেশে এমন দুর্ভিক্ষ হয় যে ধনী দরিদ্র সবাই দেশ ত্যাগ করে। ১৫৯৫ থেকে ৯৮ পর্যন্ত যে দুর্ভিক্ষ হয় তখন মানুষ মানুষকে খেয়েছে। পথঘাট মৃতের স্ড্রুপে ভরে যায়। সৎকার করার জন্য কাউকে পাওয়া যায় নি। ১৬৩০-৩২ এ দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় যে আবদুল হামিদ লাহোরি বলন, 'মানুষ পরস্পরকে খেতে লাগলো এবং পিতার নিকট পুত্রের দেহটাই স্নেহের চেয়ে বেশি কাম্য হয়ে উঠলো।' এক ডাচ বণিক লিখেছেন, 'যারা পথে আধমরা অবস্থায় পরে থাকতো তাদের অন্যরা কেটে খেতো। এজন্য পথে-প্রান্তরে মানুষ বের হতো না, খাদ্য হিসাবে অন্যের খাবার হয়ে যাবার ভয় ছিল প্রবল।' বাংলা-যে এমন অবস্থার বাইরে থাকতো না অসময়ে- দুঃসময়ে তা বুকানন- এর বর্ণনায় বোঝা যায়। তিনি রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে লক্ষ্য করেছেন আধা-উলঙ্গ দরিদ্রের সংসার, যেখানে গৃহস্থালি আসবাব হলো কয়েকটি মাটির কলস, দা-বাটি-ঘটি ও কাঁথা। দুর্ভিক্ষে এদেশের অবস্থা-যে কি হতে পারতো ইংরেজ আমলের শুরুতে ছিয়াত্তরের মহামন্বন্তর এর চরম উদাহরণ।

মির্থা নাথান, গোলাম হোসেন প্রমুখের লেখায় দেখা যায় যে, মুসলমানরা ঈদুলা ফিতর, ঈদুল আজহা[১০] রমজান, শবে বরাত ইত্যাদি উৎসব অনুষ্ঠান এবং মহরম খুবই জাঁকজমকের সাথে পালন করতো।[১১] খোয়াজ খিজিরের[১২] উদ্দেশ্যে ভেলা অনুষ্ঠানটা ছিল

[১০] ঈদুল ফিতর হল রমজানের ঈদ এবং ঈদুল আযহা হল কুরবানীর ঈদ।

[১১] শিআ সম্প্রদায় মহররম অনুষ্ঠান খুবই জাঁকজমকের সাথে পালন করে।

অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিশেষ করে শাসকগণের কাছে। কলাগাছের বেরা ও তার ওপর বাড়িঘর মসজিদ তৈরি করে তা আতসবাজি হতো পোড়ানো। ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠান হতো। মুর্শিদকুলি খাঁ এই অনুষ্ঠান অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করতেন। মতিঝিলা প্রাসাদে শাহমত জঙ্গ ও সউলত জঙ্গ এবং মনসুরাবাদ প্রাসঙ্গে সিরাজদ্দৌলা হোলি উৎসব পালন করতেন। মীরজাফরও হোলিতে অংশ নিতেন। মোবারকদ্দৌলাও সাড়ম্বরে ভেলা ভাসান পর্ব ও হোলি উৎসবের আয়োজন করতেন। মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণবদের কীর্তনগান শোনা খুব পছন্দ করতো। কেউ কেউ হিন্দুদের ঘৃণাও করতো। তাদের সাথে খেতো না পর্যন্ত। কোন মুসলমান হরিণাম অথবা হিন্দু- আচার-আচরণ পালন করলে শাস্তি পেতো। আবার অনেকে রামায়ণের কাহিনী শ্রদ্ধভর শোনে অশ্রু বিসর্জন করতো। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে মীরজাফর কীর্তিশ্বরীর পাদোদক পান করতে দ্বিধা করেন নি।

মুসলিম সমাজের পাশাপাশি অবস্থিত হিন্দু সমাজে ইসলাম ধর্মের আগমনে বেশ কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল বোঝা যায়। হিন্দুদের মধ্যে কেউ ইসলাম র্ধম গ্রহণ করলে অনেক সময় তাতে তারা ঔদাসীন্য দেখতো।

সাধারণা নিম্নস্তরের মুসলমানরা হিন্দু তথা সংস্কৃত নামও রাখতো এবং হিন্দুর নানা আচার-অুনষ্ঠান ও উৎসবাদিতে যোগ দিতো। মুসলমানরা সংস্কৃত ভাষাও শিখতো কখনো কখনো। এ ছাড়া হিন্দু কিংবদন্তীর সাথে পরিচিত তো ছিলই। সাহিত্যকর্মেও হিন্দু উপাখ্যান উপস্থাপন করতো। সাবিরিদ খানের মত ব্যক্তিরা বিদ্যা ও সুন্দরকে নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। মুসলমান দরজীর কাছে হিন্দু ব্রাহ্মণরাও কাপড় সেলাই করতো। 'চৈতণ্য ভাগবতে' আছে ঃ

শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন
প্রভু তারে নিজরূপ করাইল দর্শন।

[১২] কারো কারো ধারণা খিজির (আ:) পানিতে এখন জীবিত আছেন। তাই তারা কলাগাছ দিয়ে ভেলা তৈরি করে নদীতে ভাসিয়ে ভেলা উৎসব করতো।

একথা যবন তথা মুসলমানদের প্রতি সহিষ্ণু মনোভাবেরই প্রকাশ। সহনশীল হিন্দুরা ফারসি ভাষা শিখতো।[১৩] রুমির মসনধি বহু হিন্দু ভদ্রলোকের কণ্ঠস্থ ছিল। আরবি-ফারসি শব্দও তারা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতো। জয়ানান্দ 'চৈতন্য মঙ্গলে' লিখেছেন ঃ

ব্রাহ্মণের রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে ॥
মোজা-পাত্র নড়ি-হাতে কামান ধরিবে ॥
মসনবি আবৃত্তি করিবে দ্বীজবর।
ডাকা-চুরি ঘাটি সাধিবেক নিরন্তর।[১৪]

কোন কোন বামুন দাড়ি রাখতো। ফারসি পড়তো। মোজা পরতো। মাছ মাংস খেতো। মদ-খেতো। চুরি-ডাকাতি করতো। পরদারগামী হতো কুৎসিত গালিগালাজও করতো। নবদ্বীপের জগাই-মাধাইরতো নিষিদ্ধ মাংস গ্রহণে মোটেই অনীহা ছিল না। উচ্চবর্ণেরা হিন্দুরা মুসলমানদের মতই পোশাক পরতো। হিন্দু মহিলারা মুসলমান রমণীর মত ঘাগড়া, ওড়না ও কাঁচুলি বা বেণি করতো। হিন্দু কবি, রাজা ও জমিদারগণও মুসলমানী ধরনে চলতো। মুসলমানদের তারা খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। বিজয়গুপ্তের নায়ক চাঁদসদাগর লক্ষ্মীন্দরের বাসরে কোরণ শরীফ পাঠেরও ব্যবস্থা রেখেছিল। শেখ শুভোদয়ায় জলালের এবং পাঁচালীতে সত্য- মানিক-পীরদের যেমন মাহাত্ম্য কীর্তন আছে, জাফর খানেরও তেমনি গঙ্গাস্তোত্র আছে। লস্কর রামচন্দ্র খান, হিরণ্য মজুমদারের মত জমিদার, বিজয়গুপ্ত-যশোরাজগণ-শ্রীকর নন্দীর মত কবিগণ ছিলেন সরাসরি মুসলিম শাসকদের অধীনে কর্মরত। এছাড়াও বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য সরকারি দপ্তরে নিয়োজিত ছিলেন। হিন্দু পাইক অধ্যুষিত ছিল মুসলমান সেনাবিভাগ। ও নিবিড় সম্পর্ক কালক্রমে গড়ে উঠে। অন্যদিকে, গায়ের নিরক্ষর মানুষ এবং নিঃস্ববর্ণের ও নিম্নবিত্তের লোকেরা স্বাতন্ত্র্য ও সচেতনতা রক্ষা করা বা এর অনুশীলন করার গরজ তেমন কখনোই অনুভব করেনি।

---

[১৩] এদেশে ফার্সী রাষ্ট্র ভাষা ছিল ৬০০ বছরেরও অধিককাল ধরে। চাকরি বাকরি পাওয়া ও প্রতিপত্তির জন্য মুসলমানগণ যেমন ফার্সী ভাষা আয়ত্ত করতো তদ্রুপ হিন্দুরা ও আয়ত্ত করতো।

[১৪] সৈয়দ আমিররুল ইসলাম, পূবোক্ত পৃ- ২৫৯

ব্যবহারিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রের ঘরোয়া জীবনে নাপিত- ধোপা-বারুই-বৈদ্য গো চিকিৎসক বাদ্যকর চাষী-মাজি-তাতী-মুচি ইত্যাদি নানা পেশার লোকদের সঙ্গে সেযুগে পারিবারিক সম্পর্ক প্রয়োজনের তাগিদে রাখতেই হতো। তাই মন মত বাঁচিয়ে গায়ে গঞ্জে হাটে মাঠে সবস্বার্থে সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থানের ভিত্তিতে হিন্দু মুসলমান প্রাত্যহিতক জীবনে সহযোগিতা ও সম্ভব রেখে সহাবস্থান করতো।

এ প্রসঙ্গে আরো লক্ষ্যণীয় যে, নানা লেখায় মুসলমান কর্তৃক ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ কর্তৃক মুসলমান লাঞ্চনার কথা পাওয়া যায়। সৈয়দ সুলতান, জয়েনউদ্দিন, শা'বিরিদ খান, গরীবুল্লা, সৈয়দ হামজা প্রমুখ কবির রসুল, হামজা, আলী, হানিফা প্রমুখ ইসলামের উন্মেষ যুগের বীরপুরুষদের দিথি জয় বর্ণনাসূত্রে পরাজিত ব্রাহ্মণ, রাজা ও রাজকন্যাদেরই সপ্রজা ইসলাম বরণে আহ্বান জানিয়েছেন, অন্যাথায় হত্যারও হুমকি দিয়েছেন।

অনেক সময় কেউ কেউ ঠাট্টা করে বাংলাদেশের মুসলমানদের বলেন 'শুইন্যা' মুসলমান। অর্থাৎ শোনে- মুসলমান। এদশের অধিকাংশই সুন্নি মুসলমান বলে-যে কথাটা বলা হয়, তা নয়- যদিও অনেকে তাই মনে করেন। আসলে বলা হয়, এখানকার ইসলামধর্ম অনুসারীদের জীবন-যাপন প্রণালী দেখে। ইসলামের মূল[১৫] তত্ত্ব ও তথ্যাদি না জেনে শোনে অথবা আচারাদি তেমনভাবে পালন না-করেই এদেশের অনেক মানুষ মুসলমান। অনেকে আবার মুসলমান হয়েও পুরোনো বহু আচার-আচরণ ও সংস্কারে আবদ্ধ।[১৬] গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে ইসলাম ধর্মের নানা বিধান পালনের সাথে সাথে তাদের ভেতর আবহমানকালের অনৈসলামিক এত অনুষ্ঠান আচার ও লোকায়ত চিন্তা- চেতনা সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে যে, সৈয়দ আহমদ একদা ইসলামের অবস্থা দেখে 'ইসলাম ও কুফর-এর খিচুড়ি' বলে যে কথাটি সারা ভারত সম্বন্ধে বলেছে, তা বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলামের বেলায়ও মৌলবাদীরা প্রযোজ্য বলে মনে করতে পারে।

---

[১৫] ইসলামের মূলস্তম্ব পাচটি : যথা- কালিমা, নামাজ, রোযা, যাকাত এবং হাজ্জ।

[১৬] প্রাচীন বাংলার বহু ছিল ধর্মান্তরিত মুসলিম। তাই তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তাদের পূর্বের আচার-অনুষ্ঠান ভুলতে পারেনি।

বাংলাদেশো ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে এর সম্বন্ধে জ্ঞান ও বিদ্যা যতটকু প্রসার সকল মুসলমানের মধ্যে হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি। কোরান শরীফ আরবিতে লেখা। এর তফসির-ভাষ্য, মসলা-মসায়েল, টীকা-
টিপ্পনী এবং হাদিস ইত্যাদি আরবি অথবা ফারসি ভাষায় রচিত।[১৭] এগুলো বহুদিন পর্যন্ত ভারতীয় কোন ভাষায় অনূদিত হয়নি। বাংলা ভাষায় তো নয়ই। বাংলা বা অন্য ভাষায় দিখলে অশুদ্ধ হবার সম্ভাবনা, এমন কি গুনাহ্ হবে এই ছিল এক সময়ের ধারণা।
সাধারণ অক্ষর-জ্ঞান নিয়ে আরবি বা ফারসির অইসব তত্বজ্ঞানপূর্ণ বিরাট বিরাট পুথি বা সাহিত্যের সামান্য কিছুও হজম করা তো দূরের কথা, ধারে কাছেও ঘেঁসার কল্পনা কেউ করতে পারতো না। কেবল সশ্রদ্ধ ও বিস্ময়-পূর্ণ ভাব প্রকাশ করতো মাত্র। উক্ত শিক্ষায় শিক্ষিতের হারও ছিল আঙুলে গোনা। ইসলাম সম্বন্ধে জনসাধারণের অজ্ঞতা তাই ছিল অপরিসীম। মাতৃভাষায় বা মৌখিকভাবে সেটুকু জ্ঞান লাভ সম্ভব, তাই ছিল তাদের একমাত্র সম্বল।

বহু ধর্মান্তরিতই কেবল কালেমা পড়েই মুসলামান হয়ে যেতো, নামাজ-রোজা-হজ-জাকাত অর্থাৎ ফরজ অন্য কাজগুলো করতে পারলে তো কথাই নেই। অনেক সময় গোষ্ঠীপতি, দলপতি, বা গ্রামপতি ধর্মান্তরিত হলেই বাকিরাও ধর্মান্তরিত হয়েছে বলে ধরা হতো। পার্বত্যজাতি বা ট্রাইবাল গোষ্ঠীর ভেতর এভাবে অনেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে বলে জানা যায়। অহোম, ত্রিপুরা এবং কামরূপের খেন এবং কোচদের কথা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। কখনো-বা অশিক্ষিত গ্রাম্যলোকের যদু-মধু-রাম-শ্যাম-এর স্থলে রহিম করিম আব্দুল নামকরণ করলেই, আর কখনো- বা গরুর মাংস খেলেই মুসলমান হয়ে গেছে বলে ধারণা করা হতো। এ ধরনের অসম্পূর্ণ র্ধমান্তরিত গণ স্বাভাবিকভাবেই পুরাতন আচার- আচরণ বাছ-বিচার ছাড়তে পারতো না। জড়িত, তার পক্ষে সে-সব সংস্কার ছাড়াও মুশকিল। বরং যুগ যুগ সঞ্চিত ধ্যান-ধারণাা-বিশ্বাস সমেত এরা নামে- মুসলমান হতো।

[১৭] পবিত্র ধর্মগ্রন্থ- আল কোরাআনের ভাষা আরবি ইসলামী জ্ঞান- বিজ্ঞানের ভাষা আরবী ও ফার্সী ভাষায় লিখিত। প্রাচীন বাংলার প্রথম দিকে এ গুলো অন্যভাষায় অনুবাদ করলে ভুল হবার বা গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে মনে করা হতো। পরবর্তীকালে এ ধারণার পরিবর্তন হয়।

পীরপ্রথা এই ধরনের একটি প্রচলিত ব্যবস্থা। পীর শব্দের অর্থ প্রাচীন। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে বোঝায় আধ্যাত্মিক নেতা, যিনি মুরিদ বা শিষ্যকে স্বীয় অভীষ্ট পথে দীক্ষিত করেন। ইসলাম ধর্মে আল্লাহ ও রাসুলা ছাড়া মধ্যবর্তী আর কাকেও আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যলাভের জন্য স্বীকার করা হয় না। সূফি-দরবেশগণও নিজেদের সেভাবে কখনোই উপস্থিত করেন নি। তাঁরা নিজেরাই ছিলেন আল্লাহ্‌র- রসুলের ভক্ত শিষ্য মাত্র। কিন্তু কালে কালে তাঁরা নিজেরাই হয়ে দাঁড়ান সাধারণ মানুষের বৈতরণী পায়ের কা"ারী। তাঁদের মত যাঁরাই অ্যধ্যাত্মিক পথে সিদ্ধিলাব করেছেন বলে জানা গেছে, তাঁরাই পীর বলে খ্যাত হয়েছেন।

পীরপ্রথার উৎপত্তি স্থল ইরান-আফগানিস্তান। কিন্তু বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে এই প্রথার উর্বর ভূমি প্রস্তুত হয়েই ছিল তান্ত্রিক গুরুবাদ ও হিন্দু গোঁসাইবাদ-এর মাধ্যমে। শুরু ও চেলা অথবা গোঁসাই ও শিষ্য সম্পর্কই কালক্রমে এদেশে ইসরামীকরণ হয়ে পীর ও মুরিদ অথবা ওয়ালি ও মুরিদ কিংবা ওস্তাদ ও সাকরেদ-এ রূপান্তরিত হয়। ব্রাহ্মণ বা গুরুদেব-এর স্থান গ্রহণ করেন পীরগণ। হিন্দু চৈত্য এবং বৌদ্ধ স্তুপ- এর রূপান্তর হয় পীরের মাজার এবং দরগা। খানকাহগুলোর সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় অতীতের বৌদ্ধ বিহার-এর। ভক্তজনেরা ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে ধর্মান্তরের পর অতীত দেবদেবীর স্থানে পীরকে বসিয়ে শূণ্যস্থান পূরন করে মানসিক শান্তি, স্বস্তি ও আনন্দ লাভ করে। অতীতের চিন্তা-চেতনার দোয়ার ধরেই সাধারণের কাছে পীরেরা হন অলৌকিক শক্তির অধিবাসী, তাঁরা ইচ্ছেমত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে সক্ষম, দেহকে দৃশ্য অদৃশ্য দুইই করা বা যেকোন আকার ও রূপ ধারণে পাদদর্শী, এমন কি একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে উপস্থিতও হতে পারেন, মৃতকে জীবিত বা জীবিতকে মৃত এবং নিজেও ইচ্ছেমৃত্যু বরণ করতে পারেন ইত্যাকার।[১৮] নানা কল্পনা তাদের নিয়ে তাদের নিয়ে করা হয় ঠিক সেই হিন্দু বা বৌদ্ধ দেব- দেবী বা মুনি-ঋষিদের মতই।[১৯]

[১৮] ঐ সব কাজকর্মে তারা আল্লাহর 'যাতে' শিরক করেন। যা সত্যিকার ইসলামের সাথে সাংগর্শিক।

[১৯] ঐ কারণেই কেউ কেউ মনে করে থাকেন, সুফিবাদ বেদান্ত বৌদ্ধ ধর্ম থেকে উদ্ভব হয়েছে।

অতীতেরা দেব- দেবীদের কাছে যেমনি নানা কারণে লোকেরা মানত করতো, পূজা দিতো, বলিদান, করতো, সন্ধ্যাবাতি জ্বালাতো৷ পীরের দর গায়ও মানত করা, জীবিত বা বিদেহী আত্মার কাছে প্রার্থনা, সমাধিতে সন্ধ্যাবাতি দেওয়া, ধুপধোঁয়ার স্থলে আগরবাতি বা গন্ধবাতি জ্বালানোর রেওয়াজ হয়ে যায়। হিন্দদের কাশী, পুরী, বৃন্দাবন, জগন্নাথা, মথুরা বা রান্তে অনুষ্ঠানাদি হয়, তেমনি পীরের দরগায়ও প্রচলিত হয় সাংবাৎসরিক ওরস। সেখানে শোভাযাত্রা করা, পতাকা লাঠি বল্লম-সরকি হাতে যাওয়া, নামাজ আদায় ও নানা ধরনের প্রার্থনা এবং প্রচুর জনসমাগমে সরগরম হওয়াটাতে হিন্দু- বৌদ্ধ নানা মেলার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পীরকে মুরিদের সেজদা করার প্রথা হিন্দু চেলারা গুরুকে ষাষ্ঠাঙ্গে প্রণিপাত করারই সত। মুর্শিদি, জারি, সারি, মারফতি, বাউল সঙ্গীত ইসলামী ভাবধারায় পুরিপুষ্ট হলেও কীর্তন, ভজন ইত্যাকার ধরনের অমুসলমান প্রভাব হতেই যে পরিবৃদ্ধি গেয়েছে তা স্পষ্ট। সূফিদের হাল, জিকর এবং সিমা বা গীতবাদ্যের জন্য তাদের একত্রিত হওন যেন গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদের দশা, কৃষ্ণনাম ও কীর্তনেরই রূপান্তর। সূফিবাদের প্রেম-ভক্তির সাথেও বৈষ্ণববাদের মিল লক্ষণীয়ভাবে পরিস্ফূট। হয়ত একে অপরের ওপর প্রভাবেরই ফল এইসব।

কদম রসুল জাতীয় পদচিহ্নগুলোও হিন্দু-বৌদ্ধ প্রভাবান্বত। হিন্দুদের বিষ্ণুপদ এবং বৌদ্ধদের বুদ্ধপদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকেই যে পদচিহ্নের প্রতি মুসলমানদের শ্রদ্ধাবোধ এসেছে তা বোঝা যায়। গয়ার বিষ্ণুপদ মন্দির বা বর্ধমানের ধর্মপাছকাই বোধহয় এইসব স্মৃতির উৎস। হজরত মুহম্মদের (সঃ) পদচিহ্ন হিসাবেই কদম রসুল সাধারণ্যে পরিচিত। গৌড়, চট্টগ্রাম ও ঢাকার নবীগঞ্জ নাকম স্থানের আজো এসবের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। গৌড়ের কদম রসুল মসজিদ খুবই বিখ্যাত। দামেস্ক, শ্রীলঙ্কা, গুজরাটের আহমদাবাদ এবং দিল্লীতেও এ ধরনের স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। এগুলো ছাড়া, মোজফফরপুরে শাহ লেঙ্গুর-এর দরগার পদচিহ্নও খ্যাত। স্থানীয় নানা কিংবদন্তী ও কাহিনী অনুসরণ করে বাংলাদেশে বহু পীরদরবেশের নবতর রূপান্তর ঘটেছে, যাদের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মান্য করে, যেমন খাজা খিজির বা খোয়াজ খিজির এবং পীর বদর। পানিতে আপদবিপদ

থেকে রক্ষা পাবার জন্য উভয়কেই নদীমাতৃক বাংলাদেশের মাঝিমাল্লারা নৌকা চালাবার সময় শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। জিন্দাগাজী, গাজী মিয়া এবং সাতপীর সুন্দরবন অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। সেখান কার জঙ্গলে বা নদীতে যাবার আগে তাদের স্মরণ করা হয় যাতে বাঘ বা কুমীর- এর আক্রমণ হতে তাঁরা রক্ষা করেন। গাজী এবং তাঁর ভাই কালুর স্মৃতিচিহ্ন ঢাকার লক্ষ্যা নদীর পারেও বিদ্যামান। মানিক পীর, ঘোড়া পীর, কুম্ভীরা পীর, মাদারী পীরসহ পাঁচজন পীর একত্রে পাঁচপীর নামে পরিচিত। আপদ-বিপদ তড়াবার জন্য তারা পূজিত হন। সোনারগাঁয়ে তাদের রওজা আছে বলে কথিত। পাঁচপীরের এই অভিব্যক্তি ইসলাম ও এনিমিজম বা সর্বপ্রাণবাদ- এর সমন্বয় বলা যায়। মহাভারতের পঞ্চপা ব এবং বৌদ্ধদের পঞ্চ-ধ্যানী বুদ্ধর সাথেও এর মিল আছে। মিল আছে হিন্দুদের পঞ্চসতী, পঞ্চবার্ট, ধর্মঠাকুর সম্প্রদায়ের পাঁচ প িত এবং মুসলমানদের পাঁচবিশ্বাস অর্থাৎ ঈমান-নামাজ-রোজা-হজ- জাকাত আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথেও।

ইসলাম ধর্মে সন্ন্যাসবাদ নেই,[২০] অথচ এই সন্ন্যাসব্রতও বৈদিক ধর্ম থেকে এতে আছর করেছে।[২১] এই ধরনের পাঁচটি ফকিরি সম্প্রদায়ের ভেতর অর্জুনশারী, জলালী, বে-নেওয়াজ এবং মাদারিগণ বিখ্যাত। এদের প্রত্যেকের ভেতরও আবার বহু ভাগ-বিভাজন রয়েছে। শেখ সৈয়দ বাহাউদ্দিন মাদারীর অনুসারী। মাদারীর ফকিরগণ নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান থেকে আগত। পূর্ণিয়া ও রংপুর অঞ্চলে এক সময়ে এদের বড় আস্তানা ছিল।[২২] তারা একত্রে মাদার-ঝা া নিয়ে উৎসব করতো, কেউ কেউ সন্ন্যাসীদের মত উলঙ্গ থাকতো এবং অগ্নি-গোলকের ভেতর দিয়ে চলে যেতে পারতো। এইছাড়া অন্য একদল ফকির মেয়েদের মত কাপড় পরতো এবং মুর্শিদ- এর সামনে নাচগান করতো। আবার কোন কোন ফরিরদল গাঁজা, ভাং, আফিং ও মদে আসক্ত ছিল। নারীসঙ্গও উপভোগ করতো। এ যেন মনে হয় বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধন- ভজনেরই রূপান্তর মাত্র।

---

[২০] পবিত্র হাসীসে আছে : লা- রুহবান্নিয়্যাতা- ফীল-ইসলাম।

[২১] তাই কেউ কেউ মনে করেন- সূফীবাদ ইসলাম- তথা- কুরআন হাদীস থেকে উদ্ভব হলেও এর মধ্যে বৈদিক ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান।

[২২] আব্দুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ- ৯৩

কালান্দারিয়া ফকিরগণ ছিল যাযাবর। স্থান থেকে স্থানান্তরে গমন করতো। হাতে আংটি পরতো। বাহুতে পরতো বাজুবন্ধ। সাথে সব সময় রাখতো একটি বানর, একটি বিড়াল এবং একটি ভল্লুক।[২৩]

এইসব পীর- দরবেশ ফকিরগণই বাংলাদেশে সূফি মতবাদ গড়ে তোলেন। কিংবদন্তীর কথা বাদ দিলে হাসান বসরি (মৃত্যু ৭২৮ খ্রীস্টাব্দ), রাবেয়া (মৃত্যু ৭৫৩), ইব্রাহিম আদহম (মৃত্যু ৭৭৭), আবূ হাশিম (মুত্যু ৭৭৭), দারুদ তা'য়ী (মৃত্যু ৭৮১), মারুফ করখী (মৃত্যু ৮১৫) প্রমুখই সাধকরা সূফির মতের আদিপ্রবর্তক স্রষ্টা ও সৃষ্টির সাদৃশ্য লীলা ও অস্তিত্ব বোঝাবার জন্য 'ইরফান' এর জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনবোধ ও রহস্যচিন্তাই সৃষ্টি করেছে সূফিবাদের। এজন্যই তারা বিশ্বব্রহ্মবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী। অনেকে আবার বিশ্বাস করে, হজরত মুহম্মদ (সঃ), হযরত আলীকে তত্ত্ব বা গুপ্তজ্ঞান দিয়ে যান। সে জ্ঞান হাসান, হোসেন, খাজা কাসিম বিন জায়দ ও হাসান বসরি আলী থেকে প্রাপ্ত হন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বঙ্গে সূফী প্রভাব গ্রন্থে বলেন, 'বাংলাদেশে সূফীমত প্রচার ও বহুল বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সহজিয়া ও যোগসাধন প্রভৃতি পন্থা বঙ্গের সূফী মতকে অভিভূত করে ফেলতে থাকে। কালক্রমে বঙ্গের সূফী মতবাদের সহিত এ দেশীয় সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতিও সম্মিলিত হইতে থাকে। এবং সূফীমতবাদ ও সাধন পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে যোগসাধন প্রভৃতি হিন্দু পদ্ধতির সঙ্গে একটা আপোস করিয়া লইতে থাকে।' তাঁর মতে ভারতীয় পুস্তকের আরবি ফারসি অনুবাদের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান বৌদ্ধভিক্ষুর সান্নিধ্যে এবং আল বিরুনী অনূদিত পাতঞ্জল-যোগ এবং কপিল সংখ্যা তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয়ই এই প্রভাবের মূখ্য কারণ। বায়জিদ বোস্তামির সিন্ধু, দেশীয় তথা ভারতীয় গুরু বু- আলীর প্রভাবও এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

সূফির জিকর ভারতীয় প্রভাবে যোগীর ন্যাস, প্রাণয়াম ও জপের রূপ নেয় এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রভাবে বৌদ্ধ গুরুবাদও (যোগতান্ত্রিক সাধকের অনুস্মৃতি বশে) সূফি সাধকের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। সূফি মাত্রই তাই পীর, মুর্শিদ নির্ভর। গুরুর আনুগত্যেই

[২৩] ড. মুহাম্মদ বাকী, 'বাংলাদেশের বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়' মেরিট প্রকাশন, ২০০৯, পৃ- ৬৩

সাধনা সিদ্ধির এক মাত্র পথ। সূফিরা আল্লাহর ধ্যানের প্রাথমিক অনুশীলন হিসেবে পীরের চেহারা ধ্যান শুরু করেন। গুরুতে বিলীন হওয়ার অবস্থায় উন্নীত হলেই শিষ্য আল্লাহতে বিলীন হবার সাধনার যোগ্য হয়। প্রথম অবস্থার নাম 'ফানা-ফিস শেখ, দ্বিতীয়টি মুরাকিবাহ্ (আল্লাহর ধ্যান)। এই মুরাকিবায় যৌগিক পদ্ধতি গৃহীত হয়। আমল, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি- এই চতুর যোগপদ্ধতি থেকেই পাওয়া। পীরের খানকাহ্ বা আখড়ায় সামা (গান) , হালকা (ভাবাবেগে নর্তন), দারা (আল্লাহর নাম কীর্তনের আসর) ও হাল (অভিভূতি), সাকি, ইশক্ প্রভৃতি খাজা মঈনুউদ্দিন চিশতি'র আমল থেকেই চিশতিয়া খান্দানের সূফিদের সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে।[২৪]

চৌদ্দ-পনের শতকের মধ্যেই সূফির সর্বেশ্বরবাদ আর বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ অভিন্ন রূপ নেয়। আচার ও চর্চার ক্ষেত্রেও যোগপদ্ধতির মাধ্যমে ঐক্য স্থাপিত হয়। বাংলায় দেশী তত্ত্বচিন্তা ও চর্চার সঙ্গে ইসলামের বহিরাবয়বের মিলন ঘটানোর চেষ্টা ক্রমে পরিণত হয়ে ওঠে। ভারতীয় যোগচর্চা ভিত্তিক তান্ত্রিক সাধনার যা কিছু মুসলিম সূফিয়া গ্রহণ করলেন তাকে নামত একটা মুসলিম আবরণ দেবার চেষ্টা হলো। যোগ- নির্বাণ[২৫] হলো ফানা, কুন্ডলিনী শক্তি হল নকশবন্দিয়াদের লতিফা। হিন্দু তন্ত্রে ষড়পদ্ম হলো এদের বড় লতিফা বা আলোককেন্দ্র। এদেরও অবলম্বন হলো দেহ চর্চা ও দেহস্থ আলোর ঊর্ধ্বায়ন। পরম আলো বা মৌল আলো দ্বারা সাধকের সারা শরীর আলোময় হয়ে ওঠে। এর সাথে সুরা নূর- এ আয়াত ৩৫ স্মর্তব্য, আল্লাহই আসমান ও জমিনের আলো।'

আইন-ই আকবরীতে চোদ্দটি সূফি খান্দান বা মন্জিলির উল্লেখ আছে। চিশতিয়া ও সুহরাবার্দিয়া মত প্রথমে ভারতে এবং বাংলায় প্রসার লাভ করে। এর পরে নকশবন্দিয়া এবং আরো পরে কাদিরিয়া সম্প্রদায় জনপ্রিয় হয়। মনে হয় ষোল শতক অবাধ

[২৪] সৈদয় আমিরুল ইসলাম, পূবোক্ত পৃ- ২৭৫

[২৫] নির্বাণ হল বৌদ্ধ মতবাদ। সূফীদের ফানা এর সাথে ব্যহত মিল থাকলেও প্রকৃত পক্ষে মিল নেই। কেননা ফানা হলো ইতিবাচক এবং নির্বাণ হল নৈতিবাচক

চিশতিয়া, মাদারিয়া ও নকশবন্দিয়ার প্রভাবই বেশি ছিল। পরে মাদারিয়া ও কালান্দরিয়া জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে।

হিন্দু পুরোহিত এবং বৌদ্ধ শ্রমণদের মতই বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে আর্বিভাব ঘটে মোল্লা-মৌলবির। ইসলামী শরা-শরিয়ত পালনে, প্রাত্যহিত নামাজে, ঈদের জামাতে বা নানাবিধ আচার- অনুষ্ঠানে এরা পৌরোহিত্য করেন। মসজিদে নামাজ পড়ানো, আজান দেওয়া, মিলাদে মহফিলে জামাতে এরাই যান। সাধারণত মানুষ তাদের ওপর পরম বিশ্বাসে ধর্ম-কর্মের ভার দিয়ে যেন নিশ্চিত থাকে। আর এদেরও জীবিকার্জন এইসব ধর্ম কাজের মাধ্যমেই। এদের কেউ কেউ বেশ শিক্ষিত ও জ্ঞানী; কেউ কেউ আবার একেবারেই অজ্ঞ। সমাজের বৃহত্তর পরিসরে কখনো বা এরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কখনো উদার মতাবলম্বী, আবার কখনো বা ভীষণ গোড়া বামুন পুরোহিতেরই মত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মতোয়াল্লী প্রথাটার সাথে গওয়াল ব্রাহ্মণদের প্রথার মিল রয়েছে। বাংলাদেশের ইসলামধর্ম অনুসারিগণ সাধারণত সুন্নি মুসলমান হলেও শিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাবও এদেশে রয়েছে।[২৬] সাইফুউদ্দিন ফিরোজ শাহ-এর শিলালিপিতে মুহম্মদ, আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হোসেন- এর নাম বাকি তিন খলিফা ছাড়াও আছে। শিয়া পঞ্জাতন[২৭] পাক যা পাঁচ পবিত্র ব্যক্তিত্বের কথাই এগুলো স্মরণ করার। ষোড়শ শতকের প্রাথমিক দিকের আর এক শিলালিপিতে আছে শিয়া ঐহিত্যের এক পাঁচ পঞ্জতন ইয়া বুদ্ধ,[২৮] ইয়া ফত্তা, ইয়া আল্লা, ইয়া কুদ্দুস এবং ইয়াসুব্বু। বুদ্ধ শব্দটা স্পষ্টতই বুদ্ধ এর রূপান্তর। মুকুন্দরাম মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার প্রার্থনার স্থানের না বলেছেন হোসেনবাড়ী। মসজিদ নয়। বারবোসা বাংলায় প্রচুর পারস্য বণিক দেখে ছিলেন বলে জানিয়েছেন। পারস্য উপসাগর ও ইরাক এর সাথে বাংলার বাণিজ্য ছিল প্রচুর। হয়ত এই সুত্র ধরেই এবং পরে মোগলদের সাথেই হয়ত শিয়া প্রভাব এদেশে আরো বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে মহরম অনুষ্ঠানে। আশুরা বা মঞ্জিলের দিন অর্থাৎ দশই মহরম তারিখে

[২৬] সুন্নি মুসলিমগণ ওপর বিশেষ করে ঢাকার মুসলিমগণের ওপর শিয়া প্রভাব রয়েছে।

[২৭] পাজ্জাতন বলতে আহলে বায়েতের মহানবী (সা:), আলী (রা:), ফাতেমা (রা:), হাসান ও হুসাইন (রা:) কে বুঝায়।

[২৮] বৌদ্ধ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ইয়া ওয়াদুদু বলে মনে হয়।

তাজিয়া বের করা, লাঠি- ছুরি- তলোয়ার-বর্শা- বল্লম দিয়ো যুদ্ধ অভিনয় অথবা বুকে হাত পিটিয়ে 'হায় হাসান হায় হোসেন' কারা শিয়া প্রভাবজাত। এই উপলক্ষে জারীগান যেন কাওয়ালীরই ভিন্ন রূপ। আশুরা দিবসের এই অনুষ্ঠানের পেছনে হিন্দু দূর্গাপূজা উৎসব বা রথযাত্রার প্রভাবও লক্ষ্যণীয়। দূর্গাপূজায় দূর্গামূর্তি বা রথযাত্রার রথ নিয়ে যেভাবে সোরগোল তুলে শোভাযাত্রা করা হয় মহরমের তাজিয়া ফেস্টুন নিয়েও প্রায় একই ধরনের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

যুগের পর যুগ পাশাপাশি বাস করার ফলে হিন্দু ও মুসলমান একে অপরের ধর্মীয় দেবতা বা ঈশ্বরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে থাকে। সদকা দেয়, মানত করে। দুঃখ শোকে হিন্দু মুসলমানের আল্লাহ্ রসূল পীর দরবেশকে এবং মুসলমান হিন্দুর কালী বা কৃষ্ণকে স্মরণ করে। মঙ্গলকাব্যে কোন কোন মুসলমান মনসা পূজা করতো বলেও উল্লেখ আছে। হিন্দু মুসলমানদের চিন্তাধারার সমন্বয় সবচেয়ে উল্লেখজনকভাবে ঘটেছে সত্যপীর এবং সত্যনারায়ণ এর ধারণায়। একটি কাঠের তক্তার ওপর সত্যপীরকে কাল্পনিকভাবেই উপবিষ্ট করানো হয়। পরে এ তক্তার ওপর দেওয়া হয় অফুরন্ত ফুল। মোল্লা পড়েন মন্ত্র এবং সত্যপীরের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় শিরনি। পরে সেই শিরানী বিতরণ করা হয় ভক্তদের মধ্যে। পূর্ণিমার দিন এই অনুষ্ঠান করতে হয়।

ইসলাম ধর্ম বর্ণভেদ ও জাতিভেদ প্রথার বিরোধী।[২৯] কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণদের যেমনি একটি বিশেষ স্থান রয়েছে এবং উচ্চশ্রেণী, নিম্নশ্রেণী কায়স্থ, অন্ত্যজ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদাভেদ আছে, তেমনি মুসলিম সমাজেও আশরাফ আতারাফ এর আকেটা সুস্পষ্ট সীমারেখা বিদ্যামান। সৈয়দ, শেখ, মোগল, পাঠানরা সমাজের উচ্চকোটিতে অবস্থিত, আর সাধারণ মুসলমানরা, যেমন কৃষক, জেলে, তাঁতী, দর্জি ইত্যাদি নিম্নস্থিত, পড়ে থাকে। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা আশরাফ বা শরীফ বলেও অভিহিত। তাদের সাথে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের, যাদের বলা হয়, আতরাফ বা রজীল।

[২৯] ইসলাম সাম্যের ধর্ম। ইসলামে বর্ণ ও জাতিভেদ নেই। হিন্দু ধর্মে রয়েছে জাতিভেদও বর্ণভেদ। তাই বর্ণ ও জাতিভেদে আক্রান্ত হিন্দুরা সাম্যের ধর্ম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

একমাত্র নামাজের সময় এক কাতারে দাঁড়ানো বা ঈদের সময় কোলাকুলি ছাড়া তেমন কোন সম্পর্ক থাকে না। উৎসব অনুষ্ঠানেও আফজল কাজেল বা নিম্নশ্রেণীর লোকেরা একত্রে বা একই সারিতে অথবা একই আসনে বসার অধিকার পায় না। এমন কি খাবার-দাবারের বেলায়ও নিচু স্তরের মুসলমানদের ভিন্ন বাসনপত্র ও ভিন্ন খাবার সরবরাহ করা হয়। গোয়ালা, জোলা বা তাঁতী, পিঠারী, মাছ বিক্রেতা, কাগজী ইত্যাকার ধরনের কতক পেশার ব্যক্তিবর্গ হিন্দু প্রভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে বংশপরম্পরায় হয়।

হযরত মুহম্মদ (সঃ) জন্মদিবস বা ঈদ- এ মিলাদুন্নবী ও মিলাদ শরীফ পালন, যেখানে সাধারণত কেয়াম প্রচলিত অর্থাৎ সমাগত সবাই দাঁড়িয়ে গায় 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' ইত্যাদি, ফাতেহা পাঠ বা মৃত আত্মীয় স্মরণ, খতনা বা সুন্নত অর্থাৎ মুসলমানী বা লিঙ্গের ত্বকচ্ছেদ উৎসব, আকীকা বা নবজাত শিশুর নামে পশু কোরবানির ইত্যাদি প্রথাগতভাবে বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে প্রচলিত।

মুসলমাদের মধ্যে তাবিজের ব্যবহার, কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোরান শরীফ খুলে দেখার দেখার প্রথা, মুসলমান ফকীরদের মাথার চাঁদি কামানো, ইসলামের সরল বিবাহপ্রথার স্থলে আনুষ্ঠানিকতা, প্রদর্শনবাতি, দেনমোহরের আধিক্য, যৌতুকপ্রথা, উপঢৌকন প্রদান, নাচগান, কত কৌতুক মুসলমান সমাজেও রয়েছে।

মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের পীর ও ফকিরের উদ্ভব হয় যারা মারেফাতকে শরীঅত থেকে আলাদা করে নেয় এবং শরিঅতের বিভিন্ন ব্যাপারের ভিন্নতর মারেফতি অর্থ বের করে। শরিঅতে নিষিদ্ধ মদ ও গাঁজা সেবন করাকে তারা 'মারেফতে ইলাহি' বা খোদার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার উপায় হিসাবে গণ্য করে। মুসলিম বাউল ফকিরগণ 'পঞ্চরস সাধন' নামক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কালো, সাদা, হলুদ ও মুর্শিদ এর বাক্য মানে।[৩০]

[৩০] কালো অর্থ মদ, সাদা অর্থ বীর্য, লাল অর্থ ঋতুস্রাব, হলুদ অর্থ মল।

আধুনিক কালেও লোকাচার বাংলাদেশের মুসলমানদের ভেতর অব্যাহতভাবেই প্রভাবিত করে চলেছে। আজানের সময় মুসলমান মেয়েদের মাথায় কাপড় দেওয়া, জুম্মার দিনে মসজিদে সিন্নি মানত, কুস্বপ্নের জন্য ভিক্ষুককে দানখয়রাত, রাতে ঘর ঝাড়ু দেওয়া অলক্ষ্মীর কাজ, বের হওয়ার সময় হাঁচলে কুলক্ষণ, পরীক্ষার সময় কলা বা ডিম খাওয়া ক্ষতিকর ইত্যাকার হাজারো ধরনের ধারণা সাথে ইসলামের কোন সম্পর্কই নেই। ঐগুলোর জন্ম দৈনন্দিন জীবনের নানা টানাপাড়েনের ভেতর থেকেই। অনেক ক্ষেত্রে এসবের অনেক কিছুই একেবারে মূল্যহীন ও হাস্যকর মনে হলেও সময়ে সময়ে ভীষণ জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ মনে হয়। অনেক আচার- অনুষ্ঠানে আবার এদেশের বার মাসের তের পার্বণের ধরেই যেন নব নব রূপে আবির্ভূত হয়েছে কৃষিপ্রধান সমাজের অনুষঙ্গ হিসাবেই।

ভাষা- সংস্কৃতি- ঐহিহ্য সম্পৃক্ত, প্রফেসর আনিসুজ্জামান এর ভাষায় 'মিশ্র ভাষা রীতির কাব্য,' যা সাধারণত 'পুথি সাহিত্য' নামে পরিচিত। এই ভাষাকে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক 'হিন্দুস্থানী বাংলা'ও বলেছেন। এটি কারো কারো কাছ আদৃত হয় 'মুসলমানী ভাষা' হিসাবে। 'দোভাষী পুথি' বা 'কলমি পুথি' নামেও পরিচিত এগুলো। উনিশ, এমন কি বিশ শতকেও কেউ কেউ এ ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।

বাস্তববিমুখতা হলো অই তথাকথিত মুসলমানি সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। উদ্ভট সব কাহিনী। গাঁজাখুরি আখ্যান। অসম্ভব হাস্যকর সব কল্পনা। তাতে না ছিল সমকালের কোন সমস্যা, না ছিল সকালীন ধ্যান-ধারণা। সারা বাংলা সহ ভারতবর্ষ তখন চলে যাচ্ছে বিদেশী মোগলদের চেয়েও আরো অনেক দূরের মানুষ একবারেই ভিন দেশী ভিন্ন গোষ্ঠীজাতি ইংরেজদের হাতে। এদেশী সামন্তবাদ পরাজিত হচ্চে ধনবাদী ইংরেজদের হাতে। সামন্তরা নেতিয়ে পড়ছে কোম্পানির দাপটের কাছে। ইচ্ছে তারা তাদের চাটুকার, সহযোগী, বেতনভুক্ত কর্মচারী। মোগল আমলে এদেশের যেটুকু আত্মসম্মান ছিল তা ভুলুন্টিত হচ্ছে ন্যাক্কারজনকভাবে। শোষণের এসেছে তীব্রতা। লাগছে সবার গায়ে।

গণমানুষ উঠছে ক্ষেপে। ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে ফারায়িজি আন্দোলন,[৩১] এমনকি তরিকা-ই-মুহম্মদিয়ার মত আন্দোলন চলছে। অথচ এসবের কোনকিছুই নেই এযুগের সাহিত্য কর্মে। পরাজয় এনে দিয়েছে অনেকের মনে আত্মবিশ্বাসহীনতা। পথ খোলা ছিল কোম্পানির শোষণের বিরুদ্ধে হয় সংগ্রামের নয় সহযোগিতার ও স্বপ্নচারিতার। দ্বিতীয় পথটি লেখকরা বেছে নেয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে সান্ড্না খোঁজে অবুঝ কল্পনায়। কল্পনায় ইসলামধর্মীদের কাছে বর্হিশক্তি হয় পরাজিত। পীর ফকিররা দেখান কেরামতি। বুজরুকিতে মাত হয় সবকিছু। লায়লি-মজনু, গুলেবাকাওলি, শয়ফুমূলক বদিউজ্জামালের মত রোমান্টিক প্রণয়াপোখ্যাস থেকে তথাকথিত ঐতিহাসিক লৌকিক কাহিনী

মোগলদের সংস্কৃতির ভাষা ছিল হিন্দি ও উর্দু। সাধারণভাবে এগুলো 'হিন্দুস্থানী' ভাষা বলে পরিচিত। উর্দু মূলে সারা ভারত, ইরান ইত্যাদি সহ মিশ্র ভাষা- ভাষীর সৈনিকদের ভাব আদানপ্রদানের সুবিধার জন্য ক্যম্পে ভাষা হিসাবে একদা গড়ে উঠলেও পরে তা উত্তর ভারতীয় অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষের ব্যবহৃত ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। উর্দু আরবি হরফে লেখা হয় বলে, এর অক্ষরকে ইসলামী ঐতিহ্যের স্মারক হিসাবে মুসলমানরা একে হিন্দির চেয়ে বেশি নিজেদের ভাষা বলে মনে করতে থাকে। উপরন্ত, মুহম্মদি আন্দোলনের প্রবর্তক সৈয়দ আহমদ বেরিলবি বা শাহ ওয়ালিউল্লাহ'র প্রচারের মাধ্যমে ছিল উর্দু। যেসব বই পত্র এসময় লেখা হয় তার বেশকিছু ছিল উর্দুতে। পরে আলীগড় আন্দোলনের মাধ্যমও হয় উর্দু। স্যার সৈয়দ আহমদও উর্দু ভাষার সমৃদ্ধির জন্য খুবই সচেষ্ট ছিলেন।

বাংলাদেশে মোগল ও নবাবী আমলে উত্তর ভারত থেকে যেসব লোক এসে বসবাস করতো তাতের ভাষা মাধ্যম মোটামুটিভাবে ছিল উর্দু। একই ধর্মের হওয়ায় বাংলার আশরাফ শ্রেণী উর্দুসহ এই তথাকথিত মুসলিম তাহজিব ও তমদ্দুনকে নিজের মনে করে আছকড়ে ধরার প্রয়াস পেতো। ১৯২৫-এ 'জার্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব

[৩১] ফারায়িজি আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন হাজী শরীয়তউল্লাহ। এ আন্দোলন ছিল ধর্মীয়, পরে কৃষক, এরপর রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়।

বেঙ্গল'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ 'এ বেঙ্গলি রিট্ন ইন পারসিয়ান স্ক্রিপট'-এ আছে, 'জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক ১২১৫ বঙ্গাব্দে (অর্থাৎ ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে) তাঁর মৃত্যু শয্যায় শপথ করান যে তাঁর একমাত্র পুত্র বাংলা শিখবে না, কারণ এতে সে নিচু হয়ে যাবে। বাংলার মুসলমান ভদ্রলোকরা ফারসিতে লিখতেন এবং কথা বলতেন হিন্দুস্থানীতে (অর্থাৎ উর্দুতে)।'[৩২] এদেশের ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও এই চেতনা ছিল অত্যন্ত প্রকট। বাংলার ফরিদপুরের অধিবাসী হয়েও নবাব আবদুল লতিফের মত প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিত্বেরও উর্দুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল। তিনি বাংলা ভাষা কেবল আতরাফ মুসলমানদের জন্য রাখতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাও সংস্কৃত শব্দাবলী ছাঁটাই করে। লতিফের সোসাইটি ভাষা ছিল উর্দু, ফারসি ও ইংরেজি।[৩৩] এর সভায় এই তিন ভাষাতেই আলোচনা বক্তৃতা হতো, বাংলায় নয়। এ যুগের অন্যান্য থ্যাতনামা ব্যক্তি, যেমন আমীর হোসেন, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখও ছিলেন উর্দুর পক্ষপাতী।

মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, দরগা প্রভৃতি ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত স্থাপত্য নির্দশনগুলোসহ প্রাসাদ, মিনার, স্মৃতিসৌধ, মাজার দুর্গ, প্রকার ইত্যাদি হলো মুসলমান যুগের স্থাপত্য শিল্প কীর্তি। ইসলাম ধর্ম অনুসরণে সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে এর কিছু কিছু সৃষ্টি। এসব তৈরির রীতিনীতি মুসলমানরা গ্রহণ করেছে নানা দেশ থেকে প্রাচীন ইরান, গ্রীস, বাইজেন্টাইন ইত্যাদি থেকে। তবে গম্বুজ, মিনার ইত্যাদির আদিসৃষ্টি ভিন্ন দেশে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে হলেও, মুসলমানরা এগুলো এত বহুল পরিমাণে ব্যবহার করছে যে ইসলামী স্থাপত্যরীতি বললে যেন এখন এগুলোই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সদাসর্বদা। আহমদ হাসান দানী'র মত বিশেষজ্ঞ-পন্ডিত ব্যক্তিগণ মুসলমানকৃত এ ধরনের নানা স্থাপত্যকর্মকে 'মুসলিম স্থাপত্যশিল্প' বলতে ইচ্ছুক! কেউ কেউ অবশ্য এর সম্মিলিত নাম 'ইসলামী শিল্পকলা'ও বলেন। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার খিলান, গম্বুজ, মিনার এবং মিহরাব যেমনি এই শিল্পে ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি ব্যবহৃত হয়েছে জেরুজালেম বা

[৩২] সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, পূবোক্ত পৃ- ৩০৫
[৩৩] ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, 'বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য' ইফাবা, তারিখ বিহীন পৃ- ৩০৮

দামেস্কের সবুজ ও সোনালি রঙের মোজাইক অথবা পারসিক টালিকাজের চমৎকার রং কিংবা বাংলার অতীত ঐতিহ্যের অনুসরণে পোড়ামাটির ফলক। আবার, প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসনে মানুষ এবং প্রাণী অঙ্কন নিষিদ্ধ থাকায় হাজারো রকমের জ্যামিতিক নকশার অলঙ্করণে অথবা লিপি- শৈলীতে অট্টালিকাগুলো হয়েছে সুচারু ও সুসমৃদ্ধ।

ইসলাম সামন্তবাদের ধর্ম নয়। ধনবাদেরও নয়। পবিত্র কুরআনে আছে, 'আসমান এবং জমিনে যা আছে তার সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ।' 'সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহরই রয়েছে।'[৩৪] 'সম্পদ যেন তোমাদের বিত্তশালীদের হাতে কুক্ষিগত না হয়ে যায়।' 'যারা সোনারূপা জমা করে রাখে ও তা আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় না করে, তাদেরকে কষ্টদায়ক কঠিন আজাবের খবর দাও।'[৩৫] রসূল (সঃ) বলন, 'যে ব্যক্তি দাম বাড়ার জন্য খাদ্য মজুদ করে সে পাপী।' 'খাদ্যদ্রব্যের মজুতদার অভিশপ্ত।' 'খাদ্যদ্রব্যের বাজারের ব্যাপারে ষড়যন্ত্র করে যে মূল্য বৃদ্ধি করে সে এত জঘন্য হয়ে পড়ে যে আল্লাহ তাকে দোজখের ভয়ানক অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করবেন।' 'হে মুমিনগণ, পরস্পরে অবৈধ উপায়ে একে অপরের অর্থসম্পদ হজম করে ফেলো না। ধন- সম্পকদে ক্ষমতাশালী লোকদের নৈকট্য লাভের বাহন হিসাবে ব্যবহার করো না। মানুষের অর্থ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না, যেখানে তোমরা এর পরিণাম সম্পর্কে অবগত রয়েছে।' 'যে ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। ধ্বংস অনবির্য সে- সব লোকদের জন্য যারা ওজনে কম দেয়।'[৩৬] 'যেসব ব্যক্তির নিজ শক্তি- সামর্থের সরঞ্জাম নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি রয়েছে তাদের উচিত অতিরিক্ত সম্পদ গরিব- দুঃখীদের বিতরণ করা।' এমনি অনেক উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কি সামন্ততন্ত্র, কি ধনতন্ত্র উভয়েরই বিপক্ষে দাঁড়িয়ে ইসলাম। অবশ্য হজরত মুহম্মদ (সঃ) বা খোলাফায়ে রাশেদিনের রাজ্য- বিজয় দেখিয়ে সামন্তবাদীরা উদাহরণ দিতে পারে যে, বাস্তবে এই সমস্ত প্রথা অনুসৃত। অথবা, ব্যবসা-বাণিজ্য করার উৎসাহ প্রদানের যেসব কথা কুরআন

[৩৪] সূরা বাকারা : ২৮৪
[৩৫] সূরা তাওবা : ৩৪
[৩৬] সূরা মুতাফ্ফীন : ১

শরীফে আছে (যেমন, 'উত্তাল তর ঙ্গময় সমুদ্রের ওপর তোমাদের এমন ক্ষমতা ও অধিকার দিয়েছেন যে তোমরা তাতে তরি ভাসিয়ে জীবিকার সন্ধানে দেশ- দেশান্তর ছুটে চলো। আর আল্লাহ, তোমাদের চলাফেরা এবং আমদানি রপ্তানির সুযোগ- সুবিধার সৃষ্টি করেছেন।') সেসব দেখিয়ে ধনবাদীরাও স্বাচ্ছন্দে তাদের নীতি বর্হিভূত সম্পদ জমা করতে উৎসাহ বোধ করেছেন, অথচ হযরত মুহাম্মদ (সা:) তাঁর সাহাবীরা সবাই এসব ব্যাপারে নিয়ম বর্হিভূত ভাবে সম্পদ জমা করতে নিষেধ করেছেন।

খ) বর্তমান বাংলাদেশী মুসলিমগণের ধর্মপালন ও ইসলামী বিধি-বিধান ঃ-

মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় ও অতুনলনীয়। এই বিশ্বাসের নাম তাওহীদ। তাওহীদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। ইসলামী পরিভাষায় একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ইবাদাত ও আনুগত্যের যোগ্য একক সত্তা হিসেবে স্বীকার ও বিশ্বাস করাকেই তাওহীদ বলে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেন-[১] (

)

অর্থ ঃ "আসমান ও জমিনে যদি আল্লাহ ব্যতীত একাধিক ইলাহ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।"

ইসলামের যেসব মূল বিষয়ের ওপর বিশ্বাস করতে হয়,[২] গুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের মূল হল তাওহীদ। ইসলামের সকল শিক্ষাই তাওহীদে বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত যে অসংখ্যা নবী- রাসূল মানুষের হিদায়াতের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। এই সংগ্রামে নবী- রাসূলগন নির্মম নির্যাতন সহ্য করেছেন। হিজরত করতে বাধ্য হয়েছেন।

এক আল্লাহর প্রভুত্ব স্বীকার করে নিলে অসংখ্যা সৃষ্টির দাসত্ব করা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাওহীদে বিশ্বাসী মানুষ অন্যকোন শক্তির সামনে মাথা নত করে না। তাওহীদে বিশ্বাস মানুষের মধ্যে আত্মসচেতনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলে। এ বিশ্বাস সকল সৃষ্টির মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে। তাওহীদে বিশ্বাসের ফলে উদার দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়। তাওহীদে বিশ্ববাসীকে কোন কিছুই তাঁর সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। তিনি সৎকর্মের প্রতি অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হন।

---

[১] সূরা আল- আম্বিয়া : ২২

[২] ইসলামের মূল বিষয় পাঁচটি : তাওহীদ (কালিমা), নামাজ, রোযা, হাজ্জা ও যাকায়াত।

মহান আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। যেমন সূরা ইখলাস:[৩] যার অর্থ এই: আল্লাহ একক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি জনক নন এবং জাতক ও নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। আল্লাহ এমন সত্তার নাম যিনি চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি সর্বগুণের অধিকারী এবং সর্বদোষ থেকে মুক্ত। তিনি কোন এক বা একাধিক উপাদান দ্বারা তৈরি নয়, তার মধ্যে একাধিকত্বের কোন সম্ভাবনা নেই এবং তিনি মুখাপেক্ষী নন তিনি কারও তুল্য ও নয়।

উক্ত সূরাতে এটাই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর "যাত" ও সিফাতে কোন প্রকার শিরক করা যাবেনা। "যাতে" শিরক না করলেও বাংলাদেশের কোন কোন ব্যক্তি বা সূফীকে আল্লাহর গুণাবলীতে শিরক করতে দেখা যায়। আমরা জানি যে, মহান আল্লাহর ৯৯ টি গুণবাচক নাম রয়েছে। এ সব গুণের ৭/৮[৪] টি স্থায়ী ও বাকিগুলি অস্থায়ী গুণ। যেমন: আল্লাহ রাযযাক। আল্লাহ রিযকদাতা। কেউ যদি মনে করে অমুক ব্যক্তি আমার রিযক দাতা। এক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শিরক হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা সন্তানদাতা। কেউ যদি মনে করেন, অমুক পীরের দরবারে গেলে সন্তান পাওয়া যায়; এক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শিরক হবে। অথচ মহান আল্লাহ শিরককে সব চাইতে বেশী ঘৃণা করেন[৫]। তিনি বলেন, আমি শিরক ছাড়া সব কিছু ক্ষমা করতে পারি। আমরা জানি, সিজদা পাবার একমাত্র পাত্র আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা করার অনুমতি নেই। আমাদের দেশের কোন কোন মুরীদ তার পীরকে কদমবুচি করতে গিয়ে সিজদা করতে দেখা যায়; অথচ পীর তার মুরিদকে কিছুই বলেননা।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে গোড়ার দিকে প্রধানত সূফী-সাধকদের দ্বারাই ইসলামের প্রচার হয়েছে।[৬] প্রাথমিক যুগের সূফীগণ শিরক এর ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী যুগের কোন কোন পীরকে এ ব্যাপারে অসতর্ক দেখা যায়। এরা সত্যিকারে পীর

---

[৩]আল কুরআন, সূরা- ১১২:১-৪

[৪]মাতুরিদী সম্প্রদায় মনে করে, ৮টি সিফাত স্থায় এবং আশাইয়া সম্প্রদায় মনে করে, ৭টি সিফাত স্থায়ী।

[৫] কবীরা গুনাহর সংখ্যা ১২টি। এর মধ্যে শিরক সবচাইতে ব গুনাহ।

[৬] আবদুল বাকী, মুহা, ড., 'বাংলাদেশে আরবী, ফারর্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা ইফাবা, ২০০৫, পৃ: ২৫

নয়; বরং ধর্ম ব্যবসায়ী। আমরা জানি, পৃথিবীতে অগণিত সূফী তরীকা রয়েছে।[৭] এছাড়া রয়েছে শরীয়তপন্থী আলিম। শরীয়তপন্থী আলিমগণ শিরক এর ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ। সারা দুনিয়ার সূফী-সাধকগণ দু' শ্রেণী বিভক্ত: কোন কোন সূফী "ওয়াহদাতুল ওযূদ"[৮] এর সমর্থক, আবার কোন কোন সূফী "ওয়াহদাতুশ শুহূদে"র সমর্থক।

যাঁরা "ওয়াহদাতুল ওযূদ" এর কায়েল। তারা যিকর করেন, "লা মাউজূদা ইল্লাল্লাহ"[৭]আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। তারা মনে করেন, জগতগুলি আল্লাহর ছায়া। আল্লাহর প্রতিচ্ছবি।[৯] তারা মনে করেন, এক সূর্য পৃথিবীর বিভিন্ন নদী-নালায় অগণিত সূর্য মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে সূর্য একটিই। তারা আরো মনে করে, মাকড়সা নিজের রসে জাল বুনে। জালটি মাকড়সারই রস অর্থাৎ জালটি মাকড়সারই অংশ। তারা বলতে চাচ্ছেন, এ জগত স্রষ্টারই রস ও স্রষ্টারই অংশ। এ দৃষ্টিতে তারা মনে করেন, এ পৃথিবী স্রষ্টার অংশ। তারা ও পৃথিবীর অংশ। পীরেরাও স্রষ্টার অংশ। তাই পীরকে সিজদা করলে স্রষ্টাকেই সিজদা করা হয়। আমাদের দেশের কোন কোন সূফী সে মতের সমর্থক।[১০] এতেই স্রষ্টার সাথে শিরক হয়। বাংলাদেশের বেশীর ভাগ সূফী-সাধক "ওহদাতুশ শুহূদে"র সমর্থক।

ইসলামের স্তম্ভ ৫ টি: যথা শাহাদাত, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ।[১১] শাহাদাত মানে মহান আল্লাহর এক ও অদ্বিতীয় এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার করা। আল্লাহ ও রাসূল কে স্বীকার করে নিলেই রাসূলের আদেশ নিষেধ মুখে স্বীকার, অন্তরে বিশ্বাস ও কার্যে প্রকাশ করতে হয়।[১২] আমাদের দেশের কেউ কেউ মনে করেন, কালেমা মুখে বললেই অর্থাৎ তাদের জন্য নাজাত মিলবে[১৩] তা কিন্তু নয়। কেননা কালেমা বা শাহাদাত বাক্যটি জামে-মানে বাক্য। এর অন্তর নিহিত তাৎপর্য রয়েছে। এ

[৭]সূফি তরীকার আনুমানিক সংখ্যা ২০০ (মুসলিম দর্শনের ভূমিকা)
[৮]এক সত্ত্বায় অস্তিত্বে বিশ্বাসী।
[৭]এই মতের অনুসারীদেরকে মায়াবাদী বলা হয়।
[৯]এই মতের অনুসারীদেরকে মায়াবাদী বলা হয়।
[১০]মতটি ইবনুল আরাবীর।
[১১]ঈমাম মুসলিম, আস্- সহীহ, লি- মুসলিম, ১ম খন্ড করাচী, তারিখ বিহীন পৃ: ৩২
[১২]আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও কার্যের প্রকাশের নাম ঈমান।
[১৩]মুর্জিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করেন, যে ব্যক্তি কালিমা পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই।

বাক্যটি অনেকটা ইজাব-কবূল এর মত। ইজাব-কবূলের মাধ্যমে স্ত্রীকে বরণ করে নিলেই স্ত্রীকে খোর-পোষ ও বাসস্থান ইত্যাদি দিতে হয়। অনুরূপভাবে শাহাদাত বলার সাথে সাথে শাহাদাতের Demand বা চাহিদাগুলো পূরণ না করলে সত্যিকার ভাবে শাহাদাত হয় না।

শাহাদাত মানে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই। তার কোন সমকক্ষ নেই। তার নামে বা গুণাবলীতে কাকেও শরীক করা যাবেনা। আমাদের দেশের বহুলোক জেনে হোক, অজান্তে হোক তার গুণাবলীতে শিরক করে থাকে। যা সত্যিকার ইসলামের সাথে সাঙ্গর্সিক।

নামায ইসলামের ২য় স্তম্ভ । পবিত্র কুরআনে ৮২ স্থানে নামায পড়ার তাগীদ এসেছে। বলা হয়েছে[১৪]

অর্থাৎ নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও।

আল্লাহ তাআলার নিকট বান্দার আনুগত্য প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হল সালাত। সালাতের মাধ্যমেই আল্লাহর নিকট বান্দার চরম আনুগত্যের প্রকাশ পায়।

সালাত অর্থ দুআ। সালাতে বান্দা তাঁর প্রভুর নিকট দুআ বা প্রার্থনা করে বলেই এর নামরণ করা হয়েছে 'সালাত'। ইসলাম পাঁচটি রুকনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পাঁচটি রুকন হল "কালিমা, সালাত, যাকাত, সাওম ও হাজ্জ। সালাত ইসলামের দ্বিতীয় রুকন। কালিমার পরেই সালাতের স্থান। দিনরাত পাঁচ ওয়াক্তের সালাত মানুষকে জীবনের প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধানের ওপর অবিচল থাকার অনুপ্রেরণা দান করে ভুল-ভ্রান্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর আইন মেনে চলার উৎসাহ দান করে। পবিত্র কুরআনে বার বার সালাত কায়েম করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- ( )

[১৪]আল কুরআন, সূরা : ৭৩-২০

অর্থ : "সালাত কায়েম কর।"[১৫]

সালাত একা একা না পড়ে জামাআতের সাথে কায়েম করার জন্য বলা হয়েছে :

( )

অর্থ : "তোমর কুকূকারীদের সাথে রুকূ কর।"[১৬]

অর্থাৎ জামাআতবন্ধ হয়ে সালাত কায়েম কর। নবীজী বলেন, "জামাআতে সালাত আদায় করলে একাকী পড়ার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।"

সালাত মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে। আল্লাহ বলেন :

( )

অর্থ : "নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।"[১৭] হুযূর আক্‌রাম (স) বলেন, "যে ব্যক্তি মনোযোগ সহকারে সালাত আদায় করে, কিয়ামতের দিন ঐ সালাত তার জন্য নূর হয়ে দাঁড়াবে।" একদা নবীজী সাহাবীদের বললেন, "যদি কারও বাড়ির পাশ দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হয়, আর যদি প্রতিদিন কোন ব্যক্তি ঐ নদীতে গোসল করে, তবে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে?" সাহাবীগণ উত্তরে বললেন, "না, হে আল্লাহর রাসূল।" তখন হুযূর (স) বললেন, "পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও ঠিক তেমনি তাঁর গুনাহ্‌সমূহ দূর করে দেয়।" সালাত আদায়কারী নিষ্পাপ হয়ে যায়। সালাত ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী।

শরীআতের অনুমোদিত কারণ ছাড়া কোন অবস্থাতেই সালাত ত্যাগ করা যাবে না।

সালাত ঈমান মজবুত করে। সালাতের মাধ্যমেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। সালাত মানুষের দেহও মনকে সকল প্রকার পাপ ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে। মানুষ

---

[১৫]সূরা বানী ইসরাঈল : ৭৮
[১৬]সূরা আল বাকারা : ৪৩
[১৭]সূরা আল আনকাবূত : ৪৫

যখন সালাত আদায় করে তখন যাবতীয় পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার জণ্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। সালাত আদায়কারীকে আল্লাহ মাফ করে দেন।

সালাত আদায়ে শুধু যে বান্দার উন্নতি হয় তাই নয়। সামাজিক ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। জামাআতে সালাত আদায় করলে মুসলামানগণ দৈনিক পাঁচবার একত্রে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে একে অপরের খোঁজ খবর নিতে পারে। তাদের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। জামাআতে একে অপরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাশাপাশি দাঁড়াতে হয়। এভাবে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার শিক্ষা সালাত থেকে পাওয়া যায়। সালাতে রুকূ সিজদাহ্ যথা নিয়মে করতে হয়। এতে নিয়ম- শৃংখলা মেনে চলার শিক্ষা পাওয়া যায়।

পবিত্র কুরআনে নামায কায়েম করতে আদের্শ দেয়া হয়েছে :[১৮]

( )

নামায কায়েম কয়েকটি পন্থায় হতে পারে ঃ যথা (ক) আহকাম-আরকানকে গুরুত্ব দিয়ে নামায আদায় করা, (খ) খুদূ ও খুশূ এর সাথে নামায আদায় করা ও (গ) পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিকমত আদায় করা।[১৯]

এমন নয় যে, দিনে দু'বেলা নামায আদায় করা-তিন বেলা ছেড়ে দেয়া। যাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে।[২০] অতএব দূর্ভাগা সে সব নামাযীর

আমাদের দেশে কেউ কেউ নামায পড়েনা। পড়লেও আহকাম ও আরকানকে গুরুত্ব দিয়ে নামায পড়েনা। আহকাম ও আরকানকে গুরুত্ব দিলেও খুদূ ও খুশূও সাথে নামায আদায় করছেনা বা রীতিমত নামায আদায় করছেনা।

---

[১৮]সূরা আল বাকারা : ৩

[১৯]বাখযাবী

[২০]আল কুরআন, সূরা মাউন- ১০৭, ৫-৬

আমাদের দেশের মারেফাতের দাবীদার, কেউ কেউ দাবী করছেন যে, তাদেরকে নামায পড়তে হয়না। তাদের মতে তরীকতের এক পর্যায়ে নামায পড়তে হয়না। তারা নিজেদেরকে ফকীর সন্ন্যাসী বলে দাবী করে। তাদেরকে কলন্দরিয়া ও বলা হয়।[২১]

নামায কে জামাতের সাথে আদায় করতে হয়। কেউ কেউ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নামায জামাতে আদায় করে না। আমাদের উপমহাদেশে প্রধানত সূফী-সাধকগণের দ্বারা ইসলামের প্রচার ও প্রসার হয়েছে। সূফী-সাধকগণ ফরয নামাযের সাথে নফল নামায পড়াকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আমাদের দেশের ইসলাম ওMiddle East এর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য মনে হয়।

সাওম ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। সাওম অর্থ বিরত থাকা। ইসলামী পরিভাষায় সুব্হে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছায় পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকার নাম সাওম।

প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নরনারীর ওপর সাওম ফরয। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-[২২]

( )

অর্থ : "তোমাদের ওপর সাওম পালন ফরজ করা হল, যেমন ফরজ করা হয়েছিল পূর্ববর্তী উম্মাতগণের ওপর, যেন তোমরা তাক্ওয়া অর্জন করতে পার।"

কুরআন মাজীদে সাওমের তিনটি মৌলিক উদ্দেশ্যে কথা বলা হয়েছে

১. তাক্ওয়া অর্জন ,২. আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা ,এবং৩. আল্লাহর শোক্র গুজার হওয়া[২৩]

---

[২১]ড. , মুহা আব্দুল বাকী, বাংলাদেশের বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত ও মতাদশ। মেরিট কেয়ার প্রকাশন, ২০০৯ পৃ: ৬৩

[২২]সূরা আল বাকারা আয়াত : ১৬৩

[২৩]ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ 'ইসলাম শিক্ষা', জা.শি. পা. বোর্ড পৃ : ৬৩

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাক বলেছেন-

( )

অর্থ : "সাওম আমারই জন্য, আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব।"[২৪]

সাওমের গুরুত্ব ও ফযীলত অপরীসীম। সাওমের সওয়াব অত্যন্ত বেশি। যে ব্যক্তি রোযা রাখে সে অশেষ পূণের অধিকারীা হয়। মহানবী (স) বলেন, "সকল সৎ কাজের পূণ্য দশ গুণ হতে সাত শত গুণ পর্যন্ত হবে, কিন্তু সাওম একমাত্র আল্লাহরই জন্য বিধায়া তার পূন্য আল্লাহ নিজেই দেবেন।"

রোযাদার ব্যক্তি নিজে সকল প্রকার কু-রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। নবীজী বলেছেন, "সাওম ঈমানদারের জন্য ঢাল স্বরূপ।"[২৫]

সাওম একটি মৌলিক ফরজ কাজ। যদি কেউ তা অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির হয়ে যায়। রমযান মাস ধৈর্যের মাস। এক মাস সাওম সাধানর মাধ্যমে বান্দার ধৈর্যের পরীক্ষা হয়। আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে রোযাদার বান্দাদের জান্নাত দান করবেন। মহানবী (স) বলেছেন- "রমযান মাস ধৈর্যের মাস ধৈর্যের মাস এবং ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত।"[২৬] এছাড়াও সাওম পালনে অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। সাওম পালনের সময় রোযাদারগণ অতিরিক্ত পূণ্যের আশায় বেশি দান-খয়রাত করে থাকেন। ফলে দরিদ্র জনগণের আর্থিক অভাব অনেকটা লাঘব হয়। সুতরাং আল্লাহর নৈকট্য লাভেল আশায় এবং সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে সকলেরই সাওম পালন করা উচিত আমরা নিষ্ঠার সাথে সাওম পালন করব।

রোযা ইসলামের ৩য় স্তম্ভ । পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে[২৭]

---

[২৪]হাদীসটি হলো হাদীসে কুদসী।
[২৫]আস- সাওমু জুন্নাতুন।
[২৬]মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ, পূবোক্ত পৃ : ৬৪
[২৭]সূরা আল বাকারা : ২- ১৮৩

রোযা পূর্ববর্তী উম্মতের ওপরও ফরয ছিল। তবে রোযার ধরণ বা সংখ্যার মধ্যে তারতম্য ছিল। যেমন: কারো ওপর মাসে তিন দিন ফরয ছিল। কারো বছরে ১০ দিন ইত্যাদি। রোযা শারীরিক ইবাদত। রোযার ব্যাপারে হাদীসে কুদসীতে আছে[২৮]

( )

মহান আল্লাহ বলেন, রোযা আমার জন্য। আমি স্বয়ং রোযাদার কে প্রতিদান দিব বা আমি খুদা-তার প্রতিদান হবো। রোযা ছাড়া অন্যান্য ইবাদতের প্রতিদান ফেরেশতার দ্বারা প্রদান করেন। তাই রোযার ফযিলত বা মর্যাদা অপরিসীম। তাই রোযাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আদায় করতে হয়। রোযা, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব এবং হারাম। রোযার প্রকারভেদ যথা: ১ম শ্রেণীর রোযা, ২য় শ্রেণীর রোযা এবং ৩য় শ্রেণীর রোযা। ১ম শ্রেণী রোযা হলোঃ সাহরীর সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার না করা, সঙ্গম ত্যাগ করা, নামায ঠিকমত আদায় করা, অশ্লীল কথা বার্তা না করা, সর্বদা আল্লাহর স্মরণ করা, ইবাদতে লিপ্ত থাকা। ২য় শ্রেণীর রোযা হলোঃ উক্ত সময়ের মধ্যে পানাহার না করা, সঙ্গম না করা, সময় মত নামায আদায় করা, এর সাথে অন্যান্য দুনিয়াবী কাজ কর্মও করা। ৩য় শ্রেণীর রোযা হলোঃউক্ত সময়ের মধ্যে পানাহার না করা, সঙ্গম না করা এবং অশ্লীল কথা বার্তা বা বাজে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। আমদের দেশের এক শ্রেণীর মানুষ ৩য় শ্রেণীর রোযা রাখেন অর্থাৎ তারা রোযা রাখেন ঠিকই; কিন্তু পাশা-পাশি অশ্লীল কথাবার্তা বা বাজে কথাবার্তাও চালিয়ে যান। মনে হয়, তারা রোযা রাখেন কেবল মানুষের লজ্জা শরম থেকে বাঁচার জন্য। রোযা রাখার সাথে যে নামায ও পড়তে হয় তা তারা গুরুত্ব দেন না। অথচ নামায ও রোযার ন্যায় ফরয। এ সকল লোক রমযানের প্রথম দিকে তারাবীর নামায পড়তে যায়; কিন্তু ২য় ও ৩য় সপ্তাহে তাদেরকে আর মসজিদে দেখা যায় না।

আমাদের দেশে অন্য এক শ্রেণীর লোক, যারা ২য় শ্রেণীর রোযা রাখেন। অর্থাৎ তারা রোযা রাখেন, নামায পড়েন এবং অন্যান্য দুনিয়াবী কাজ করতেও তাদেরকে দেখা যায়।

[২৮]আন- নুখাবুন্ আরাবিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- ১৯৯২,পৃ : ৯৮

এদের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি। তবে তাদের কে ১ম শ্রেণীর রোযা রাখার চেষ্টা করা উচিৎ।

আমাদের দেশে আরো এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা ১ম শ্রেণীর রোযা রাখেন। তারা মনে করেন, রোযা ১২ টি মাসের মধ্যে একটি মাস। যে মাসের ইবাদতের সওয়াব অন্যান্য মাসে ইবাদতের সওয়াবের চাইতে অনেক বেশী।

সূফী-সাধক-পীর দরবেশ এবং খাটি আলিম-উলামা এই শ্রেণী ভূক্ত। এরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে রোযা রাখেন; নামায পড়েন; সারা মাস ইবাদতে মশগুল থাকেন ও রাত-দিন সর্বদা আল্লাহর ধ্যানে মশগুল থাকেন। এরা ১ম শ্রেণীর মুত্তাকী।[২৯]

যাকাত ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনযাপনের জন্য সম্পদ দান করেছেন। সকল মানুষ সম্পদের অধিকারী নয়। কারও কম আবার বেশি। ধনীর সম্পদে আল্লাহ তাআলা গরীবের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। গরীবের সাহায্যের জন্য যাকাতের ব্যবস্থা করেছেন।

যাকাতের আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধি। শরীআতের পরিভাষায়, মুসলমানদের ধন-সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ বছর পূর্তিতে আল্লাহর নির্ধারিত খাতসমূহে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়। গুরুত্বের দিক দিয়ে সালাতের পরই যাকাতের স্থান। যাকাত সম্পর্কে পাক কুরআনে বলা হয়েছে-[৩০]

( )

অর্থ : "সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও।" (সূরা আন্‌নূর : ৫)

[২৯]মুত্তাকী তিন প্রকার : ১ম শ্রেণী মুত্তাকী, ২য় শ্রেণী মুত্তাকী ও ৩য় শ্রেণী মুত্তাকী।
[৩০]সূরা আন নূর আয়াত : ৫

এ সম্পর্কে নবী কারীম (স) বলেছেন, "যাদের ওপর যাকাত দেওয়া ফরজ, তারা যদি তা আদায় না করে, তবে আল্লাহ তাআলা পরকালে কঠোর শাস্তি দেবেন।"[৩১]

বস্তুত কোন মুসলমান যাকাত না দিয়ো মুসলমান থাকতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, "মুশরিকদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, কারণ তারা যাকাত দেয় না। সুতরাং যাকাত না দেওয়া মুশরিকদের কাজ।

যাকাত আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত বিধান যাকাত অস্বীকার করা আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকার করার শামিল। ইসলামী আইনে যাকাত দানে উপযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই তা আদায় করতে হবে।

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বক্‌র সিদ্দীক (স) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে ঠিক সেভাবেই যুদ্ধ করেছিলেন, যেভাবে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। যাকাতদানের অস্বীকারকারীকে তিনি (মুরতাদ) ইসলামচ্যুত বলে গণ্য করেন।[৩২]

যাকাত দানের মুখ্য উদ্দেশ্য হল গরীবদের অবস্থার পরিবর্তন করা, যাতে তারা আর্থিকভাবে সচ্ছলতা লাভ করতে পারে, এবং অভাব থেকে মুক্তি পায়।

আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় করে এর দ্বারা অনেক গরীব লোকের কর্মসংস্থান করা যেতে পারে। বেকারদের কর্মসংস্থান করতে পারলে সমগ্র দেশে এক দিন আর অভাবী লোক দেখা যাবে না। ফলে দেশের শান্তি- শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। নিয়ম মত যাকাত দিলে ধনী- দরিদ্রের বৈষম্য থাকবে না। কাজেই ধনীদের বিধিমত যাকাত আদায় করা উচিত।

যাকাত ইসলামের ৪র্থ স্তম্ভ। পবিত্র কুরআনে যাকাত প্রদানে অতি তাগীদ এসেছে। যাকাত নামযের মতই গুরুত্বপূর্ণ। যাকাত মালী ইবাদাত। যারা নিসাব পরিমাণ মালের

---

[৩১]ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ পূরোক্ত পৃ : ৬২
[৩২]মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ পূরোক্ত পৃ : ৬৩

মালিক এর সাথে কতগুলো শর্ত পাওয়া সাপেক্ষে যাকাত ফরয। পবিত্র কুরআনে নামাযের পাশা-পাশি যাকাতের কথা স্থানে উল্লেখ হয়েছে। বলা হয়েছে।[৩৩]

নামায পড়ো এবং যাকাত দাও। ধনী লোকদের ওপর যাকাত ফরয। যাকাত ২য় হিজরী সনে ফরয হয়েছে।[৩৪] এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। মহানবী (সা:) যুগে যারা যাকাত দিতেন। মহানবীর ইন্তিকালের পর তাদের কেউ কেউ যাকাত দিতে অস্বীকার করেন। হযরত আবূ বকর তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন। হাদীসে আছে।[৩৫]

উল্লেখ্য, হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর খলীফা হওয়ার পর তাকে কতগুলো সমস্যার সম্মুখীন হতে হল। এসবের মধ্যে ছিল যাকাত অস্বীকারকারী। হযরত আবূ বকর কঠোর হস্তে তাদেরকে দমন করেন এবং যাকাত প্রদানে বাধ্য করেন।

উল্লেখ্য যাকাত আদায়ের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে।[৩৬]

রাষ্ট্রনায়ক যাকাত আদায় করে ফকীর।[৩৭] মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করার কথা রয়েছে। এই আদেশ ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য। আমাদের দেশ যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র নয়; বরং মুসলিম রাষ্ট্র। এখানে সে আদেশের কার্যকারিতা নেই। আমাদের দেশে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দিয়ে থাকে। আমাদের দেশে বহু লোকের উপর যাকাত ফরয হলেও কম লোকেই যাকাত আদায় করে থাকেন। অথচ যাকাত নামায রোযার মতই ফরয। আমাদের অনেকে নামায পড়েন। রোযা রাখেন; কিন্তু যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাকাত প্রদান করেন না। যার ফলে বাংলাদেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে চলেছে। আমাদের দেশের অনেক লোক রমযান মাসে যাকাত প্রদান করেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ মানুষকে দেখানোর জন্য যাকাত প্রদান করে। যেমন: রমযান

---

[৩৩]সূরা আল বাকারা : ২-৪৩
[৩৪]দ্বিতীয় হিজরী সনের যাকাত ফরজ হয়।
[৩৫]ঈমাম মুসলিম, পূর্বোক্ত পৃ : ৩৭
[৩৬]মুসলিম শরীফ : ঐ
[৩৭]ফকীর যাদের কিছু সম্পদ আছে এবং মিসকীন যাদের কিছু নেই।

মাসে গরীব-মিসকীনকে দাওয়াত করে লাইনে দাড়িয়ে যাকাতের কাপড় প্রদান করেন। এতে মাঝে মধ্যে দূর্ঘটনায় বহু মানুষকে মরতে দেখা যায়। ইবাদতে রিয়া থাকলে ইবাদাত হয় না। যাকাত প্রদানে যদি রিয়া থাকে তবে যাকাত কবূল হয় না। রিয়া যাকাত কবূল না হওয়ার অন্তরায়; অথচ দান-খয়রাতের ব্যাপারেও বলা হয়েছে: "তুমি ডান হাতে দান করো যাতে বাম হাতে জানতে না পারে।" বাংলাদেশে যত ধনী লোক আছে তারা যদি রীতিমত যাকাত প্রদান করতো তবে বাংলাদেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এত বৈষম্য থাকতো না। এ ব্যাপারে আলিম-উলামা সোচ্চার হওয়া উচিৎ। তারা জুমুআর দিন বা ওয়ায-নসীহতে যাকাত প্রদান না করার কুফল বর্ণনা করে জনসাধারণের মধ্যে এ ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করা উচিত।

বাংলাদেশে কোন কোন লোককে হজ্জ করতে দেখা যায়; তবে তারা যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় করেনা। অথচ যাকাত হজ্জের মতই ফরয। বাংলাদেশের অনেক ব্যবসায়ীকে ঘন ঘন হজ্জ করতে দেখ যায়, কিন্তু তারা ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল ভাবে করেনা। তারা সিন্ডিকেট করে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বা মাল-পত্র ওজনে কম দেয়।

ইসলামের হাজ্জের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই স্বামর্থবানেক হাজ্জ করতে হুকম দেওয়া হয়েছে। হাজ্জ অর্থ সংকল্প করা, ইচ্ছা করা। ইসলামী পরিভাষায় হাজ্জ অর্থ নির্দিষ্ট দিনসমূহে পবিত্র কা'বা ও নির্ধারিত কয়েকটি স্থানে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত অনুষ্ঠান পালন। হাজ্জ ইসলামের পঞ্চম রক্ন। হাজ্জ ঐ সমস্ত ধনী মুসলমানদের ওপর ফরয যাঁরা পবিত্র মক্কায় যাতায়াত ও হাজ্জক্রিয়া সম্পাদন করার মত আর্থিক দৈহিক সঙ্গতি রাখেন।[৩৮] দরিদ্রদের ওপর হজ্জ ফরয নয়। হাজ্জ সারা জীবনে মাত্র একবারই ফরয হয়।[৩৯]

---

[৩৮] নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে এবং এর সাথে অন্যান্য শর্ত পাওয়া গেলে যাকাত ফরজ।

[৩৯] ইমাম শাফেঈ এর মতে হাজ্জ ফরজ হওয়ামাত্র আদায় করা উচিত। ইমাম আবূ হানিফের মতে, পরেও আদায় করা যেতে পারে তবে সাথে সাথে আদায় করা উত্তম।

কুরআনে কারীমে হাজ্জ সম্পর্কিত একটি পূর্ণরাই নাযিল হয়েছে। এছাড়াও কুরআনের অন্যান্য জায়গায়তেও হাজ্জ সম্পর্কিত অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে আল্লাহ তাআলা বলেন-

( )

অর্থ : "আল্লাহ উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরীফে হাজ্জ পালন করা মানুষের ওপর অবশ্য কর্তব্য। মানুষের মধ্যে যাদের সেখানে যাওয়ার সামর্থ আছে।[৪০]

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে হুযূর (স) বলেছেন-

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনেরা জন্য হাজ্জ পালন করল এবং কোন প্রকারের অন্যায় ও গুনাহ্র কাজ করল না, সে বাড়ি প্রত্যাবর্তনকালে এমন নিষ্পাপ হয়ে ফিরল, যেন অদ্য তার মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়েছে।"[৪১]

হাজ্জ ধনী মুসলমানদের ওপর ফরজ। এটা কেউ অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে। হাজ্জ পালনকারী ব্যক্তি আল্লাহর খুবই প্রিয়বান্দা। আল্লাহ তার গুনাহ্ মাফ করে দেন। মহানবী (স) বলেন, "পানি যেমন ময়লা আবর্জনা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়, হাজ্জও তেমনি মানুষের মনের ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়।"

হাজ্জের মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের স্বরূপ প্রকাশ পায়। এ মিলন কেন্দ্রে পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমান মিলিত হন। হাজ্জ মুসলমানদের বিশ্বসম্মেলন।[৪২] বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার নানা ভাষা, আকৃতি ও বর্ণের লক্ষ লক্ষ মুসলমান একই পোশাকে, একই নিয়মে হাজ্জব্রত উদযাপনে শরীক হন।

---

[৪০] সূরা আল ইমরান : ৯৭

[৪১] ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, পূর্বোক্ত পৃ : ৬৬

[৪২] ড. শফিকুল্লাহ পূর্বোক্ত পৃ : ৬৬

হাজ্জের মাধ্যমে মানুষের মন থেকে কৃপণতা, অপচয় প্রবণতা দূরীবূত হয়। আর মিতব্যয়ী হওয়ার দরুন দারিদ্র দূর হয়। অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকে। আমাদের সমাজে হাজীদের মর্যাদা ও সম্মান অনেক বেশী।

আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার কারণে সাধারণ মানুষ হাজীদের সম্মান করে থাকে। আল্লাহর আদেশ পালন ও আল্লাহর রহমত পেতে হলে ধনী মুসলমানগণ যত শ্রীঘ্র সম্ভব হাজ্জ আদায় করা উচিত।

হজ্জ ইসলামের ৫ম স্তম্ভ। ইহা শারীরিক ও মালী ইবাদত। যারা শারীরিক ভাবে সুস্থ এবং যাদের মক্কা শরীফের যাতায়াত করার সামর্থ্য আছে তাদের ওপর হজ্জ ফরয।পবিত্র কুরআনে আছে।[৪৩]

যারা শারীরিক ভাবে সুস্থ এবং যারা অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষমতাবান। তাদের ওপর হজ্জ ফরয।[৪৪]হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে সাথে আদায় করা ফরয। ইহা ইমাম শাফেয়ীর মত। ইমাম আবূ হানীফার মতে হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে আদায় করা ভাল, তবে দেরীতে আদায় করলেও চলবে। যেমন: নামায প্রথম ওয়াক্তেই ফরয হয়, তবে নামায শেষ সময়ে আদায় করলেও চলে।

বাংলাদেশের বেশীর ভাগ লোক বৃদ্ধ বয়সে হজ্জ করতে যায়। পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের লোকদের বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বে হজ্জ কার্য সমাধা করতে দেখ যায়। বৃদ্ধ বয়সের পূর্বেই হজ্জ কার্য সমাধা করা উচিত, কেননা বৃদ্ধ বয়সে হজ্জ[৪৫] করতে গেলে হজ্জের হুকুম আহকাম গুলো সঠিক ভাবে আদায় করতে সক্ষম হয়না। বাংলাদেশের কিছু কিছু ধনী লোককে ঘন ঘন হজ্জ করতে দেখা যায়। তবে তাদের মনে রাখা উচিৎ যে হজ্জ একবারই ফরয। যারা হজ্জ করতে যান তাদেরকে মনে রাখা উচিৎ, তারা যেন হজ্জকার্য সমাধা করার পর দেশে এসে কুকর্মে লিপ্ত না হন। ইবাদতে রিয়া (লোক দেখানো) থাকা

[৪৩]আল কুরআন, সূরা আলে এমরান- ৩:৯৭
[৪৪]৯ম হিজরী সনে হাজ্জ ফরজ হয়।
[৪৫] হজ্জে ৩টি ফরজ ও ৫টি ওয়াজিব রয়েছে।

উচিৎ নয়। কেননা মহানবী বাণী, যার মর্ম এই, যে ইবাদতে রিয়া থাকবে সে ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবূল হবেনা।

উপ-মহাদেশে তথা বাংলাদেশে প্রধান সূফী-সাধকগণের দ্বারা ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। প্রাচীন যুগের সূফীগণ আলিম ছিলেন। তাদের কথায় ও কাজে মিল ছিল। সমাজ জীবনে তাদের কথার দাম ছিল। তাদের কথা সমাজে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হতো। এসব সূফী শরীয়তের সাথে সাথে মারিফাতেরও চর্চা করতেন। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের সূফী-সাধকদের সে অবস্থায় দেখা যায়না। বাংলাদেশের কিছু আলিম শরীয়তপন্থী। এরা বর্তমানে সূফীদের বেদয়াতী কাজ কর্ম দেখে সূফীদেরকে ভাল চোখে দেখেনা। অন্যদিকে সূফী-সাধকগণ শরীয়তপন্থী আলিমদেরকে ভাল চোখে দেখেনা। এরা মনে করে, যারা সূফীবাদকে ভাল চোখে দেখেনা তারা ভ্রান্ত পথে আছে। বর্তমানে আলিম-উলামা ও সূফী-সাধকগণ দু'ধারায় বিভক্ত হয়ে আছে। একদল অন্য দলকে ভাল চোখে দেখেনা যা মঙ্গলজনক নয়।

উল্লেখ্য, সৌদী আরবের লোকেরা মনে করেন ইসলাম ধর্ম পুরোপুরি অনুসরণ করলেই যথেষ্ট। ইসলাম ধর্মীয় বিধানের বাহিরে গিয়ে তাসাউ্উফ অনুসন্ধান করার সুযোগ নেই। তাদের মতে, ইসলামে সূফীবাদের স্থান নেই। আহলে হাদীস সম্প্রদায় মনে করেন, ইসলামে তাসাউ্উফ আছে, তবে প্রচলিত সূফীবাদকে তারা স্বীকার করেনা। তারা মনে করে, প্রচলিত সূফী হলো পয়সা কামানোর হাতিয়ার।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সত্যিকার ইসলামী বিধানের সাথে এ দেশের কোন কোন লোকদের পালনীয় বিধি-বিধানের কোন কোন ক্ষেত্রে অমিল দেখা যায়, যা কাম্য নয়। এরূপ ক্ষেত্রে সংশোধন করে নিলেই এদেশের লোকদের কেবল কুরআন হাদীসের বিধি-বিধানের সত্যিকারের পাবন্দী বলা যাবে।

উপসংহারঃ

ইসলাম বাংলাদেশে প্রসার লাভ করেছিল প্রধানত সূফী-সাধকের ধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে। তাদের খানকাহ্ ও মক্তবসমূহ ছিল ইসলাম ধর্ম প্রচার ও শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র। সেখানে হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খৃষ্টান সকল ধর্মাবলম্বী আনা গোনা হতো। তাদের দরজা সকলের জন্য ছিল অবারিত। ফলে অমুসলিমরা ও ইসলামকে জানার ও বোঝার সুযোগ লাভ করে এবং ইসলামের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। সূফী-সাধকগণ ছিলেন উদার পন্থী। তাঁরা তাওহীদ স্বীকার ও আল্লাহ্ প্রেম লাভের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতেন। স্বভাবতই তাঁরা ইসলামের সনাতন রীতিনীতি পালনের ব্যাপারে অধিকতর সহনশীল ও উদার মনোভাব পোষণ করতেন। এই অদম্য উৎসাহী সাধকের তাওহীদ ও সাম্য-মৈত্রীর বাণী উচ্চ শ্রেণী কর্তৃক অবহেলিত হিন্দু-বৌদ্ধের সামনে এক বেহেশতী সওগাত রূপে আবির্ভূত হলো। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা নিগ্রহ-নিপীড়ন ও শ্রেণী-বিভেদের মর্মান্তিক যাতনা থেকে নিস্তার পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

ইসলাম পূর্বযুগের বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণ্যবাদের নিগড়ে কোনঠাসা ছিল।বৌদ্ধবাদ ও হিন্দুবাদের মধ্যে দস্তরমত চলছিল স্নায়ুযুদ্ধ। তাই বৌদ্ধরা ও ইসলাম ও মুসলিম শাসনকে স্বাগত জানায়।

সূফী-সাধকদের উদারনীতিক ধর্ম প্রচারের ফলে ইসলামের প্রসার ঘটলে াবটে, কিন্তু তাদের সহনশীলতার পাখার উপর ভর করে হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের কতেক আচার ও আচরণ ইসলামে অনুপ্রবেশ করতে লাগলো। স্থানীয় অধিবাসীদের মন জয় এবং বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে সূফী-সাধকগণ অমুসলিম রীতিনীতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে কিছুটা আপোষনীতি গ্রহণ করেন। নবদীক্ষিত মুসলমানরা তাদের পূর্বকার দীর্ঘ-আচরিত রীতিনীতি, বিশ্বাস ও মহাকাব্যে উল্লেখিত অতি মানব-উক্তি অব্যাহত রাখলো। এস.এম. আলীবলেন ঃ It was necessary to him over the support of the local people either by converting them by pacifying them. This implied some sort of compromise with the local customs and

beliefs …… These converts retained their long-inherited customs, beliefs and love for the old epics.

সূফী-তরীকা গুলোর মধ্যে 'চিশ্‌তিয়া' হলো অন্যতম প্রধান আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান। এই তরীকা উপমহাদেশীয় মর্যাদা লাভ করে। এই তরীকা আজমীর, কর্নাট, অযোধ্যা, লখ্‌নৌতে এমনকি বাংলাদেশেও প্রসার লাভকরে। এর কারণ ছিল, চিশতিয়া-সূফীগণ উপমহাদেশীয় পরিবেশ এখানকার ধর্মীয়ধ্যান ধারণা ও আশা-আকাংখার সাথে সমঝোতা স্থাপন করেন। তাঁরা তাদের তরীকা প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে কতেক হিন্দুয়ানীর সম-রেওয়াজের প্রতি কঠোর বিরোধিতা করেননি। পীরের সামনে মুরীদের মাথা নতকরা, পীরের হাতে দর্শনার্থীদের পানি পান করানো, নব-দীক্ষিতদের মাথা নেড়াকরা, যিকিরের আসরে গান-বাদ্য চর্চা করা ইত্যাদি হিন্দু-বৌদ্ধ রীতিনীতি অনুসরণে ইসলামের অনুপ্রবেশ করতে থাকে। নবদীক্ষিতগণ ইসলামের সাথে তাদের আগে কার আচার অনুষ্ঠানের বড় একটা মিল খুঁজে পায়। ফলে অমুসলিম পরিবেশ ও চিশ্‌তিয়া তরীকা বিপুল সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়।সূফী-সাধকদের বিভিন্ন তরীকা প্রচারের মধ্য দিয়ে পীর-মুরীদী তথা আধ্যাত্মিক সাধনায় ভক্তের একজন ধর্মগুর অবলম্বন ইসলামে একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রথা হয়ে উঠে। ভক্তগণ তাদের জীবিত পীর বাতাদের পরলোকগত আত্মার কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলো। তাদের সমাধি-ভবন তথা দরগাহ্‌ নির্মাণ করে সাঁঝের বেলায় বাতি দেয়ার প্রথা প্রবর্তন করলো। নব দীক্ষিতরা পীর-মুরীদের মধ্যে তান্ত্রিক গুরু এবং সমাধি ও দরগাহ্‌-র মধ্যে 'চৈত্য' ও 'স্তুপ' (তীর্থক্ষেত্র) এর সাদৃশ্য খুঁজে পেলো। এমনি করে পীরের প্রতি মুরীদের অতিভক্তির সূত্র ধরে পীর-পূজা ও গোর-পূজার উদ্ভব হলো।

সতর শতক থেকে স্বাধীনচেতা মোঘল সুবাদারদের উদারতার ফলে বাংলাদেশে বিদেশী মুসলমান আগমনের জোয়ার আসতে থাকে। মোঘল শাহজাদাদের অনেকেই এখানে সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সুবাদারদের ছত্র ছায়ায় অনেক ইরানী এদেশে এলেন তাঁদের আদব-কায়দা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠান নিয়ে। এমনিভাবে সতর শতক থেকে মোঘল শাসনের অবসান

পর্যন্ত সূফী-সাধকদের ধর্ম প্রচারের ফলে বাংলাদেশ তথা গোটা উপমহদেশে আর্য সংস্কৃতি এবং আরব তথা ইসলামী সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে এবং এই সংমিশ্রণের ফলে প্রচলিত ইসলামে অনেক গায়ের ইসলামী আচার ও বিশ্বাস তথা শির্ক ও বিদ্আত অনুপ্রবেশ করে।

বাংলার সূফীগণ ছিলেন উদার। ইসলাম সাম্যের ধর্ম, উদারতার ধর্ম। সূফীগণ ইসলামের সাম্য ও উদারতার ধর্মকে জনগণের নিকট তুলে ধরেন। হিন্দু ও বৌদ্ধরা এ ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। হিন্দু ও বৌদ্ধরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলে ও তাদের পূর্ব ধর্মেও রীতিনীতি সহজে ভুলতে পারেনি। ফলে তাদের দ্বারা ইসলামের মধ্যে কিছুকিছু অনৈসলামিক রীতিনীতি ঢুকে পড়ে।ফলে ধর্মে সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

যুগযুগ সঞ্চিত গায়ের ইসলামী আচরণ ও বিশ্বাস থেকে ইসলামকে মুক্ত করতে উপমহাদেশে শাহ্ ওলীউল্লাহ সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলেন। শাহ্ সাহেবের ইন্তিকালের পর মাওলানা আবদুল আজিজ, অতপর: সৈয়দ আহম্মদ শহীদ ও ইসমা□লশহীদ ধর্মীয় সংস্কারে যোগদান করেন। বাংলাদেশে হাজী শরীয়ত উল্লাহ, তারপুত্র দুদুমিয়া, মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী, মাওলানা হাফেজ আহমদ, মাওলানা আবদুল আউয়াল জৈনপুরী, হজরত আবূ বক্কর সিদ্দীকী, মাওলানা রুহুল আমিন এবং আহলে হাদীস-উলামা শির্ক ও বিদআত দূরিকরণের কাজে নিজকে নিয়োজিত করেন।কিন্তু সংস্কার আন্দোলনের কাংঙ্খিত ফল এখনও অর্জিত হয়নি। এখনও সত্যিকারে ইসলামের মধ্যে মিল ও অমিল দেখা যায়। এমতাবস্থায় ইসলামের রীতিনীতি ও শিক্ষা সংস্কৃতিতে বাংলাদেশের মুসলিমগণের কতটুকু মিল ও গড়মিল; গড়মিল হলে কতটুক ু গড় মিল? এই গড়মিলগুলো দূর করার উপায় কি? এসব প্রশ্ন মাথায় রেখে আমি আমার থিসিসটি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেছি।

এই থিসিসটি পাঠে জানতে পারবে, সত্যিকার ইসলাম কি? সত্যিকার ইসলামের সাথে এদেশের লোকদের পালনীয় বিধি-বিধানের কতটুকু মিল আছে। কতটুকু মিল নেই। মিল না থাকলে

মিল করার উপায় কি-এতে করে এদেশের মুসলিম সমাজ নিজে সংশোধনের সুযোগ পাবেন। অন্যকেও শোধরাতে পারবেন। এতে করে এদেশে ভেজাল মুক্ত সত্যিকার ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

প্রকাশিত যেসব গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে

অচ্যুত চরণ, চৌধুরী ঃ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ॥ শিলচর ঃ স্বরস্বতী লাইব্রেরী, ১৩২৪ বাংলা।

'আজীজুল হক, মোহাম্মদ ঃ বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা ॥ ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৬৯

'আবদুল কাদের, মাওলানা ঃ খুলাসাতুল্ মাসাইল ॥ করাচী ঃ এডুকেশন প্রেস, ১৯৬৯

'আবদুল কাদির, আল-কাদিরী ঃ ইয়দগার-এ-জাঁহাগীরী মা'আআইনা-এ-জাঁহাগীরী ॥ দিল্লী ঃ প্রিন্টিং প্রেস, ১৩৩৫

'আবদুল কুদ্দূস, মুহাম্মদ, মাওলানা ঃ আস্রার-এ-আউলিয়া ॥ চট্রগ্রাম ঃ ইসলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৭৬

'আবদুল গনী, মাওলানা ঃ ইশা'আতুল্ ফাতাওয়াইল্ হানাফীয়্যা-ফী-কারাহিয়াতিল্ খুৎবাতি-বি-গাইরিল 'আরাবিয়্যা ॥ দিল্লী ঃ জাইয়েদ বরকী প্রেস, তারিখবিহীন।

'আবদুল গফূর, নাসসাখ ঃ গাঞ্জ-এ-তাওয়ারীখ্ ॥ কানপুর ঃ নিযামী প্রেস, ১২৯৪

'আবদুল জলীল, বিস্মিল্ ঃ তায্কিরা-এ-শায়খ সৈয়দ জালাল-মুজাররাদ-কুনিয়াবী ॥ সিলেট ঃ দরগাহ মহল্লা, ১৯৬৭

'আবদুল মজীদ, সালিক ঃ মুসলিম সাকাফাত্ হিন্দুস্থান-মে ॥ লাহোর ঃ ইদারা-এ-সাকাফাত-এ-ইসলামিয়্যাহ।

'আবদুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম ॥ ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০

'আবদুল লতীফ, ফুলতলী ঃ মুনতাখাবুস্ সিয়ার ॥ সিলেট ঃ ফুলতলী, ১৯৭১

'আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, ড. ঃ বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য ॥ ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২

ঃ বাংলাদেশের খ্যাতনামা 'আরবীবিদ ॥ ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬

ঃ ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী ॥ ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১

ঃ বাংলাদেশের দশ দিশারী ॥ ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১

'আবদুল্লাহ, মৌলবী (খান বাহাদুর নাযিম খানের উত্তরসুরি) ঃ তাক্বিয়াতুল্ কুলূব-ফী-তাযকীরাতিল্ মাহবূব ॥ লখনৌ ঃ কওমী প্রেস, ১৮৮২

'আবদুল্লাহ, মৌলবী (ঢাকা + কলকাতা)ঃ মাখযানুল্ ফাতাওয়া ॥ কলিকাতা ঃ কলীমী প্রেস, ১৯১২

'আবদুল্লাহ, মৌলবী (পিতা-আমীর-উদ্দীন)ঃ ওসীলাতুল্ মা'আদ-ফী-ইসবাতি-মীলাদি খাইরিল্ 'ইবাদ ॥ লখনৌ ঃ মাতবা-এ-নামী, ১৮৮৫

'আবদুল্লাহ, সৈয়দ, সিলেটী ঃ শাজরাত-এ-তায়্যিবাত ॥ সিলেট ঃ নবীগঞ্জ, তারিখবিহীন।

'আবদুল্লাহ হক ফরিদী ঃ মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ বাংলাদেশ ॥ ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬

'আবদুল হাই, শরীফ ঃ নুয্হাতুল খাওয়াতির ॥ হায়দরাবাদ ঃ দায়েরা-এ-মা'আরিফ, ১৯৭০

'আবদুল হান্নান, মাওলানা ঃ 'উলামা-এ-ইসলাম-কী-দাওয়াত ॥ ঢাকা ঃ লালবাগ, ১৯৭০

'আবদুস সাত্তার, মাওলানা ঃ তারীখ-এ-মাদ্রাসা-এ-'আলিয়া ॥ ঢাকা ঃ মাদ্রাসা-এ-'আলিয়া, ১৯৫৯

আমীরুল ইসলাম, সৈয়দ ঃ বাংলাদেশ ও ইসলাম ॥ ঢাকা ঃ বাংলা বাজার, ১৩৯৪

আযাদ, বি, এ, ইসলামাবাদী ঃ চট্রগ্রাম স্মরণী ॥ চট্রগ্রাম, তারিখবিহীন।

'আযীযুল হক, মাওলানা, আল্-কাদিরী (ছিপাতলী) ঃ আল্-বোরহান, (অনুবাদ) ॥ চট্রগ্রাম ঃ হাটহাজারী, ছিপাতলী, ১৯৮৪

আসাদুজ্জামান, মোহাম্মদ (অনুঃ) ঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ॥ ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২

আহমদ 'আলী, মাওলানা ঃ লাতাইফু-শাফিয়া-বতার্দীদি-তাহ্রীফাত্-এ-মার্যিয়া-ওয়া তাস্রীফাত্-এ-ওহাবীয়া ॥ নোয়াখালী প্রেস, ১৯১৫

আহমদ উল্লাহ্, সৈয়দ, শাহ ঃ উরুয-এ-ইসলাম ॥ ঢাকা ঃ ইসলামিয়া প্রেস, ১৯২৮

আহমদ উল্লাহ্, সাইয়্যেদ ঃ আজিমপুর দায়েরা শরীফ ॥ ঢাকা ঃ আজিমপুর, ১৯৯০

আহমদ মিঞা, সৈয়দ ঃ 'আইনুন্ জারিয়া ॥ ঢাকা ঃ বাংলা বাজার অফসেট প্রেস, ১৯৬৪

'আয়ূব 'আলী, মুহাম্মদ, মাওলানা ঃ 'আকীদাতুল্ ইসলাম-ওয়াল-ইমামুল মাতুরিদী ॥ ঢাকা ঃ ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩

ইকবাল 'আযীম, সৈয়দ ঃ মাশ্রিকী বাংগাল-মে-উর্দু ॥ ঢাকা ঃ আগা সাদেক রোড, ১৯৫৪

ইকরাম, মুহাম্মদ, শায়খ ঃ রূদ-এ-কাওসার ॥ লাহোর ঃ এদারা-এ-সাকাফাত-এ-ইসলামিয়া, ১৯৭৯ (৭ম সংস্করণ)।

ইসমা'ঈল, মুহাম্মদ, শাহ ঃ দীওয়ান-এ-'আলম ॥ কানপুর ঃ কাইউমী প্রেস, ১৩২৮

'উবায়দুল হক, মাওলানা ঃ তারীখ-কী-রূশনী-মে-শীআ-সুন্নী-ইখ্তিলাফ্-আওর-উস্কী-বুনিয়াদী আসবাব্ ॥ ঢাকা ঃ জামি'আ- ইসলামিয়া, যাত্রাবাড়ী, ১৯৮৪

এলাহ বখ্শ হামিদ, মৌলবী ঃ তহ্ফাতুল্ মুহসিনীন ॥ কলিকাতা ঃ আসর-এ-জাদীদ প্রেস, তারিখবিহীন।

'ওবায়দুল হক, মুহাম্মদ, মাওলানা ঃ তায্কিরা-এ-আউলিয়া-এ-বাঙলা ॥ ফেনী ঃ হামিদিয়া লাইব্রেরী, তারিখবিহীন।

ওলী আহমদ, শাহ, সূফী, নিযামপুরী ঃ নাযমুল্ 'আকাইদ ॥ দিল্লী ঃ তযল্লী প্রেস, ১৯৩৪

কারামত 'আলী, মাওলানা, জৌনপুরী ঃ মিরাতুল হক ॥ ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৩৮৩

ঃ যখীরা-এ-কারামত ॥ কানপুর ঃ মাতবা-এ-মজীদী, ১৯২৫

ঃ মুকামি'উল মবতাদি'ঈন ॥ কানপুর ঃ মাতবা-এ-মজীদী প্রেস, ১৩৪৮

ঃ আন্ওয়ার-এ-মুহাম্মদী ॥ কলিকাতা ঃ মুহাম্মদী প্রেস, ১২৫২

খলীলুর রহমান, শাহ, কাদিরী ঃ কাসীদা-এ-না'তিয়া-ওয়া-তায্কিরাতুল্ যালযালাহ্ ॥ কলিকাতা ঃ কলিঙ্গা সা'ঈদী প্রেস, তারিখবিহীন।

খুজিস্ড়্ আখতার, সুহরাওয়ার্দী ঃ কাওকব্-এ-দুররী ॥ ঢাকা ঃ তারিখবিহীন।

গোলাম জীলানী, মুহাম্মদ, মাওলানা ঃ হিদায়তুল্ মুসাল্লীন ॥ কুমিল্লা ঃ সা'ঈদী মঞ্জিল, তারিখবিহীন।

গোলাম হাককানী, মাওলানা ঃ আত্-তাহ্কীকু-লিল-হাককানী-ফী-খাল্কি নূরি মুহাম্মদী ॥ ঢাকা ঃ ১৯৮১

জহুরুল 'আলম, মোহাম্মদ, (অনুঃ) ঃ জা'য়াল হক ॥ চট্রগ্রাম ১৯৮৭

মাওলানাজুলফিকার আহমদ, কিসমতী ঃ বাংলাদেশের সাংগ্রামী 'ওলামা পীর-মাশায়েখ ॥ ঢাকা ঃ প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৮৮ (২য় সংস্করণ)।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরীঃ জালালাবাদের কথা ॥ ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩

নাসীরুদ্দীন, মাওলানা ঃ 'ঈসায়ী মাযহাব-কিয়া-হায় ॥ ঢাকা ঃ ফরিদাবাদ, এমদাদুল 'উলূম মাদ্রাসা, তারিখবিহীন।

নাসীরুদ্দীন, সামী, মৌলবী ঃ সুহাইল-এ-ইয়ামন ॥ কলিকাতা ঃ গাউসিয়া প্রেস, ১৯১১ (২য় সংস্করণ)।

নূর মোহাম্মদ 'আজমী, মাওলানা ঃ হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস ॥ ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৬

নো'মান, মুহাম্মদ, মাওলানা ঃ তারগীবুল্ লুক্মা-ফী-তাওয়াহহুদিল্ জুম'আ ॥ লখনৌ ঃ চশমা-এ-ফয়েয-এ-'আম, তারিখবিহীন।

ফকীর মুহাম্মদ, কাযী ঃ জামি'উত্ তাওয়ারীখ ॥ কলিকাতা ঃ মুনশী ইদারাতুল্লাহ মুদ্রণালয়, ১৮৩৬

ফয়েয আহমদ, ইসলামাবাদী ঃ তযইকরায়ে জমীর (১ম খন্ড) ॥ চট্রগ্রাম ঃ আঞ্জুমান-এ-এছলাহুজ্জমীর, তারিখবিহীন।

ফাইয়ায্ মাহমূদ, সৈয়দ (সম্পাঃ) ঃ তারীখ-এ-আদাবিয়াত-এ-মুসলমানান-এ-পাকিস্তান-ওয়া-হিন্দ্ ॥ লাহোর ঃ পাকিস্তান।

ফারূক মুহাম্মদ, সৈয়দ, শাহ ঃ আদাব-এ-তরীকত ॥ কলিকাতা ঃ কলীমী প্রস, ১৩৪২

ফয়যুল্লাহ, মুহাম্মদ, মুফতী ঃ সিরাজুত্ তাবলীগ ॥ চট্রগ্রাম ঃ ফয়েযিয়া কুতুবখানা, ১৩৬৬

ঃ ইস্তিহ্বাবুদ্-দাও'আতি-ফী-নাযরিল্ মুফতীইল 'আযম ॥ চট্রগ্রাম ঃ ফয়েযিয়া কুতুবখানা, তারিখবিহীন।

ঃ আল্ ফায়সালাতুল্ জালিয়্যাহ ॥ লিল্ আহ্কামিস সামা'-ওয়া-সিজ্দাতিত্ তাহিয়্যাহ ॥ দিল্লী ঃ 'আলিমী প্রেস, তারিখবিহীন।

ঃ হিফযুল্ ঈমান-আন্-মাকাইদি দাজ্জালি কাদিয়ান ॥ চট্রগ্রাম ঃ হাটহাজারী, আনজুমান-এ-ইশাআত-এ-ইসলাম।

বদী'উল 'আলম, মুহাম্মদ, শাহ ঃ রিসালা-এ-আযকার-ওয়া-আশ্গাল্-এ-সিল্সিলা-এ-'আলিয়া-এ-জাঁহাগীরী' ॥ লখনৌ ঃ শাহী প্রেস, ১৯১১

ম'ঈন মজমাদার, 'আবদুল ঃ মজ্মাদার পরিবারের ইতিবৃত্ত ॥ সিলেট ঃ দরগাহ মহল্লা, ১৯৯১

মুখলিসুর রহমান, মাওলানা ঃ শরহুস্ সদূর-ফী-দাফি'উশ্ শুরূর ॥ কলিকাতা ঃ মুজতবাঈ প্রেস, তারিখবিহীন।

মুজিবুর রহমান, মুহাম্মদ ঃ হযরত ফুলতলী সাহেব কিবলা ॥ সিলেট ঃ মৌলবী বাজার, তারিখবিহীন।

মুস্তাফিজুর রহমান, মুহাম্মদ, ডঃ ঃ তাবীলাতু-আহলিস্ সুন্নাহ ॥ ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২, ১৯৮৬

মুহাম্মদ উল্লাহ, হাফিয, মাওলানা ঃ অসিয়তনামা ॥ নোয়াখালী ঃ চৌমুহনী, তারিখবিহীন।

মোস্তফা জামাল, সৈয়দ ঃ মাওলানা ইসলামবাদী ॥ চট্রগ্রাম ঃ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০

রফিক আহমদ, মোহরাবী ঃ যাহরুন নুযূম-ফী-তা'রিফাতিল্ ফুনূন্-ওয়াল-'উলূম ॥ চট্রগ্রাম ঃ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৪০১

রহমান 'আলী, তায়েশ, মুন্সী ঃ তাওয়ারীখ-এ-ঢাকা ॥ আরা ঃ স্টার অব ইন্ডিয়া প্রেস, ১৯১০

রহমান 'আলী, লখনৌবী ঃ তাযইকরা-এ-'উলামা-এ-হিন্দ ॥ লখনৌ ঃ নওয়াল কিশোর, ১৯১৪ (২য সংস্করণ)।

লাকীতুল্লাহ, সৈয়দ ঃ মুঝদা-এ-ফয্ল-এ-হক ॥ ঢাকা ঃ আজিমপুর দায়েরা, তারিখবিহীন।

ঃ 'অজিমপুরা দায়রা শরীফের অলীগণ ॥ চট্রগ্রাম ঃ আহছানিয়া মিশন প্রেস, তারিখবিহীন।

সরতাজ 'আলম ঃ মুসলমান্-কি-যিন্দেগী-আওর-নিযাম-এ-ইসলামী ॥ নোয়াখালী ঃ হামিদিয়া প্রেস, তারিখবিহীন।

মাইয়্যেদ আহমদ, মাওলানা ঃ 'আইনুন্ জারিয়া ॥ ঢাকা ঃ বাংলা বাজার, সেন্ট্রাল অফসেট প্রেস, ১৯৬৪

হাসান ইমাম, হোসাইনী ঃ দীনহীন রচনাবলী ॥ সিলেট ঃ হবিগঞ্জ, ১৪১১

হাবীবুর রহমান, হাকীম ঃ আসূদেগান-এ-ঢাকা ॥ ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৪৬

হামীদুল্লাহ, খান বাহাদুর ঃ আহাদীসুল্ খাওয়ানীন ॥ কলিকাতা ঃ মাযহারুল্ 'আযাইব্, ১৮৭১

অপ্রকাশিত যেসব পান্ডুলিপি থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে

(লেখকের নামের বর্ণনানুক্রমে)

'আবদুল্লাহ, সৈয়দ, মাওলানা ঃ মাস্‌নবী-এ-গাউসিয়া

ঃ মাকামা-এ-গাউসিয়া

ঃ তাশ্‌রীহ-মাস্‌নবী শরীফ

ঃ শাওয়াহিদ-এ-গাউসিয়া

ঃ হাকীকাত-এ-গাউসিয়া-ফী-সুলক্‌-এ-রাব্বানিয়াহ

ঃ 'আরব-ওয়া-হিন্দ-কে তা'আলণ্ঢকাত। (উলিণ্ঢখিত পান্ডুলিপিসমূহ লেখকের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে)

'আমীনুর রহমান, মুহাম্মদ ঃ হায়াত-এ-মুফ্‌তী-এ-'আযম ॥ চট্রগ্রামের চন্দনাইশস্থ মাওলানা মঞ্জিলে সংরক্ষিত।

'আযীযুল হক, আল্‌-কাদিরী, মাওলানা ঃ আল্‌-কাউলুল হক।

ইসরা'ঈল, সাইয়্যিদ, শাহ ঃ মুদ্‌নুল্‌ ফাওয়াইদ

'উবায়দুল হক, মাওলানা ঃ কুরআন-এ-হাকীম-আওর-হামারী জিন্দেগী (লেখকের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত)

মাহমূদ শিরাজী, মির্যা ঃ তারীখ-এ-হুসাইনী দালান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হাকীম হাবীবুর রহমান সংগ্রহে সংরক্ষিত)

শফিউর রহমান, মুফতী ঃ ফতাওয়া-এ-রহমানিয়া (চট্রগ্রামের চন্দনাইশস্থ মাওলানা মঞ্জিলে সংরক্ষিত)

প্রকাশিত যেসব ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে

Ayub `Ali, A.K.M., Dr ঃ History of Traditional Islamic Education in Bangladesh, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1983.

Enamul Haq, Muhammad ঃ A History of Sufism in Bengal. Asiatic Society of Bangladesh, 1973.

Mu`in-Uddin Ahmed ঃ History of the Fara`idi Movement Dhaka : Islamic Foundation Khan, Dr.Bangladesh, 1984.

Murtaja `Ali, Syed ঃ Saints of Bangladesh, Dhaka : Oxford University Press, 1971.

Wasti, Razi, Syed (ed.) ঃMemoirs and other writings of Syed Ameer Ali, Lahore : Peoples Publishing House, 1968.

Wise, James ঃ Notes on the Races, Castes, and Trades of Eastern Bengal, London, 1883.

Sekandar `Ali, Ibrahim, Dr, ঃ Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal (1861-1977), Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1985.

যেসব পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, রিপোর্ট, গেজেটিয়ার,ও ভাষণ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে

► আওজাযুত্-তারীখ-লি-মাদ্রাসাতিল 'আলিয়া ॥ প্রকাশক ঃ মাদ্রাসা-এ-'আলিয়া, ১৯৮১

► আরাফাত, ঢাকা, ৩০শে মে, ১৯৬৬

► আল্-এসলাম, আষাঢ়, ১৩২৭

► ইসলামী বিশ্বকোষ ॥ ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

► এন্সাইক্লোপিডিয়া (উর্দু), লাহোর, ১৯৬২

► কিতাব শিনাসী বুক রিভিও (২) লাহোর, ১৯৮৮

► ছোলতান, ৮ম বর্ষ ২৫শে মাঘ, ১৩৩০, ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪

► ফারান, করাচী, মে ১৯৬৫

► ফিক্র-ওয়া-নয্ও, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৮, ইদারা-এ-তাহকীকাত-এ-ইসলামী ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

► মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা ঃ অতীত ও বর্তমান (১৭৮০-১৯৮০) ॥ মাদ্রাসা-ই-'আলিয়া, ১৯৮১

► বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা সংস্কার ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির যৌথ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ ॥ ঢাকা ঃ 'আলিয়া মাদ্রাসা, ১৯৮৩

► Chittagong District Gazetteer, (ed-) S.N.H. Rizvi, Dacca. 1970.

► Dacca District Gazetteer, (ed-) S.N.H. Rizvi, 1969.

► Faridpur District Gazetteer, (ed.) Nurul Islam Khan, Dhaka, 1977.

► Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka vol. XXII, No. 1, April. 1977.

► Mymensingh District Gazetteer, (ed.) Nurul Islam Khan, Dhaka, 1978.

► Noakhali District Gazetteer (ed.) Nurul Islam Khan, Dhaka, `77.

► Sylhet District Gazetteer, (ed.) S.N.H. Rizvi, Dhaka.